বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

"...দিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।
...ং সমস্তবিজ্ঞান-শাস্ত্রকোষং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

...হা এই অধ্যাত্মশাস্ত্রে ... সমস্তই ইহাতে আছে।
যাহা এতন্মধ্যে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই। এই গ্রন্থ
অধ্যাত্মবিজ্ঞান শাস্ত্রের কোষস্বরূপ।

পূর্ব্বার্দ্ধ।

...রাগ্য, মুমুক্ষুব্যবহার, উৎপত্তি ও স্থিতি প্রকরণ।

অধ্যাপক

...যুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুভাষিত।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ২১৪ সংখ্যক ভবনস্থ
বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র দ্বা...
মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৮[illegible]

পাতনিকা।

সুতীক্ষ্ণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সংশয়াবিষ্টচিত্তে মহর্ষি অগস্তির আশ্রমে গমন করিয়া শিষ্যোচিত বিনয়াদি সহকারে অভিবাদনাদি করতঃ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি ধর্ম্মরহস্যবেত্তা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। আমা এক মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। অর্থা উপদেশ প্রদান দ্বারা আমার সে সংশয় অপনোদন করুন[৫]। আমার সংশ এই যে, কর্ম্ম মোক্ষের কারণ? কি জ্ঞান মোক্ষের কারণ? অথবা কর্ম্ম, জ্ঞান উভয়ই মোক্ষের সাধন? এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে কোনটী যথার্থ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন[৬]।

অগস্তি কহিলেন, সুতীক্ষ্ণ! পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষ দ্বারা আকাশ পথে বিচরণ করে, এক পক্ষ অবলম্বনে গগনমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না তেমনি জীবগণও জ্ঞান, কর্ম্ম, উভয় অবলম্বন করিয়া পরম পদ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে[৭]। কেবল কর্ম্মে ও কেবল জ্ঞানে মোক্ষ হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্ম * উভয়ের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় বলিয়া সাধুগণ উভয়কেই মোক্ষের সাধন অর্থাৎ উপায় বলিয়া জানেন। এই বিষয়ে তোমার নিকট একটী ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর[৮]।

পূর্ব্বকালে অগ্নিবেশ্য মুনির পুত্র বেদবেদাঙ্গপারগ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কারুণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়া দীর্ঘকাল পরে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন[৯।১০]।

পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহার সংশয় জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তিনি গৃহে আসিয়া কর্ম্মত্যাগী হইয়া নিষ্কর্ম্মে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে অগ্নিবেশ্য দেখিলেন, পুত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কিছুই করে না, কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করিতেছে[১১]। অনন্তর তিনি পুত্রকে তাহার হিতার্থে এইরূপ এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন। "পুত্র! এ কি! তুমি স্বকর্ম্মের পালন করিতেছ না কেন?[১২] তুমি কর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া কি প্রকারে

---

* জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। জ্ঞান শব্দে তত্ত্ব জ্ঞান। জ্ঞানকালে কর্ম্ম হয় না, কর্ম্মকালে জ্ঞান অভিভূত হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় নহে, কিন্তু অঙ্গপ্রধানভাব অর্থাৎ উপকার্য্যউপকারকভাব। আগে কর্ম্ম, পরে তৎপ্রভাবে জ্ঞান। মর্ম্ম কথা এই যে, কর্ম্ম দ্বারা চিত্তমল নষ্ট হয়, তাদৃশচিত্তে তত্ত্ব জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়।

দ্ধিলাভ করিবে তাহা আমায় বল। এবং তোমার এই কর্ম্মপরিত্যাগের কারণ
 তাহাও বল"১৩।

কারুণ্য বলিলেন, "মরণাবধি অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিবেক, নিত্য সন্ধ্যা-
ন্দনাদি করিবেক" এই সকল বাক্য (শ্রুতি) ও তদ্‌বোধিত ধর্ম্মসকল প্রবৃত্তি-
টিত। এতদনুরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে১৪।

"ধনের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা ও সন্তানোৎপত্তির দ্বারা মোক্ষ হয় না। পূর্ব্ব-
কালে প্রধান প্রধান যতিগণ কেবল মাত্র পরিত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ
কর্ম্মসন্ন্যাস দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন" এ সকল বাক্য নিবৃত্তিঘটিত১৫।
হে পিতঃ! "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি করিবেক"। "নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা
ন্দনা) করিবেক" ইহাও শ্রুতি বাক্য এবং "কর্ম্মাদির দ্বারা মোক্ষ
 না, তাহা কেবল ত্যাগ দ্বারাই হয়" ইহাও শ্রুতি বাক্য। দ্বিবিধ শ্রুতি
কাম উক্ত উভয়ের কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা বুঝিতে না পারায় সন্দিগ্ধ
হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছি১৬।

অগস্তি কহিলেন, কারুণ্য পিতাকে এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।
নন্তর অগ্নিবেশ্য পুত্রকে মৌন দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন১৭। পুত্র!
মি তোমাকে একটী মহতী কথা বলি, শ্রবণ কর। শুনিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ
রিও, বিচার করিও, পরে যাহা ইচ্ছা তাহা করিও১৮। পূর্ব্বে, হিমালয়ের যে
 কামসন্তপ্তা কিন্নরীসমূহ কিন্নরগণের সহিত পরম সুখে বিহার ও ময়ূর
গণ প্রমোদ সহকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে, যে স্থানে সর্ব্বপাপনাশিনী গঙ্গা
যমুনা প্রবাহিতা হইতেছেন, সেই পরম পবিত্র প্রদেশে সুরুচীনাম্নী এক
সরা একদা উপবিষ্টা ছিলেন১৯।২০। সুরুচি যদৃচ্ছাক্রমে নেত্র পরিচালন
রিতে করিতে দেখিলেন, ইন্দ্রদূত তাঁহার সম্মুখস্থ অন্তরীক্ষ পথে গমন করিতে-
ন। মহাভাগ্যবতী সুরুচি ইন্দ্রদূতকে দেখিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ!
াপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন এবং সম্প্রতি কোথাইবা গমন
রিবেন তাহা আমায় কৃপা করিয়া বলুন২১।২২।

দেবদূত বলিলেন, সুভ্রু! তুমি উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যে নিমিত্ত
 স্থানে গিয়াছিলাম তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। হে
বর্ণিনি! ধর্ম্মশীল রাজর্ষি অরিষ্টনেমি বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রের
তি রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ তপোনুষ্ঠান বাসনায় বনে গমন করিয়াছেন।
নি এক্ষণে সুরম্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন২৩।২৪।

আমি সুরপতির আজ্ঞায় তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহার সেই আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সে স্থানের বৃত্তান্ত বিদিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার সুরপতির সন্নিধানে গমন করিতেছি[২৫]। সুরুচি বলিলেন, প্রভো! রাজর্ষির সহিত আপনার কিরূপ কথোপকথন হইল তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন; অবহেলা করিবেন না[২৬]। দেবদূত কহিলেন, ভদ্রে! তথাকার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করি, শ্রবণ কর।

রাজর্ষি অরিষ্টনেমি সেই গন্ধমাদনশৃঙ্গস্থ মনোহর কাননে যার পর নাই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত আছেন[২৭]। সুররাজ ইন্দ্র তাহা জ্ঞাত হইয়া আমাকে আজ্ঞা করিলেন, "দূত! তুমি শীঘ্র অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর ও যক্ষগণ পরিশোভিত এবং বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদি বিবিধ সুমধুর বাদ্যে নিনাদিত উৎকৃষ্ট বিমান লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি তরুবর নিকর পরিশোভিত পবিত্র শৃঙ্গে গমন কর এবং সযত্নে তদুপরি রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে আরোহণ করাইয়া আমার এই স্থানে আনয়ন কর। তিনি এই স্থানে আসিয়া তপঃফল স্বর্গ ভোগ করুন[২৮।২৯।৩০।৩১]।

হে সাধুশীলে! দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আমি কথিত প্রকারে অনুজ্ঞাত হইয়া সেই নিখিলভোগোপকরণসমন্বিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন দেববিমান গ্রহণ-পূর্ব্বক অচলরাজ গন্ধমাদনের শিখর প্রদেশে গমন করিলাম[৩২]। অনন্তর রাজর্ষি অরিষ্টনেমির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সুরপতি আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে সমস্তই বিদিত করিলাম[৩৩]। হে শুভে! রাজর্ষি অরিষ্টনেমি আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধ মনে বলিলেন, হে দূত! আমি তোমার নিকট কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। তুমিই আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ[৩৪]। স্বর্গে কি কি গুণ ও কি কি দোষ আছে তাহা আমার নিকট বর্ণন কর, আমি তাহা বিদিত হইয়া পশ্চাৎ রুচি অনুসারে স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া অর্থাৎ স্বর্গবাস স্বীকার করিব কি না তাহা স্থির করিব[৩৫]।

অনন্তর আমি কহিলাম, পুণ্যের প্রাচুর্য্য থাকিলে স্বর্গে উৎকৃষ্ট ফলভোগ হয়। উৎকৃষ্ট পুণ্য থাকিলে উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করা যায়[৩৬]। এবং মধ্যম পুণ্যে মধ্যম স্বর্গই লব্ধ হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। পুণ্যের অপকৃষ্টতা থাকিলে তাহার স্বর্গও তাদৃশ হইয়া থাকে[৩৭।৩৮]।

মহাশয়! পুণ্যের তারতম্য অনুসারে স্বর্গ স্থানের ও তত্রত্য সুখের

তারতম্য (উৎকর্ষাপকর্ষ) ঘটনা হইয়া থাকে। অনুত্তম স্বর্গীরা উত্তম স্বর্গীদিগের উৎকৃষ্টতা অসহ্য বোধ করে ও তুল্যস্বর্গীরাও পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, স্পর্দ্ধা ও বিদ্বেষাদি করে। যাহারা উত্তম স্বর্গী তাহারা আপন অপেক্ষা হীন স্বর্গীর হীনতা অর্থাৎ অল্প সুখ দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করে। যাবৎ না পুণ্যক্ষয় হয় তাবৎ স্বর্গবাসীরা ঐরূপ উত্তম অধম মধ্যম সুখ অনুভব করতঃ কাল যাপন করিতে থাকে, অনন্তর ক্ষীণপুণ্য হইয়া পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মহারাজ! স্বর্গে এই এইরূপ গুণ ও দোষ বিদ্যমান আছে[৩৯]।

হে ভদ্রে! রাজা অরিষ্টনেমি স্বর্গের ঐ গুণ দোষ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, দেবদূত! আমি এবম্বিধ স্বর্গভোগ বাঞ্ছা করি না[৪০]। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় আমি আজ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান দ্বারা এই নিতান্ত ঘৃণ্য অশুদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিব[৪১]।

হে দেবদূত! তুমি যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছ, এই বিমান লইয়া সেই স্থানে গমন কর অথবা সুরপতির সন্নিধানে গমন কর; আমি তোমাকে নমস্কার করি[৪২]। দেবদূত বলিলেন, ভদ্রে! অনন্তর আমি দেবরাজ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি স্বর্গভোগবিতৃষ্ণ অরিষ্টনেমির বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন[৪৩]।

অনন্তর দেবরাজ মধুর বাক্যে পুনর্ব্বার আমাকে বলিলেন, দূত! তুমি পুনর্ব্বার সেই ভোগবিমুখ রাজর্ষি অরিষ্টনেমির সমীপে গমন কর। তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরমজ্ঞানী মহর্ষি বাল্মীকির অত্যুত্তম আশ্রম পদে গমন করিবে এবং মহর্ষিকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিবে, এই রাজর্ষি অতিশয় বৈরাগ্যসম্পন্ন[৪৪।৪৫]। হে মহামুনে! ইনি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, অতিবিনয়ী, বিবেকপ্রস্থ ও স্বর্গভোগে বিমুখ, সে জন্য দেবরাজের আদেশ—যাহাতে ইহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহা করিতে হইবে। অদ্যই যথাযথ বিধানে ইহাকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হউন[৪৬]। আপনার তাদৃশ উপদেশে এই সংসারদুঃখসন্তপ্ত রাজর্ষি ক্রমে মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। হে সুভ্রু! সুরপতি আমাকে এই দ্বিতীয় আদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজর্ষি অরিষ্টনেমির সমীপে প্রেরণ করিলেন[৪৭]। অনন্তর আমি সুরপতি ইন্দ্রের আদেশে রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম পদে গমন করতঃ তাঁহার নিকট রাজর্ষির মোক্ষসাধনের বিষয় নিবেদন করিলাম[৪৮]।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রীতিপূর্ব্বক রাজাকে প্রথমতঃ অনাময় প্রশ্ন, তৎপরে আগমন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন[৪৯]। তদুত্তরে রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ বিশেষতঃ সর্ব্ববিৎশ্রেষ্ঠ। আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ এবং তাহাই আমার পরম কুশল[৫০]। হে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন! সম্প্রতি আমি জিজ্ঞাসু ও সংসারদুঃখে কাতর। বিঘ্ন না হয় এরূপ করিয়া আমাকে প্রতিবোধিত করুন। যে উপায়ে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি সেই উপায় আমাকে উপদেশ করুন[৫১]।

বাল্মীকি বলিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট অখণ্ডতত্ত্বপ্রতিপাদক রামায়ণ বলি, শ্রবণ কর। তুমি যত্নপূর্ব্বক শুনিবে, শুনিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে, অনন্তর তাহাতেই জীবন্মুক্তিপদ লাভ করিবে[৫২]। বক্তব্য রামায়ণ বশিষ্ঠ-রাম সম্বাদাত্মক। * তাহা মুক্তির অদ্বিতীয় উপায় ও নিতান্ত শুভাবহ। হে রাজেন্দ্র! তুমি তাহা বুঝিতে সমর্থ, আমিও বুঝাইতে পারক। সেই কারণে আমি তাহা তোমাকে বলিব, প্রণিহিত হইয়া শ্রবণ কর[৫৩]। অনন্তর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! রাম কে? কিংস্বরূপ? তিনি কোন্ রাম? তিনি কি বদ্ধ? না মুক্তস্বভাব? আপনি অগ্রে আমাকে তাহাই বিদিত করুন অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া বলুন[৫৪]। বাল্মীকি বলিলেন, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ হরি অভি-শাপ পালন ছলে রাজবেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ভক্ত-বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত সামান্য মানবের ন্যায় অল্পজ্ঞ হইয়াছিলেন[৫৫]।

রাজা বলিলেন, ভগবন্! অপরাধী ব্যক্তিরাই শাপগ্রস্ত হয় এবং অপরাধও অপূর্ণকাম ও অজ্ঞ ব্যক্তিতেই সম্ভবে। যিনি চিদানন্দরূপী ও চিদ্ঘনমূর্ত্তি পরমে-শ্বর, তাঁহার আবার অভিশাপ কি? অতএব, তাঁহার প্রতি অভিশাপ হওয়ার কারণ কি এবং তাঁহার অভিশপ্তা কে তাহা আমাকে বলুন[৫৬]। বাল্মীকি কহি-লেন, বৎস! ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার কামক্রোধাদিবিবর্জ্জিত ও পরম

---

* বশিষ্ঠ-রাম-সম্বাদাত্মক, এই কথায় সূচিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠ রামকে উপদেশ দিয়া-ছিলেন। বশিষ্ঠ গুরু, রাম তাঁহার শিষ্য। কথাটী রাজর্ষির মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া-ছিল। সন্দেহ এই যে, অজ্ঞ জীবেরাই অজ্ঞতানিবন্ধন জ্ঞান লাভের আশায় শিষ্য হইয়া থাকে, কিন্তু রাম স্বয়ংব্রহ্মসনাতন, তিনি কেন শিষ্য হইবেন? সুতরাং তাঁহার সন্দেহ—কোন্ রাম। তিনি কি রামনামধারী কোন এক জীব? কি ভগবদবতার প্রসিদ্ধ রাম। এইরূপ সন্দেহ হওয়াতেই রাজর্ষি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন রামের কথা বলিবেন তাহা অগ্রে আমাকে বলুন।

জ্ঞানী। একদা তিনি ব্রহ্মসদনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে প্রভু ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ হইতে তথায় আগমন করিলেন[৫৭]। কমলযোনি সমুদয় ব্রহ্মলোকনিবাসীর সহিত গাত্রোত্থান ও অভ্যর্থনাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন; কেবল সনৎকুমার আপনাকে নিষ্কাম মনে করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন না। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন, সনৎকুমার! তুমি অহঙ্কৃত, তোমার চেষ্টা গর্ব্বসূচক (আমার আদর না করা), সেই কারণে তুমি শরজন্মা (কার্ত্তিকেয়) নামে বিখ্যাত ও কামনাপরতন্ত্র (কামাসক্ত) হইবে[৫৮।৫৯]। তৎশ্রবণে সনৎকুমারও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুর প্রতি এই বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, আপনাকেও সর্ব্বজ্ঞত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞ জীবের ন্যায় কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করিতে হইবে[৬০]। পূর্ব্বে মহর্ষি ভৃগুও * বিষ্ণুকর্ত্তৃক স্বীয় ভার্য্যা নিহতা দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, অহে বিষ্ণু! তুমি যেমন আমাকে স্ত্রীবিয়োগ দুঃখে দুঃখিত করিলে তোমাকেও এতদ্রূপ ভার্য্যাবিয়োগ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে[৬১]। পূর্ব্বে বিষ্ণু জলন্ধররূপ † ধারণ করিয়া তদীয় পতিপ্রাণা ভার্য্যা বৃন্দাকে বিমোহিতা ও তাহার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তৎকারণে তিনি বৃন্দাকর্ত্তৃকও অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দা এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে,

* এস্থলে পৌরাণিক সংবাদ এই যে, খ্যাতি নাম্নী ভৃগুপত্নী পূর্ব্বকল্পে বিষ্ণুশরীরে লীনা হইবার প্রার্থিনী ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার সেই প্রার্থনা পূরণ করায় ভৃগু মনে করিলেন, বিষ্ণু আমার ভার্য্যা বিনাশ করিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর প্রতি উক্ত প্রকার অভিশাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, গোলকস্থ সুদাম গোপাল রাধার শাপে দানবকুলে জলন্ধর নামে ও তুলসীনাম্নী এক গোপী ধর্ম্মধ্বজ রাজার পত্নীতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। জলন্ধর ব্রহ্মার বরে সকলের অবধ্য হইয়াছিল। ব্রহ্মা কাহাকেও নিত্যামর করেন না, মরণের একটা না একটা নিমিত্ত রাখিয়া দেন। তাই জলন্ধরকে বলিয়াছিলেন, তোমার পত্নীর সতীত্বনাশ হইলে তোমার মরণ হইবে। নচেৎ তুমি সকলের অবধ্য থাকিবে। বরদৃপ্ত জলন্ধর বলপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিলে দেবগণ, ব্রহ্মা ও শিব তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপনার্থ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শিবকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে বলেন। জলন্ধর শিবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিষ্ণু জলন্ধররূপে তদীয় গৃহে গমন করতঃ তদীয় পত্নীর সতীত্ব ভঙ্গ করিলেন, এ দিকে জলন্ধরেরও মৃত্যু হইল। বৃন্দা জলন্ধরের মৃত্যুর পর সেই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে ঐ প্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কোন পুস্তকে জলন্ধরের পরিবর্ত্তে শঙ্খচূর নাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে জলন্ধরের উপাখ্যান অন্যরূপে লিখিত আছে সত্য, পরন্তু তাহাতেও তৎপত্নী বিষ্ণুকর্ত্তৃক মোহিতা হওয়া বর্ণিত আছে। উভয় পুরাণের প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, বিষ্ণু বৃন্দাকে মাত্র বিমোহিতা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই বৃন্দার পাতিব্রত্য ভঙ্গ হইয়াছিল। সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্রষ্টা বিষ্ণু পুণ্য পাপে অলিপ্ত, সুতরাং তাঁহার ঐ কার্য্য দোষাবহ নহে।

অহে বিষ্ণো! তুমি যেমন ছলনা করিয়া আমার পাতিব্রত্য ভঙ্গ ও আমাকে সন্তাপিত করিলে, আমার বাক্যে তোমাকেও স্ত্রীবিয়োগনিবন্ধন সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে৬২। ভগবান্ যখন নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তখন গর্ভবতী দেবদত্তভার্য্যা তাঁহাকে দেখিয়া পয়োষ্ণীনদীতীরে ভয়ে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে তদীয় স্বামী দেবদত্ত ভার্য্যাবিয়োগে কাতর হইয়া ভগবান্‌কে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তুমি যেমন আমাকে স্ত্রীবিয়োগে কাতর করিলে, এইরূপ তুমিও কিঞ্চিৎকাল আত্মবিস্মৃত ও স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইবে৬৩।৬৪।

ভক্তবৎসল নারায়ণ এইরূপে ভৃগু, সনৎকুমার, বৃন্দা এবং দেবদত্ত কর্ত্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের শাপানুযায়ী সেই সেই কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন৬৫। অভিশাপ-ছলের সমুদায় কারণ তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা বলি; মন দিয়া শুন৬৬। তিনি স্বীয় শক্তির দ্বারা শাপমোচনে সমর্থ হইলেও ভক্তবৎসলতানিবন্ধন তাঁহাদের মর্য্যাদারক্ষার্থ সেই সেই কার্য্য করিয়াছিলেন। ভৃগুর ও বৃন্দার শাপে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ও দেবদত্ত শাপে তাঁহার গর্ভবতী সীতার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। হে মহারাজ! যে যে কারণে ভূতভাবন ভগবান্ অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন সে সমস্তই তোমার নিকট কথিত হইল। এক্ষণে তুমি মোক্ষোপায় সাধন বিষয়ে যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহার নিমিত্ত দ্বাত্রিংশৎ সহস্র শ্লোক পরিমিত বাশিষ্ঠ নামক মহারামায়ণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ ।

মোক্ষকথাপ্রারম্ভ ।

যিনি স্বর্গে, মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে, তোমার অন্তরে, সকলের অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজমান অর্থাৎ যাঁহার সত্তায় ও প্রকাশে এ সকল সত্তাবান্ ও প্রকাশিত সেই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বাবভাসক ব্রহ্মকে নমস্কার[১] ।

বাল্মীকি কহিলেন, "আমি সংসাররূপ কারাগারে বদ্ধ আছি, ইহা হইতে আমাকে মুক্ত হইতে হইবেই হইবে।" যাহার এইরূপ ঔৎকট্য জন্মিয়াছে এবং যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ নহে, অত্যন্ত জ্ঞানীও নহে, তাহারাই এতৎ শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী[২] । যাহারা পূর্ব্বসপ্তকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণ পূর্ব্বক তদুদ্দেশ্য বিচার ও যুক্তিঅনুষ্ঠানাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া এতৎগ্রন্থোক্ত মোক্ষসাধনে চিত্তার্পণ করতঃ মননাদিতে রত হন তাঁহারাই পুনর্জ্জন্ম জয় করিয়া কৃতার্থ হন। অর্থাৎ মুক্ত হন[৩] । *

হে অরিন্দম! আমি বর্ত্তমানে বিলক্ষণ ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোক পরিমিত পূর্ব্ব ও উত্তর দুই খণ্ড রামায়ণের মধ্যে রাগদ্বেষাদি দোষের উচ্ছেদক উত্তম উপদেশবিশিষ্ট সুতরাং মহাবল বা মহাসামর্থ্যযুক্ত রামকথারূপ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক পরিমিত রামায়ণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া যেরূপ রত্নাকর রত্নার্থীকে রত্ন প্রদান করেন সেইরূপ আমিও আমার প্রিয় শিষ্য বিনীত শ্রীমান্ ভরদ্বাজকে প্রদান করিয়াছিলাম। ধীমান্ ভরদ্বাজ আমার নিকট সেই অপূর্ব্ব পূর্ব্বরামায়ণ

* মূলে যে "কথোপায়" শব্দ আছে, তাহার অর্থ—পূর্ব্ব সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, ইত্যাদিক্রমে যে সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রখ্যাত আছে, তাহা) এ অর্থ "যে গ্রন্থ-কথায় বাল্মীকি মুনি কর্ত্তৃক ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরতত্ত্ব, নির্ব্বাণ-জ্ঞানের উপায়-রূপে গ্রথিত হইয়াছে তাহা কথোপায়" এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা লব্ধ হয়। প্রথমে পূর্ব্ব সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণ ও তদর্থ বা তদুদ্দেশ্য বিচার করিতে হয়। তাহাতে শমদমাদিসিদ্ধি ও সগুণ পরমেশ্বর বিষয়ক আপাত-জ্ঞান লাভ করা যায়। অনন্তর নির্গুণ তত্ত্বে অধিকারী হওয়া যায়। তাদৃশ অধিকারীর প্রতি এই বেদান্তবেদ্য সসাধন পরব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থের উপদেশ।

প্রাপ্ত হইয়া কোন এক সময়ে সুমেরুপর্ব্বতস্থ মনোহর কাননে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। তৎশ্রবণে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভরদ্বাজকে বলেন, পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ভরদ্বাজ বলিলেন, হে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ঈশ্বর! হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালীন্! জনগণ যাহাতে জন্মমরণাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অর্থাৎ মুক্তি পাইতে পারে তাহাই আমাকে বলুন। তাহাতেই আমার রুচি, এবং তাহাই আমার বর অর্থাৎ প্রার্থনীয়[৪।৮]। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! তুমি এতদাশ্রমস্থ মহর্ষি বাল্মীকি সমীপে গমন কর এবং যত্ন বিনয়াদি সহকারে প্রার্থনা কর। তিনি যে অনিন্দিত রামায়ণ প্রস্তুত করিতেছেন তাহারই শ্রবণে জনগণ অনাদি অবিদ্যা মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। জনগণ যেমন মহাগুণশালী রাম-সেতুর * দ্বারা মহাপাপসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে সেইরূপ বাল্মীকিমহর্ষিকৃত উত্তর রামায়ণ শ্রবণেও দুস্তর মোহমহাসাগর অর্থাৎ এই সংসার সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে[৯।১০]।

বাল্মীকি কহিলেন, পরমেষ্ঠী ভরদ্বাজকে এইরূপ বলিয়া, পরে তিনি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিলেন[১১]। আমি সর্ব্ব-ভূতহিতৈষী দেবাদিদেব মহাসত্ত্ব পরমেষ্ঠীকে দর্শন করিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থান ও পাদ্যপ্রদানাদির দ্বারা তাঁহার সপর্য্যা করিলাম। অনন্তর সেই মহাসত্ত্ব পিতামহ আমাকে সর্ব্বজীবের হিতার্থে বলিতে লাগিলেন[১২]।

হে মুনিবর! পবিত্র রামচরিতবর্ণন রূপ উত্তর রামায়ণ প্রস্তুত করিতে যদিও তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ তথাপি সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা পরিত্যাগ করিও না। যাবৎ না এই অনিন্দিত রামচরিতপূর্ণ গ্রন্থ সমাপ্ত হয় তাবৎ এতৎ প্রতি যত্নবান্ হও[১৩]। মহর্ষে! যেমন শীঘ্রগামী পোত দ্বারা দুর্লঙ্ঘ্য মহাসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেইরূপ লোক সকল এই উত্তর রামায়-ণের দ্বারা সংসার সঙ্কট অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে[১৪]। সেই জন্যই আমার অনুরোধ—তুমি লোকহিতসাধনার্থ এই মহৎ শাস্ত্র রামায়ণ শীঘ্র প্রকাশ কর। আমি ইহা বলিবার নিমিত্তই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি[১৫]।

---

* রামকৃত সেতু—যাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে আছে, জীব রামসেতু দর্শনে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। যেহেতু রামসেতু সর্ব্বপাপবিমোচন, সেই হেতু তাহা মহা গুণশালী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

হে রাজন্! যেরূপ সলিলরাশি হইতে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ, ভগবান্ কমলযোনি ঐ কথা বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই আমার এই পবিত্র আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলেন[১৬]।

ব্রহ্মা আগমন করিলে আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, সুতরাং আমি তৎকালে তদীয় বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। অনন্তর তিনি গমন করিলে, আমি চিত্তের স্থিরতা লাভ করিয়া ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম,[১৭] ভরদ্বাজ! ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে কি বলিতে-ছিলেন তাহা তুমি আমায় শীঘ্র বল। আমি তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই[১৮]। অনন্তর তৎশ্রবণে ভরদ্বাজ বাল্মীকি মুনিকে বলিলেন, মহর্ষে! ভগবান্ ব্রহ্মা বলিতেছিলেন "আপনি পূর্ব্বে যেরূপ চিত্তশুদ্ধিজনক রামায়ণ প্রস্তুত করিয়াছেন; এক্ষণে সেইরূপ সর্ব্বলোকহিতার্থ সংসার সমুদ্রের নৌকাস্বরূপ উত্তর রামায়ণ প্রস্তুত করুন"[১৯]। ভগবন্! এ বিষয়ে আমারও প্রার্থনা—মহামনা রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, যশস্বিনী সীতা ও ধীসম্পন্ন রামানুযায়িগণ এই সংসারসঙ্কটে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করুন। তাঁহারা কি অজ্ঞ জীবের ন্যায় শোকসমাচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন? কি মুক্তজীবের ন্যায় অসঙ্গ ছিলেন[২০।২১]? কিরূপে তাঁহারা দুঃখ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা বিশদরূপে বলুন, উপদেশ করুন, আমি ও সংসারস্থ অন্য মানব, আমরা সকলেই সেইরূপ করিব, করিয়া সংসার সঙ্কট হইতে ত্রাণ লাভ করিব[২২]।

মহারাজ! আমি মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক সাদরে "বলুন" এইরূপ অভিহিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে তাঁহাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম[২৩]। বলিলাম, বৎস ভরদ্বাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তর বর্ণন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে তোমার সমুদয় মোহ দূরীভূত ও মনোবৃত্তি নির্ম্মল হইবে[২৪]। হে প্রাজ্ঞ ভরদ্বাজ! রাজীবলোচন রাম সকল বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত থাকিয়া যেরূপে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ সুখী হইয়াছিলেন তুমিও সেইরূপে লোকব্যবহার সম্পন্ন কর, করিলে তুমিও সুখী হইতে পারিবে[২৫]। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, মহারাজ দশরথ[২৬] এবং রামসখা কৃতাস্ত্র ও অবিরোধ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও বামদেব, ইঁহারা সকলেই পরমজ্ঞানী ছিলেন। রামচন্দ্রের[২৭] ধৃষ্টি, জয়ন্ত, ভাস, সত্য অর্থাৎ সত্য বক্তা বিজয়, বিভীষণ, সুষেণ, হনুমান ও

সুগ্রীবামাত্য ইন্দ্রজিৎ, এই আট্ মন্ত্রী, ইঁহারাও মহামনা, জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, বিষয়াসক্তিশূন্য, প্রারব্ধক্ষয়প্রতীক্ষ ও জীবন্মুক্ত ছিলেন[২৮।২৯]। হে বৎস ভরদ্বাজ! ইঁহারা যেরূপে ও যে ভাবে শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত হোম ও দান প্রভৃতি কর্ম্ম ও আদান প্রদান প্রভৃতি লৌকিক সদ্ব্যবহার ও ইষ্টচিন্তন প্রভৃতি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন তুমিও যদি সেইরূপ করিতে পার তাহা হইলে তুমিও অনায়াসে সংসারসঙ্কট মুক্ত হইতে পারিবে[৩০]। অধিক কি বলিব, উৎকৃষ্ট-জ্ঞানবলসম্পন্ন ব্যক্তি অপার সংসারসমুদ্রে পতিত থাকিলেও এই পরমযোগ লাভ করিয়া ইষ্টবিয়োগাদিজনিত শোক, দুঃখ, দৈন্য, সমুদয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পান ও নিত্যতৃপ্ত হন[৩১]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি রামকথা অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে জীবন্মুক্তের স্থিতি অর্থাৎ লক্ষণ ও লৌকিক বৈদিক ব্যবহার বর্ণন করুন্ তাহা শ্রবণ করিয়া আমি পরম সুখ লাভ করিব[১]।

বাল্মীকি বলিলেন, সাধু ভরদ্বাজ! সাধু! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যদ্রূপ ভ্রম বশতঃ রূপহীন আকাশে নীল পীত প্রভৃতি বর্ণ প্রতিভাস প্রকাশ পায়, সেইরূপ, অজ্ঞান বশতঃ পরব্রহ্মে জগৎ ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে। হে সাধো! সেই কারণে আমার মনে হয় যে, এই মিথ্যা জগৎ যাহাতে পুনর্ব্বার স্থিতিপদারূঢ় না হয় সেইরূপ ভাবে ইহার বিস্মরণ উৎপাদন করাই মঙ্গলাবহ বা শ্রেয়স্কর[২]।

ভরদ্বাজ! দৃশ্যমাত্রই ভ্রান্তিকল্পিত সুতরাং মিথ্যা। এই জ্ঞান যত দিন না দৃঢ়তররূপে উৎপন্ন হইবে তত দিন কোনওপ্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব, যাহাতে অবিসম্বাদী আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পার তাহার উপায় অন্বেষণ কর[৩]। বৎস! তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান লাভের অসম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত সম্ভাবনা আছে। কারণ, আমি তদুদ্দেশেই এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি। যদি তুমি ইহা ভক্তি শ্রদ্ধাদি সহকারে শ্রবণ কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইবে, অন্যথা কোনও কালে ভ্রমসংশোধন হইবে না, ভ্রম সংশোধন না হইলেও তত্ত্বজ্ঞান হইবে না[৪]। হে অনঘ! এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা অথচ ইহা ভ্রম বশতঃ আকাশবর্ণের ন্যায় আপাততঃ সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু যখন তুমি মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে, জগৎ কিছুই নহে[৫] অধিকন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা। হে ভরদ্বাজ! দৃশ্য নাই। অর্থাৎ দৃশ্য মায়াবীর মায়ার ন্যায় মিথ্যা। যিনি ইহার দ্রষ্টা তিনিই সত্য। এই সত্য আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজমান ও প্রকাশমান। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্যতীত যে কিছু—সমস্তই জড় সুতরাং স্বাত্মকল্পিত ও মিথ্যা। এইরূপ জ্ঞান দ্বারা মন হইতে দৃশ্যবস্তুর মার্জ্জন অর্থাৎ অস্তিত্ব পরিহার করিতে পারিলেই পরমা নির্বৃতি (নির্ব্বাণ নামক মোক্ষ) লাভ করিতে পারিবে[৬]। অন্যথা অজ্ঞানান্ধ হইয়া শত কল্প পর্য্যন্ত শাস্ত্ররূপ গর্ত্তে নিপতিত

ও লুণ্ঠিত হইলেও স্বতঃসিদ্ধা পরমা নির্ব্বৃতি অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মনির্ব্বাণ নামে খ্যাত তাহা লাভ করিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব, তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও নাই বলিয়া অবধারণ করিবে৭। [বস্তুতঃই অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা ও উত্তমরূপে দৃশ্য মার্জ্জন করা ব্যতীত ভ্রমপূর্ণ অনাত্মশাস্ত্রের ও অনাত্মশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের দ্বারা বিশোকাত্মক নির্ব্বাণ পদ লাভ করা যায় না।]

হে ব্রহ্মন্! নিঃশেষিতরূপে বাসনাপ্রবাহের পরিত্যাগ অর্থাৎ মূলোচ্ছেদ হইলে যে মোক্ষ হয় সেই মোক্ষই মুখ্য মোক্ষ * এবং সেই ক্রমই উত্তম ক্রম৮। অর্থাৎ প্রতিদিন পরাৎপর ভগবানের স্মরণ ও উপাসনাদির দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে অল্পে অল্পে বাসনা জাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বাসনা ক্ষয় হইলেই জন্মমরণাদিরূপ সংসার ছিন্নমূল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন শীতাত্যয়ে হিমরাশি দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ, বাসনাক্ষয়ে বাসনাপুঞ্জের অধিষ্ঠানভূত মনও বিগলিত হইয়া যায়৯। সুতরাং বাসনা হইতে উৎপন্ন ও বাসনার দ্বারা আবদ্ধ ও বর্দ্ধিত এই পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও বাসনাশূন্য হওয়ায় অভাব প্রাপ্তের ন্যায় অবস্থান করে১০। বাসনা দুই প্রকার। শুদ্ধা ও মলিনা। মলিনা বাসনা জন্মের হেতু ও শুদ্ধা বাসনা জন্মবিনাশিনী১১। যাহা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানময় ও নিরতিশয় অহঙ্কারশালিনী, † পণ্ডিতেরা সেই পুনর্জ্জন্মবিধায়িনী বাসনাকে মলিনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন১২। যাহা ভ্রষ্টবীজের ন্যায় অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তিবিহীন হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা পুনর্জ্জন্মের উৎপাদক কারণ না হইয়া কেবল মাত্র প্রারব্ধবশতঃ দেহাদি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে অর্থাৎ দেহ ধারণ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় তাহা শুদ্ধা বাসনা নামে বিখ্যাত১৩। এই পুনর্জ্জন্মনিবারণী শুদ্ধা বাসনা জীবন্মুক্ত পুরুষ দিগের দেহে চক্রভ্রমের ন্যায় মৃত সংস্কার রূপে অবস্থান করে১৪। যাঁহারা শুদ্ধবাসনাবিশিষ্ট, তাঁহারাই জ্ঞাতজ্ঞেয় হন, হইয়া অনর্থভাজন পুনর্জ্জন্ম জয় করিয়া জীবন্মুক্ত পদ লাভ করে। সেইজন্য, তাঁহারাই প্রকৃতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য১৫। [ইঁহারা কৃত কর্ম্মের ফল উত্তর কালে ভোগ করেন না। এই জন্মেই সে সকল ভোগদ্বারা ক্ষয় করিয়া থাকেন।]

* বাসনা=মিথ্যা জ্ঞান বা কর্ম্মের সংস্কার। এই বাসনাই ভবিষ্যৎ জন্মাদির কারণ এবং তাহা অজ্ঞানরূপ ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়। পুনঃ পুনঃ বিষয়ানুসন্ধান তাহার পোষণ ও বর্দ্ধন করে এবং রাগ দ্বেষাদি তাহার সহায়তা করে। তাহার রোপণ কর্ত্তা অহঙ্কার।

† সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, এ সকল মুক্তি গৌণ। অর্থাৎ পরমমুক্তির কিঞ্চিৎ গুণ বা সাদৃশ্য আছে বলিয়া ঐ সকল মুক্তি নামে পরিভাষিত হইয়াছে।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহামতি রাম যে প্রকার সাধনার দ্বারা জীবন্মুক্তি পদ লাভ করিয়াছিলেন আমি জীবের জরামরণশান্তির নিমিত্ত তোমার নিকট সবিস্তরে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরম মঙ্গলদায়িনী রামকথা শ্রবণ করিলে তুমি সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে১৬।১৭।

বৎস ভরদ্বাজ! রাজীবলোচন রাম বিদ্যাগৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া কিছুদিন বিবিধ লীলার দ্বারা অকুতোভয়ে স্বীয়গৃহে অবস্থিতি করতঃ অতিবাহিত করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে যখন রাম পৃথিবী পরিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন তখন প্রজা দিগের রোগ, শোক, ভয়, অকালমরণ প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইল১৮।১৯। এই অবসরে তাঁহার চিত্ত তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল২০। অসীমগুণ পবিত্র তীর্থাদিদর্শনার্থ রাঘব চিন্তাপরায়ণ হইয়া আগ্রহ সহকারে হংস যেমন অভিনব পদ্ম আশ্রয় করে, সেইরূপ, পিতার নখকেশরবিরাজিত পাদপদ্মযুগল অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ তদীয় পাদপদ্ম গ্রহণ করিলেন২১। কহিলেন, পিতঃ! তীর্থ, দেবালয়, বন, এবং আয়তনাদি দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার মন সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে২২। হে নাথ! হে প্রার্থনাপূরক! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করুন। পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়া অকৃতার্থ বা অপূর্ণকাম হইয়াছে২৩।

অনন্তর রাজা দশরথ রাম কর্ত্তৃক কথিতপ্রকারে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের সহিত মন্ত্রণা করতঃ প্রথম প্রার্থী রামকে তীর্থদর্শনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন২৪। গুণশালী রাম পিতার অনুমতি গ্রহণ করতঃ প্রথমে মঙ্গলালঙ্কৃতবপু ও দ্বিজগণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইলেন। পরে মাতৃগণচরণে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক নিয়োজিত শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ ও কতিপয় শান্তস্বভাব রাজপুত্র সমভিব্যাহারে শুভনক্ষত্রসম্পন্ন দিবসে স্বগৃহ হইতে তীর্থ দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন২৫।২৭। পুরবাসিগণ তাঁর মঙ্গলার্থ নানাবিধ বাদ্যবাদন করিতে লাগিল, নগরবাসিনী রমণীগণ চঞ্চল নয়নে মুহুর্মুহু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত ও কমলকর দ্বারা তাঁহার শরীরে লাজ বর্ষণ করিতে লাগিল; মহাপুরুষ রাম এই লাজবর্ষণে হিমকণাসংলগ্ন হিমাচলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন ২৮।২৯। তীর্থযাত্রী রাম প্রথমতঃ দানাদির দ্বারা বিপ্রগণকে বিদায় করিলেন; পরে প্রজাগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে

বনদর্শনোৎসুকচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন[৩০]। সর্ব্বমানয়িতা রাম বর্ণিত প্রকারে স্বীয় রাজধানী কোশল হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান, দান, ধ্যান, এবং তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মন্দাকিনী, কালিন্দী, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বেণী, কৃষ্ণবেণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা, বিপাশা প্রভৃতি নদী ও প্রয়াগ, নৈমিষ, ধর্ম্মারণ্য, গয়া, বারাণসী, শ্রীশৈল, কেদার, পুষ্কর, মানস-সরোবর, ক্রমপ্রাপ্তসরোবর (হ্রদবিশেষ), উত্তরমানস সরোবর, হয়গ্রীব-তীর্থ, বিন্ধ্যাচল, সাগর, জ্বালামুখী, মহাতীর্থ ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর, বহু হ্রদ, কার্ত্তিকেয় স্বামীর তীর্থ ও শালগ্রাম তীর্থ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ সকল এবং হরিহরের চতুঃষষ্টি স্থান; বিবিধ আশ্চর্য্য দেশ, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ ও সমুদ্রের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী তীর্থ-নিচয় ও বিন্ধ্য, হরকুঞ্জ এবং সুমেরু, কৈলাস, হিমালয়, মলয়, উদয়, অস্ত, সুবেল ও গন্ধমাদন, এই অষ্ট কুলাচল ও রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবগণের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সমুদায় পুণ্যাশ্রম ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত ভূয়োভূয় দর্শন ও তত্তৎ স্থানের স্থানীয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[৩১।৪১]। এইরূপে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী রাম সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সমুদয় অবলোকন করিয়া দেবগণপূজিত শিবলোকগামী মহাদেবের ন্যায় অমর, কিন্নর ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন[৪২]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।
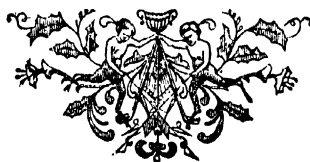
চতুর্থ সর্গ ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ ! অযোধ্যাবাসীরা তীর্থপ্রত্যাগত রামচন্দ্রকে পুষ্পবর্ষণে আকীর্ণ করিলে তিনি দেবগণবেষ্টিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের ন্যায় অমরাবতী তুল্য অযোধ্যাপুরে প্রবেশ করিলেন[১]। পুরঃ প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন, পরে যথাযথ বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ, এবং কুলবৃদ্ধ ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্গণ ও মাতৃগণকে প্রণাম করিলেন[২]। স্নেহাসক্ত সুহৃদ্গণ, মাতৃগণ, পিতা ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বার বার চুম্বনালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদাদি প্রয়োগ করিলে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন[৩]। দশরথগৃহে রামদর্শনার্থ সমাগত জনগণ রামের মুখে নানা প্রিয় কথা শ্রবণ করতঃ আনন্দ বিশেষ অনুভব করিতে লাগিল ও উৎসবোৎফুল্লচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[৪]। রামের আগমন জনিত ঐরূপ উৎসব আট দিন ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল, এই আট দিন অযোধ্যানগরী সুখপ্রমত্ত জনগণের কলকোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল[৫]। রাঘব এই কাল হইতে পরমসুখে নিজ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন এবং ইতস্ততঃ যে সকল দেশ দেশাচার দেখিয়া আসিয়াছিলেন সে সকল সুহৃদ্গণের নিকট বর্ণন করিয়া সুখে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন[৬]। একদা রাম প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা বন্দনাদি বৈধ কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক সভাস্থ ইন্দ্রতুল্য পিতার চরণ দর্শনার্থ গমন করিলেন। এই দিন তিনি সভায় সভ্যজনগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত ও বশিষ্ঠ বামদেবাদির সহিত বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপে পরিতুষ্ট হইয়া দিবসের চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলেন[৭।৮]। অনন্তর পিতার নিকট মৃগয়া যাত্রার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃসকাশ পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিবসেই তিনি মৃগয়াভিলাষে সেনাপরিবৃত হইয়া বরাহ মহিষ প্রভৃতি বিবিধ ভীষণ জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মৃগয়াপ্রবৃত্ত হইলেন[৯]। মৃগয়াবসানে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্নানাদি আহ্নিক কার্য্য সমাধা করতঃ সুহৃদ্গণের ও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে রজনী যাপন করিলেন[১০]। হে অনঘ ভরদ্বাজ ! রাম এইরূপে

কথন মৃগয়া করিয়া কথন বা ভ্রাতৃগণের ও সুহৃদ্গণের সহিত আমোদে রত থাকিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন এবং রাজোপযুক্ত মনোহর ব্যবহার দ্বারা স্বজনগণের চিত্তবৃত্তি দিন দিন সুশীতল করিতে লাগিলেন[১১।১২]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! রামের ও রামের অনুগত লক্ষ্মণ প্রভৃতির বয়ঃকাল কিঞ্চিৎ ন্যূন ষোড়শ বর্ষ হইয়াছে, ভরত মাতামহগৃহে সুখে বাস করিতেছেন, এ দিকে রাজা দশরথও শাস্ত্রানুসারে রাজ্য পালন করিতেছেন[১।২]। মহাপ্রাজ্ঞ রাজা এক্ষণে কেবল রাজ্যপালন করিয়া পরিতুষ্ট নহেন। প্রত্যহই মন্ত্রিগণের সহিত পুত্রগণের বিবাহসম্বন্ধীয় মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত আছেন[৩]। এ দিকে রাম তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া নিজ গৃহে অবস্থান করতঃ দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন। * যেমন শরৎকাল আগত হইলে নির্ম্মলজল সরোবর দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, কুমার রামচন্দ্র সেইরূপ দিন দিন শোষ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন[৪]। যদ্রূপ ভ্রমরপংক্তিযুক্ত প্রফুল্ল শ্বেতারবিন্দ চরমে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, কুমার রামচন্দ্রের আয়তলোচনান্বিত মুখপদ্ম সেইরূপ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল[৫]। তিনি পদ্মাসনে আসীন হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস করতঃ চিন্তারতচিত্তে প্রায়ই নিশ্চেষ্টের ন্যায় থাকেন; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে

---

* শুদ্ধসত্ত্বভাবে দীর্ঘকাল তীর্থ পর্য্যটন করিলে যজ্ঞ দান তপস্যা ও স্বাধ্যায়াদির ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ তীর্থ পর্য্যটনের দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি ও বিষয়বৈরাগ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে "এতে ভৌমাময়া যজ্ঞাস্তীর্থরূপেণ নির্ম্মিতাঃ।" রাম বিশিষ্টাধিকারী, বিশেষতঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবে এক বৎসর তীর্থসেবা করিয়াছেন; তাই তৎপ্রভাবে আজ্ তাঁহার বিবেকবুদ্ধি ও বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। বৈরাগ্য দুই প্রকারে উদিত হইয়া থাকে। কাহার কাহার ভুক্তবৈরাগ্য ও কাহার কাহার অভুক্তবৈরাগ্য হয়। বিষয় ভোগ করিয়া পরে তাঁহার অসারতা নিশ্চয়ে তৎপরিত্যাগে যে যত্ন জন্মে, শাস্ত্রে তাহাকে ভুক্তবৈরাগ্য বলে। শাস্ত্রে বিষয়দোষের বর্ণনা শুনিয়া ও বিষয় ভোগের দুর্দ্দশা দেখিয়া শুনিয়া ও অনুভব করিয়া যে বিষয়বিমুখ হইবার চেষ্টা জন্মে, সে চেষ্টা অভুক্তবৈরাগ্য নামের নামী। মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই রামের বৈষয়িক ব্যাপারের অসারতা প্রতীত হইয়াছিল; সেজন্য তাঁহার উপস্থিত বৈরাগ্যকে ভুক্তবৈরাগ্য বলিতেও পার। তীর্থ পর্য্যটনে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে বিবেকবুদ্ধি জন্মে এবং ভোগ করিতে করিতে কদাচিৎ কাহার কাহার ভুক্তবৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এখানে রামের তীর্থ ভ্রমণ ও মৃগয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর প্রদান করেন না। চিত্রলিখিতের ন্যায় নির্ব্বাক্ থাকেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তিনি অধিক চিন্তাযুক্ত, দুঃখিত, অত্যন্ত দুর্ম্মনা ও কৃশ হইতে লাগিলেন[৬]।[৭]। পরিজনবর্গের নিরতিশয় অনুরোধে কেবল মাত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম ও সদাচার প্রতিপালন করেন, অন্য কিছু করেন না[৮]। গুণগণাকর রামচন্দ্রের তাদৃশী দশা অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেন; এবং মহীপাল দশরথ ও তৎপত্নীগণ পুত্রদিগকে সাতিশয় চিন্তাপরায়ণ ও কৃশাঙ্গ দেখিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন[৯]।[১০]।

একদা রাজা দশরথ শ্রীমান্ রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্নিগ্ধবাক্যে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার এরূপ গাঢ় চিন্তার কারণ কি? রাম পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ কোনও কথা বলিলেন না[১১]। অনন্তর বলিলেন, "পিতঃ! আমার কিছু মাত্র দুঃখ হয় নাই।" পিতৃক্রোড়-গত রাজীবলোচন রাম মাত্র ঐ কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন[১২]।

তদনন্তর রাজা দশরথ কার্য্যজ্ঞ ও বাগ্মী বশিষ্ঠ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরো! রামচন্দ্র কি নিমিত্ত খেদান্বিত হইয়াছেন[১৩]?" মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্ষণ-কাল চিন্তা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! দুঃখিত হইবেন না। রাম-চন্দ্রের খেদের বিশেষ কারণ আছে[১৪]। ধীর পুরুষেরা অল্প কারণে হর্ষ, বিষাদ বা কোপ প্রভৃতির বশ্য হন না। দেখুন, পৃথিব্যাদি মহাভূত সকল সৃষ্টিকাল ব্যতীত অন্য কালে আত্যন্তিক বিকার প্রাপ্ত হয় না[১৫]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মুনিনাথ বশিষ্ঠ পরমখেদান্বিত ও সন্দেহনিমগ্ন রাজা দশরথকে ঐরূপ কহিলে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন[১]। রাজা দশরথ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত মৌনী আছেন এবং রাজমহিষীগণ সাতিশয় কাতরা হইয়া রামচেষ্টাবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাবধান আছেন, এমন সময়ে লোকবিখ্যাত মহাতেজা বিশ্বামিত্র মায়াবীর্য্যবলোন্মত্ত যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত ও নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ হওয়াতে বিঘ্নকারী নিশাচর গণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক যজ্ঞসম্পাদন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় রাজদর্শনাভিলাষে অযোধ্যানগরীতে আগমন করিলেন[২]।[৩]। মহাতেজা বিশ্বামিত্র রাজদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারপাল দিগকে বলিলেন, দ্বারপালগণ! তোমরা শীঘ্র গিয়া রাজাকে বল, কুশিকবংশীয় গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্রনামা ঋষি রাজদর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছেন[৭]। দ্বারপালগণ মহর্ষির বাক্য শ্রবণ মাত্রেই শাপভয়ে ভীত হইয়া অনতিবিলম্বে রাজসমীপে গমন করিল ও রাজন্যমণ্ডলমণ্ডিত সিংহাসনোবিষ্ট মহারাজ দশরথকে সংবাদ প্রদান করিল। সানুনয় বাক্যে কহিল, তরুণাদিত্যসন্নিভ মহাতেজস্বী অরুণবর্ণজটাজুটমণ্ডিত পরমরূপবান্ বিশ্বামিত্রনামক এক মহাপুরুষ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তদীয় তেজঃ দ্বারদেশ অবধি উর্দ্ধস্থ পতাকা পর্য্যন্ত ও হস্তী, অশ্ব, আয়ুধ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু কাঞ্চনবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল করিয়াছে[৮]।[১৩]। নৃপসত্তম দশরথ যষ্টিহস্ত দ্বারপালের নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যেখানে মহর্ষি দণ্ডায়মান ছিলেন মন্ত্রী ও সামন্তগণ সহ সত্বর পদসঞ্চারে তথায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজ উভয় তেজের আধার মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে ভূমিতলে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন সূর্য্যদেব কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন[১৪]।[১৭]। বয়োধিক্য হেতু তাঁহার কেশ পক্ক, দেহ তপঃস্বভাবে রূক্ষ, তাঁহার স্কন্ধদেশ জটায় আবৃত। ইহাকে

দেখিবামাত্র সন্ধ্যাকালীন অরুণবর্ণ মেঘে সমুজ্জ্বল ও সুরঞ্জিত গিরিশিখর বলিয়া ভ্রম জন্মে[১৮]। মূর্ত্তি কমনীয়, তেজঃপ্রভাবে দুর্দ্দর্শ ও অধৃষ্য, প্রগল্‌ভদ্যোতী, অপ্রমত্ত, বিনয়সম্পন্ন, বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট[১৯]। ইঁহাকে দেখিলে চক্ষু ও মন পরিতুষ্ট হয়, ভয়ের সঞ্চারও হয়। মুখমণ্ডল প্রসন্নগম্ভীর, অব্যাকুল ও তেজঃপূর্ণ। সে তেজের প্রভায় সম্মুখস্থ পদার্থ মাত্রেই রঞ্জিত হইতেছে। তাঁহার পরমায়ু অতিদীর্ঘ, ব্রাহ্মণ্য স্থির, হস্তে চিরপরিগৃহীত কমণ্ডলু, চিত্ত স্নিগ্ধ ও সুপ্রসন্ন[২০।২১]। তাঁহার হৃদয় করুণাপরিপূর্ণ; সেই হেতু তাঁহার সম্ভাষণাদিও সুমিষ্ট এবং তাঁহার বীক্ষণও অমৃততুল্য। তিনি যে দিকে নেত্র পরিচালন করেন তদ্দিকস্থ প্রজাপুঞ্জ যেন অমৃত রসে সিক্ত হয়[২২]। তাঁহার স্কন্ধে উপযুক্ত যজ্ঞোপবীত, ভ্রূযুগল উন্নত ও দেহযষ্টি ধবললোমশোভী। দর্শকগণ ইঁহাকে দেখিবা মাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হন[২৩]।

ভূপাল দশরথ পূর্ব্বেই বিনয়াবনত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে এবম্বিধ মহর্ষিকে সন্দর্শন করিয়া বিবিধমণিবিরাজিত কিরীটপরিশোভিত মস্তক ভূতলে অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন[২৪] এবং মহর্ষিও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও মহেন্দ্রসদৃশ মহারাজ দশরথকে সুমধুর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিলেন[২৫]। পরে সমাদর প্রাপ্ত বশিষ্ঠপ্রমুখ দ্বিজাতিগণ তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন, তৎপরে তাঁহার যথাবিধি সপর্য্যা করিলেন[২৬]। এই অবসরে রাজা দশরথ বলিলেন, "হে সাধো! যেরূপ কমলিনীনায়ক স্বীয় প্রভা বিস্তার দ্বারা কমলবন সমুদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ, আমরা আজ আপনার অসম্ভাবনীয় আগমনে ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনে পরম প্রফুল্ল ও সাতিশয় অনুগৃহীত হইয়াছি[২৭]। হে মুনে! অদ্য আমরা ভবদীয়দর্শনলাভে হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিনাশ রহিত অক্ষয় পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম[২৮]। হে মুনিবর! আজ্ যখন আমি আপনার আগমনের লক্ষ্যভূত হইয়াছি; তখন নিশ্চয়ই আমি ইহ জগতে ধন্য ও ধার্ম্মিক মধ্যে গণনীয়[২৯]।" এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ ও কথোপকথন সমাপ্ত হইলে রাজা দশরথ, অন্যান্য রাজগণ ও মহর্ষিগণ সভাপ্রবেশপূর্ব্বক স্ব স্ব আসন সমীপে গমন করিলেন[৩০]। রাজা দশরথ মহর্ষিকে সাতিশয় তপঃশোভাসম্পন্ন দেখিয়া ভয় ও হর্ষের সহিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন[৩১]। মহর্ষিও রাজদত্ত অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিয়া প্রদক্ষিণকারী রাজার সমাদর ও প্রশংসা করিলেন[৩২]। মহর্ষি মহারাজ দশরথ কর্ত্তৃক কথিত প্রকারে সৎকৃত হইয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে শারীরিক ও বৈষয়িক সর্ব্বপ্রকার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৩৩]।

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর ও কুশল জিজ্ঞাসাদি করিলেন[৩৪]। তাঁহারা কথিত প্রকারে কিঞ্চিৎকাল মিলিত হইয়া সম্ভাষণাদি করিলেন, অনন্তর তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন[৩৫]। ক্রমে সভাস্থ সকল ব্যক্তিই মহর্ষিকে পরম সমাদর পূর্ব্বক কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন[৩৬]। ধীমান্ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট ও সভ্যজন কর্ত্তৃক পূজিত হইলে মহারাজ দশরথ পুনর্ব্বার তাঁহাকে অর্ঘ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও গো প্রদান করিলেন[৩৭]। এবং অর্চ্চনান্তে প্রীতমনে ও কৃতাঞ্জলিপুটে সমাগত মহর্ষিকে বলিতে লাগিলেন[৩৮]। মহর্ষে! মরণধর্ম্মা জীবের অমৃত লাভ, পরলোকগত বন্ধুর দর্শন লাভ, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পরে বারিবর্ষণ ও অন্ধের দৃষ্টি লাভ যদ্রূপ, আমাদের সম্বন্ধে আপনার আগমন তদ্রূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক আনন্দপ্রদ[৩৯]। হে তপোধন! পুত্রবিহীন ব্যক্তির ধর্ম্মপত্নীতে পুত্রোৎপত্তি ও দরিদ্র ব্যক্তির স্বপ্নে ধন লাভ যদ্রূপ, আপনার আগমন আমাদের নিকট তদ্রূপ[৪০]। মানবগণ প্রিয়সমাগমে ও প্রণষ্ট বস্তু লাভে যে প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে আপনার আগমনে আমরা তদপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি[৪১]। স্থলচর মনুষ্যের খেচরত্ব লাভ হইলে যেরূপ হর্ষোদয় হয় এবং মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলে তদীয় বান্ধবের যেরূপ আনন্দ হয়, আপনার আগমনে আমি সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা জানিতে চাহি, আপনার আগমন ত সুখে হইয়াছে[৪২]? ব্রহ্মলোকে বাস কাহার না প্রীতিপ্রদ হয়? হে মুনে! আমি সত্য বলিতেছি, আপনার আগমন আমাদের ব্রহ্মলোকবাস সদৃশ সুখপ্রদ[৪৩]। হে বিপ্র! আপনার অভিলাষ কি ও আমাকে আপনার কোন কার্য্য করিতে হইবে তাহা আদেশ করুন। আপনি পরম ধার্ম্মিক, সুতরাং সৎপাত্র, বিশেষতঃ অতিথি[৪৪]।

হে ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ব্বে রাজর্ষি শব্দে অভিহিত হইতেন। এক্ষণে তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে কারণেও আপনি আমার পরম পূজনীয়[৪৫]। যদ্রূপ গঙ্গাজলাভিষেকে সকল সন্তাপ দূরীভূত ও শরীর শীতল হয়, তদ্রূপ, ভবদীয় দর্শন আজ আমাদের সকল সন্তাপ দূরীকৃত ও শরীর মন সুশীতল করিয়াছে[৪৬]। মহর্ষে! আপনার ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, রাগ অর্থাৎ বিষয়বাসনা নাই, এবং রোগাদি বিপদও নাই। অথচ আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়[৪৭]। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! আপনি

সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং আপনার আগমনে আমি নিষ্পাপ হইয়াছি এবং আমার গৃহও পবিত্র হইয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি আজ্ যেন অমৃতময় চন্দ্রমণ্ডলে নিমগ্ন হইয়াছি[৪৮]। হে মুনে! হে সাধো! আমার জ্ঞান হইতেছে, আপনার আগমন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের আগমন। সুতরাং ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত আপনার আগমনে আমি নিতান্ত অনুগৃহীত ও পবিত্র হইয়াছি[৪৯]। আজ আমি আপনার আগমনজনিত পুণ্যে সাতিশয় অনুরঞ্জিত হইলাম এবং বুঝিলাম, আমার জন্ম ও জীবন সার্থক। আপনি আগমন করিয়াছেন ভাবিয়া, আপনাকে দেখিয়া ও আপনার পূজাদি করিয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে, সে আনন্দ আমার অন্তরে পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। অধিকন্তু তাহা উচ্ছ্বলিত হইতেছে। অর্থাৎ জলনিধি চন্দ্রকিরণ দর্শনে যদ্রূপ উচ্ছ্বলিত হয় আমি তদ্রূপ উচ্ছ্বলিত হইতেছি[৫০।৫১]।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যে জন্য আসিয়াছেন, এবং আমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, আপনি মনে করুন, তাহা সিদ্ধ বা করা হইয়াছে। আপনি আমার চিরমাননীয়[৫২]। হে কুশিকনন্দন! কার্য্য সিদ্ধ হইবেক না, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। কারণ, আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। অতএব, বিচার বা বিমর্শ (সন্দেহ) না করিয়া অনুমতি করুন, আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব। আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, আপনি আমার পরম দেব এবং আমিই আপনার সকল কার্য্য সম্পাদন করিব[৫৩।৫৪]।

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের এইরূপ শ্রুতিসুখাবহ বিনয়গর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন[৫৫]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই রাজসিংহ দশরথের অনেকবিধ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন[১]। হে রাজ-শার্দ্দূল! এই পৃথিবীতে তুমি মহাবংশপ্রসূত ও বশিষ্ঠবশবর্ত্তী; সুতরাং তোমার এরূপ বাক্যপ্রয়োগ সংগত ও উপযুক্ত[২]। রাজন্! যাহা আমার মনোগত তাহা বলিতেছি, শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মপরিপালন কর[৩]। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে যজ্ঞারম্ভ করিলে রাত্রিঞ্চর গণ আসিয়া তাহার বিঘ্ন করে[৪]। যখন যখনই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবতা দিগকে পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই তখন তখনই নিশাচরেরা যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া বিঘ্না-নুষ্ঠান করে[৫]। আমি যতবার যজ্ঞের উদ্যোগ করিয়াছি, প্রত্যেক উদ্যোগেই সেই সেই পরাক্রান্ত রাক্ষসেরা আসিয়া আমার যজ্ঞভূমি রক্তমাংসাদি বর্ষণ দ্বারা দূষিত করিয়াছে[৬]। অনেকবার অনেক দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ায় তৎপরে আর যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎসাহ করি নাই, সেজন্য পরিশ্রমও করি নাই। সম্প্রতি আকার যজ্ঞারম্ভ করিয়া আপনার নিকট তৎপ্রতিকারার্থ আগমন করিয়াছি[৭]। রাজন্! ক্রোধ ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ শাপ প্রদান দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ, ক্রোধত্যাগী হইয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। অথচ ক্রুদ্ধ না হইলে শাপ প্রদান করা ঘটে না[৮]। রাজন্! আমি আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক মহাফল লাভ করিব, এই প্রত্যাশায় যজ্ঞভূমি পরিত্যাগ করতঃ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি[৯]। আমি নিতান্ত আর্ত্ত অর্থাৎ কাতর ও শরণপ্রার্থী, আমাকে রক্ষা কর। আমি জানি, অর্থী ব্যক্তির নিরাশ সাধুদিগের নিতান্ত গ্লানিকর[১০]। রাজন্! তোমার পুত্র রাম নিতান্ত শ্রীসম্পন্ন, মত্তসিংহের ন্যায় বিক্রান্ত, মহেন্দ্রসদৃশবীর্য্যশালী ও রাক্ষস বিনাশে দক্ষ[১১]। তোমার সেই বীর, কাকপক্ষধর, * সত্যপরাক্রম, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে প্রদান কর[১২]। রাম মদীয় দিব্যতেজঃপ্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়া

---

* ক্ষত্রিয় দিগের কর্ণসমীপস্থ কেশগুচ্ছ কাকপক্ষ নামে পরিচিত। ভাষা নাম জুল্পি।

অনায়াসেই বিঘ্নকারী রাক্ষসগণের মস্তক ছেদনে সমর্থ হইবেন[১৩]। আমিও বহুপ্রভাবান্বিত বহুঅস্ত্র ও বহুবিদ্যা প্রদান করিয়া রামের পরম শ্রেয়ঃ সাধন করিব এবং তাহাতে তুমি ত্রিলোকমধ্যে পূজ্য হইবে[১৪]। যেরূপ ক্রুদ্ধকেশরীর সম্মুখে মৃগগণ অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, নিশাচরেরা রণস্থলে রামের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না[১৫]। রাম ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইবে না। ক্রুদ্ধ কেশরী ব্যতীত অন্য পশু কি প্রমত্ত কুঞ্জর নিগ্রহ করিতে পারে[১৬]? একে ত তাহারা বলগর্ব্বিত, পাপিষ্ঠ, যুদ্ধকালে কালকূট অপেক্ষাও তীব্র, ক্রুদ্ধকৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দারুণ, তাহাতে আবার তাহারা খরদূষণের ভৃত্য[১৭]। রাজন্! তাদৃশ হইলেও তাহারা রামের তীক্ষ্ণ বাণ সহ্য করিতে পারিবে না। যদ্রূপ ধূলিরাশি অবিশ্রান্তধারাবর্ষী মেঘের বর্ষণে দ্রবিত হয়, তদ্রূপ, নিশাচরেরাও রামবাণবর্ষণে দ্রবিত অর্থাৎ নিবারিত হইবে। হে নরনাথ! পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মদীয় প্রার্থনার প্রতিরোধ করিও না। কারণ এইযে, এই জগতে মহাত্মাদিগের অদেয় কিছুই নাই[১৮।১৯]। মহারাজ! আমি জানিয়াছি এবং আপনিও জানুন, বিঘ্নকারী সমস্ত রাক্ষস রাম হস্তে নিহত হইয়াছে। আপনি ইহাও জানিবেন যে, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না[২০]। আমি জানি, মহাতেজা বশিষ্ঠ জানেন, ও অন্যান্য দূরদর্শী মহাত্মারাও জানেন যে, কমললোচন রাম মহাত্মা। তিনি সামান্য মানুষ নহেন[২১]। দেখুন, শিবি অলর্ক প্রভৃতি মহাত্মা নরপতিগণ পরোপকারার্থে স্বীয় দেহস্থ মাংস ও চক্ষুরাদি প্রদান করিয়াছিলেন। যদি তোমার ধর্ম্ম, মহত্ব ও যশঃ লাভের বাসনা থাকে, তবে, আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত আত্মজ রামচন্দ্রকে আমায় প্রদান কর[২২]। রামচন্দ্র যে-যজ্ঞে আমার যজ্ঞ-শত্রু ও সর্ব্ববিঘ্নকারী রাক্ষস দিগকে নিধন করিবেন, আমার সেই যজ্ঞ দশ দিন সাধ্য[২৩]। অতএব, হে কাকুৎস্থ! তোমার বশিষ্ঠ প্রমুখ মন্ত্রী অনুমতি প্রদান করুন, অনন্তর তুমি রামকে আমার হস্তে অর্পণ কর[২৪]। রাঘব! তুমি কালজ্ঞ। সেই নিমিত্ত বলিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার বৃথা শোকে যেন আমার যজ্ঞ কাল বৃথা অতীত না হয়[২৫]। উপযুক্ত কালে অল্পমাত্র উপকার করিলেও তাহা মহোপকার বলিয়া গণ্য হয়, পরন্তু অকালে মহৎ কার্য্য করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়[২৬]।

ধর্ম্মপরায়ণ মহাতেজা বিশ্বামিত্র মুনি এই সকল ধর্ম্মার্থ সঙ্গত বাক্য বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ও রাজা দশরথ মহর্ষির সেই সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক

উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যুক্তিযুক্ত বাক্য ব্যতিরেকে ধীমান্ ব্যক্তির সন্তোষ ও স্বীয় মনের প্রাশস্ত্য উৎপন্ন হয় না[২৭।২৮]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! রাজসত্তম দশরথ বিশ্বামিত্রের উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অনন্তর অতি দীন বাক্যে কহিতে লাগিলেন[১]। মহর্ষে! রাজীবলোচন রাম ঊনষোড়শবর্ষ বয়স্ক। অদ্যাপি তাহার রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হয় নাই[২]। প্রভো! আমার পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সেনা আছে, আমি তাহার অধীশ্বর, তাহা লইয়া আমিই রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব[৩]। আমার সেই সকল সৈন্য সকলেই বিক্রান্ত ও মন্ত্রণাপটু। আমি রণাঙ্গনে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত সেনা পরিরক্ষণ করিয়া থাকি[৪]। যদ্রূপ সিংহ মত্তহস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ, আমিও সেই সমস্ত বীরসেনায় সমন্বিত হইয়া দেবগণ পরিবৃত মহেন্দ্রকেও পরাভূত করিতে পারি[৫]। রাম বালক, যুদ্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সৈন্যবলাবল বুঝে না, অদ্যাপি সে অন্তঃপুরস্থ ক্রীড়াকল্পিত সংগ্রাম ব্যতীত প্রকৃত সংগ্রাম অবলোকন করে নাই[৬]। রাম অদ্যাপি পরমাস্ত্রবিৎ হয় নাই, যুদ্ধনিপুণও হয় নাই এবং রণক্ষেত্রে যে কিরূপে অসংখ্য বীরের সহিত যুগপৎ অস্ত্রযুদ্ধ করিতে হয় তাহাও সে জ্ঞাত নহে[৭]। অদ্যাপি পুষ্পাদিপরিশোভিত নগরোপবনে, উদ্যানকুঞ্জে ও বিবিধ কুসুমশোভিত চত্বর ভূমিতে রাজকুমারগণের সহিত পর্য্যটন ও ক্রীড়া করে[৮।৯]। হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি আবার আমার ভাগ্যবিপর্য্যয় বশতঃ রাম হিমকণাসিক্ত পদ্মের ন্যায় দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছে[১০]। রাম যথাযোগ্য অন্ন ভোজন করিতে অক্ষম হইয়াছে ও ভ্রমণে বিরত আছে। জানি না, সে কি এক অন্তঃস্থ খেদে পরিতপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই চিন্তারত ও মৌনী হইয়া থাকে[১১]। হে মুনিনাথ! আমি ভৃত্য, দারা ও পরিজন বর্গের সহিত রামের নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি ও অনবরত চিন্তায় শরন্মেঘের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইয়াছি। মহাত্মন্! রাম একে বালক, তাহাতে আবার তাদৃশী পীড়া। এ অবস্থায় কিরূপে আমি তাহাকে সমরবিশারদ কূটযোদ্ধা নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ভবদীয় হস্তে সমর্পণ করিতে পারি[১২।১৩]? হে সাধো! হে বুদ্ধিমান্! বালাঙ্গনার অঙ্গসঙ্গ, সুধারস সেবন,

ও রাজ্যের আধিপত্য প্রভৃতি যত প্রকার সুখ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা আমি পুত্র-স্নেহজনিত সুখকে সমধিক গুরুতর জ্ঞান করিয়া থাকি[১৪]। ধার্ম্মিক লোকেরাও পুত্রস্নেহে আবৃত হইয়া বহুপরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর দুরন্ত তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন[১৫]। হে মহামুনে! জীব দিগের স্বভাব বা ধর্ম্ম এই যে, তাহারা ধন, দারা ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তথাপি পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারে না[১৬]। রাক্ষসেরা নিতান্ত ক্রূর, ক্রূর-কর্ম্মকারী ও কূটযুদ্ধবিশারদ। অনভিজ্ঞ ও শিশু রাম তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করুক, এ উক্তিও আমার অসহনীয়। অর্থাৎ উহা মনে হলেও ক্লেশ জন্মে[১৭]। মুনিরাজ! আমি রামবিরহে এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে ক্ষমবান্ নহি; সেজন্য ও বলিতেছি, আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না[১৮]। আমি পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যাগ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি কষ্টসাধ্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নব-সহস্রবর্ষ অতিক্রম করিয়া চারিটী সন্তান লাভ করিয়াছি[১৯]। যেরূপ শরীরের মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ, আমার চারিটী সন্তানের মধ্যে কমললোচন রাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাম ব্যতিরেকে অন্য তিনটীও জীবনধারণে সমর্থ হইবে না[২০]। এ অবস্থায় যদি আপনি রামকে রাক্ষস হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন, আমি পুত্রহীন ও গতায়ু হইয়াছি[২১]। চারিটী পুত্রের মধ্যে রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সকল গুণের আধার। সেই কারণে রামের প্রতি আমার ঐকান্তিকী প্রীতি। সেজন্য আমার অনুরোধ—আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না[২২]। মুনিবর! যদি নিশাচরবধ সাধন করাই আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চতুরঙ্গ বল ও তৎসমন্বিত আমাকে লইয়া যাউন[২৩]। আপনি বলুন, যে সকল রাক্ষসেরা আপনার যজ্ঞে বিঘ্নোৎ-পাদন করে তাহারা কিরূপ বলবীর্য্যশালী ও কাহার পুত্র। তাহাদিগের নাম কি ও তাহাদের আকৃতিই বা কিরূপ[২৪]? আমি, রাম, অথবা আমার অন্যান্য বালক, সেই সকল কূটযোধী নিশাচরদিগের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ কি না তাহাও বলুন[২৫]। সেই সকল বলদৃপ্ত নিশাচরের যুদ্ধে কিপ্রকারে অবস্থিতি করিতে হয় তাহাও উপদেশ করুন[২৬]। শুনিয়াছি, বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা মহাবল পরাক্রান্ত রাবণ নামে এক রাক্ষস আছে[২৭] যদি সেই দুরাত্মা আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা কেহই সমর্থ নহি[২৮]। হে ব্রহ্মন্! কালবিশেষে প্রভূতবলশালী ও সমধিক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্মগ্রহণ করে, আবার কালক্রমে

তজ্জাতীয় জীব দিগের বলবীর্য্যাদি হ্রাস হইয়া থাকে[২৯]। এখন যে কাল, এ কালে আমরা রাবণাদি শত্রুর সম্মুখে (যুদ্ধার্থ) দণ্ডায়মান হইতে ক্ষমবান্ নহি। ইহা বিধাতারই নির্ব্বন্ধ; সন্দেহ নাই[৩০]। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য ও আপনি আমার পরম দেবতা। সেইজন্য বলি, অনুগ্রহ করিয়া আমার এবং আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন[৩১]। হে তপোধন! অল্পবীর্য্য মানবের কথা দূরে থাকুক; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগেরাও রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে[৩২]। রাক্ষসরাজ রাবণ রণস্থলে ভূরিবীর্য্য বীরেরও তেজ হরণ করিয়া থাকে। তাহার সহিত যুদ্ধ করা কেবল বালকের নহে; আমাদের পক্ষেও অসমঞ্জস[৩৩]। যে কালে মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ সে কাল নহে। এ কালে সজ্জনেরাও হীনবল। এই কালে এই রঘুসন্তানও বার্দ্ধক্যজীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে[৩৪]। হে ব্রহ্মন্! যদি মধু-দৈত্যের পুত্র লবণ নামক রাক্ষস আপনাব যজ্ঞের বিঘ্নকারী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি রামকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইব না[৩৫]। বলুন, সুন্দোপসুন্দের পুত্র মারীচ এবং সুবাহু কি আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারী হই-য়াছে? যদি তাহারা আপনার যজ্ঞনাশক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি আপনাকে পুত্র দিব না। ব্রহ্মন্! যদি আপনি বলপূর্ব্বক লইয়া যান, তাহা হইলে জানিবেন, আমি নিশ্চয়ই হত হইয়াছি। অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত সে পক্ষে আমার উপায়ান্তর নাই[৩৬।৩৭]। ২১.৩৬৭

রঘূদ্বহ মহারাজ দশরথ মৃদুবিনয়ে এই সকল কথা বলিয়া অনন্তর মহর্ষির অভিপ্রেতসিদ্ধিবিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিলেন[৩৮]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ! মহীপতি দশরথ সবিনয়ে সাশ্রুনয়নে বিশ্বামিত্র ঋষিকে ঐরূপ কহিলে তাঁহার ক্রোধোদয় হইল। তিনি কোপব্যঞ্জক স্বরে রাজাকে বলিতে লাগিলেন[১]। রাজন্! তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে, কার্য্যসাধন করিবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতেছ। তুমি সিংহ হইয়াও শৃগাল হইবার বাঞ্ছা করিতেছ[২]। অহে মহীপাল! এরূপ করা রঘুবংশীয় দিগের নিতান্ত অনুপযুক্ত। তুমি যে কার্য্য করিতে উদ্যত, এ কার্য্য রঘুকুলের বিপরীত অর্থাৎ রঘুবংশীয় দিগের স্বভাববহির্ভূত। আমি জানিতাম, শীতাংশু শীতরশ্মি ব্যতীত কখন উষ্ণরশ্মি উৎপাদন করেন না[৩]। মহারাজ! যদি তুমি প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হও তাহা হইলে আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি পুনরায় সেই স্থানে গমন করি। তুমি হতপ্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত সুখে বাস কর[৪]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহানুভাব বিশ্বামিত্র কোপাসক্ত হইলে বসুমতী কাঁপিতে লাগিলেন এবং ভয়ে দেবগণও কম্পিত হইলেন[৫]। অনন্তর সুব্রতপরায়ণ ধীর ও বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠ মহামুনি বিশ্বামিত্রের ক্রোধাবির্ভাব হইয়াছে জানিয়া রাজা দশরথকে বলিতে লাগিলেন[৬]। রাজন্! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মূর্ত্তিমান্ দ্বিতীয় ধর্ম্মের সদৃশ। আপনার লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত সদ্‌গুণ আছে। ধীরতা, সত্যবাদিতা, যশস্বিতা, সমস্তই আপনাতে বিদ্যমান। আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন লোকে ধর্ম্মে ও যশে বিখ্যাত, বিশেষ বিখ্যাত। বিশেষতঃ আপনি ধৃতিমান্ ও ব্রতপরায়ণ। সুতরাং আপনি ধর্ম্মপরিত্যাগের যোগ্যপাত্র নহেন[৭।৮]। প্রতিজ্ঞা পালন করা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা প্রতিপালন করুন, ত্যাগ করিবেন না। ত্রিভুবনেশ্বর মুনির আদেশ প্রতিপালন করুন[৯]। মহারাজ! "আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া এখন যদি তাহা প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে আপনি এ যাবৎ ব্রত নিয়ম যাগ যজ্ঞ, যে কিছু ধর্ম্ম করিয়াছেন সে সমস্তই নষ্ট হইবে। সুতরাং সম্প্রতি রামকে প্রদান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য[১০]। আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং দশরথ নামে সুপ্রসিদ্ধ ভূপতি হইয়া যদি সত্য প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে আর কোন্

ব্যক্তি তাহা করিবে[১১] ? মহীপাল! আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ লর্গের ব্যবহার দেখিয়া অন্যান্য অজ্ঞ মানব ধর্ম্মমর্য্যাদায় স্থিতি করিবেক, সেজন্যও আপনার ধর্ম্মমর্য্যাদা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য[১২]। হে মহারাজ! দেবলোকে হুতাশন যেরূপ অমৃত রক্ষা করিয়া থাকেন, রামচন্দ্র কৃতাস্ত্রই হউন, আর অকৃতাস্ত্রই হউন, পুরুষসিংহ মহাতেজা বিশ্বামিত্র রামকে সর্ব্বদা সেইরূপ রক্ষা করিবেন। রাক্ষসেরা ইঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে নরনাথ! এই বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, বীর্য্যশালিগণের শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান্ ও তপস্যার আশ্রয় স্বরূপ[১৩।১৪]। চরাচর ত্রিজগতের মধ্যে ইনিই বিবিধ দৈব, মানুষ ও আসুরাদি অস্ত্র অবগত আছেন। অন্য কেহ ইঁহার সমান অস্ত্রবিৎ নাই এবং হইবেও না[১৫]। দেবতা, ঋষি, অসুর, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সকলে সমবেত হইলেও প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সদৃশ হইতে পারিবেন না[১৬]। কুশিকবংশসম্ভূত এই বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে যখন রাজ্য শাসন করিতেন, তখন শক্রজয়ার্থ ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে অন্যের অসংহার্য্য মহাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন[১৭]। সেই সকল দিব্যাস্ত্র কৃশাশ্বসম্ভূত, প্রজাপতিপুত্রসমতেজস্বী, মহাবীর ও সাতিশয় দীপ্তিমান্। তাহারা ইঁহার তপোবলে বশীভূত হইয়া অনুচরের ন্যায় ইঁহার পরিচর্য্যা করিত[১৮]। দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সুপ্রভা নাম্নী দুই কন্যা ছিল, তাহাদের গর্ভে পরমদুর্জ্জয় এক শত পুত্র উৎপন্ন হয় ও উভয়ের মধ্যে লব্ধবরা জয়া অসুর বধার্থ পঞ্চাশৎ অপত্য উৎপাদন করেন। তাহারা সকলেই দেবতুল্যকামচারী (দেবতারা যেমন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন ইহারাও সেইরূপ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন[১৯।২০]।) সুপ্রভাও পঞ্চাশৎ অপত্য উৎপাদন করেন, এবং তাহারাও অস্ত্ররূপী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, ভীমাকৃতি ও বলশালী[২১]। মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবম্প্রভাবান্বিত ও মহাতেজস্বী। ইনি মুনি ও বিশ্বমান্য। সুতরাং ইনি রামকে লইয়া যাইবেন, তাহাতে ভাবনার বিষয় কি? ভাবিয়া বুদ্ধি বিপ্লব করিবেন না ও ভীত হইবেন না[২২]। হে মহীপাল! মুনিশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব সাধু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রভাবে যখন আসন্নমৃত্যু জীবেরও মৃত্যুভয় তিরোহিত ও অমরত্ব লাভ হয়; তখন মহাপ্রভাবশালী রামচন্দ্রের জন্য ভয় কি! আপনি মহর্ষির সহিত রামকে প্রেরণ করিতে মূঢ়চেতার ন্যায় বিমন হইবেন না[২৩]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠবাক্যশ্রবণে বিষাদ-পরিহার পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্বারপালকে আদেশ করিলেন১। "দ্বারপাল! লক্ষ্মণের সহিত সত্যপরাক্রম মহাবাহু রামচন্দ্রকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর২।" দ্বারপাল মহারাজের আদেশে রাম লক্ষ্মণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় মহীপতি সন্নিধানে আগমন করিল ও কহিল, হে দোর্দ্দণ্ডদলিত শত্রুপক্ষ! মহাদেব! যদ্রূপ ভ্রমর রাত্রিকালে পদ্মিনী বিষয়ে উন্মনা থাকে, সেইরূপ, শত্রুদলনকারী রামচন্দ্র বিমনা হইয়া স্বীয় গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন৩।৪। রাজন্! আমি তাহাকে আহ্বান করিলে তিনি "যাইতেছি" এইমাত্র বলিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন। তিনি খেদযুক্ত ও একাকী থাকিতে সচেষ্ট, কাহার নিকট অবস্থিতি করিতে ইচ্ছুক নহেন৫। দ্বারপাল এইরূপ কহিলে রাজা নিকটবর্ত্তী রামানুচরকে আশ্বাস প্রদান করত যথাযথ তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন৬। কহিলেন, বৎস! রাম কি নিমিত্ত এরূপ অবস্থাপন্ন? রাজবাক্য শ্রবণে রামানুচর সাতিশয় বিষণ্ণচিত্তে কহিলেন৭। মহারাজ! আপনার পুত্র রাম যে কি নিমিত্ত তদ্রূপ অবস্থাপন্ন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা এই মাত্র বুঝিতেছি ও দেখিতেছি, প্রগাঢ়চিন্তানিবন্ধন বয়স্থ রাম দিন দিন কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্দর্শনে আমরাও সাতিশয় চিন্তানিরত ও কৃশ হইতেছি৮। রাজীবলোচন রাম ব্রাহ্মণগণ সহ তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত হওয়া অবধি দিন দিন ঐরূপ দুর্ম্মনা ও দিন দিন কৃশ হইতেছেন৯। তাঁহার কোনও কার্য্যে ইচ্ছা নাই, কেবল আমরা যত্ন সহকারে প্রার্থনা করায় মাত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, অন্যান্য দৈবসিক কার্য্য ম্লান মুখে কখন করেন, কখন বা নাও করেন১০। স্নান, দেবপূজা, দান, প্রতিগ্রহ ও ভোজন, সকল কার্য্যেই তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখি এবং আমরা অনুরোধ করিলেও তিনি তৃপ্তিশেষ ভোজন করেন না১১। রাম ইতি পূর্ব্বে পুরনারীগণের সহিত অঙ্গনমধ্যে বারিধারাপানপরিতৃপ্ত চাতকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ করেন না১২। স্বর্গ যদ্রূপ পতনো-

সুখ স্বর্গীকে আনন্দিত করে না, সেইরূপ, মাণিক্যখচিত কেয়ূরাদি বিবিধ আভরণ তাঁহাকে আর সেরূপ আনন্দিত করে না। হে রাজন্! রাম এখন পরিমলবাহী মৃদুগন্ধবহনিষেবিত লতানিকুঞ্জমধ্যবর্ত্তিনী ক্রীড়াপরায়ণা রমণী-বৃন্দ দেখিয়া পরিতুষ্ট হন না, প্রত্যুত বিষণ্ণ হন[১৩।১৪]। রাজভোগ্য মনোহর সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না অধিকন্তু সে সমুদয় দেখিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে খেদ প্রকাশ করিতে থাকেন[১৫]। হাবভাব-লাবণ্যবতী শোভমানা পুরনারী গণের নৃত্য দর্শন করিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হয় না, অধিকন্তু তিনি ঐ সমস্ত রমণীগণকে অশেষক্লেশদায়িনী বলিয়া নিন্দা করেন[১৬]। অনিন্দিত পান, ভোজন, শয্যা, যান, ক্রীড়াদ্রব্য, স্নান ও আসনাদি বিষয়ে উন্মাদচেষ্টিতের ন্যায় ব্যবহার করেন[১৭]। বলেন—সম্পদ, বিপদ, গৃহ, মনোরথ, সকলই অসার। "অসার" এই মাত্র বলিয়া আর কিছু বলেন না, মৌন হন[১৮]। তিনি হাস পরিহাস ত্যাগ করিয়াছেন, ভোগে নিস্পৃহ হইয়াছেন, কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, কেবল মাত্র মৌনই তাঁহার প্রিয় হইয়াছে[১৯]। রাজন্! যদ্রূপ লতা মঞ্জরী-শোভিতা চঞ্চলনয়না মৃগী হাবভাবাদি শৃঙ্গার চেষ্টার দ্বারা বৃক্ষ দিগকে কামাবিষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ, বিবিধকুসুম-সুশোভিতা অলকাবলিভূষিতা শৃঙ্গারভাবচেষ্টিতা চঞ্চলনয়না ললনারাও আজ্ কাল রামচন্দ্রকে সাত্ত্বিকোল্লাসে পাতিত করিতে সমর্থ হইতেছে না[২০]। যেমন কোন উচ্চবংশীয় মনুষ্য নীচ জাতির ক্রীতদাস হইলে সে একান্তে, দিগন্তে, নদীতীরে ও অরণ্যে বাস করিতে ভাল বাসে, সেইরূপ; রামও বিষণ্ণচিত্তে জনশূন্য অরণ্যাদিতে কালযাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন[২১]। মহারাজ! রাম অশন, বসন, ভূষণ ও যানাদি গ্রহণ বিষয়ে বিমুখ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুগমন করিতেছেন[২২]। হে জননাথ! রাম সর্ব্বদাই একাকী বিজন প্রদেশে উপবিষ্ট থাকেন। হাস্য, গান, রোদন, কিছুই করেন না[২৩]। বদ্ধপদ্মাসন নামক যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বাম করে কপোলবিন্যাস করতঃ সর্ব্বক্ষণ, শূন্যমনে অবস্থান করেন[২৪]। তাঁহার অভিমান নাই এবং তিনি রাজ্যের অভিলাষ করেন না। তাঁহার সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিষাদ হয় না[২৫]। বলিতে কি, তদীয় হৃদয়ে সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, কিছুই নাই। তিনি যে কি করেন, কোথায় যান, কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ধ্যান করেন কি আর কি করেন, তাহা আমরা জানি না, বুঝিতেও পারি না[২৬]। মহারাজ! যদ্রূপ হিমাগমে তরুগণ দিন দিন কৃশ ও বিবর্ণ হইতে থাকে, আমাদের রাম সেইরূপ

দিন দিন কৃশ ও বিবর্ণ হইতেছেন[২৭]। তাঁহার অনুগামী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, তাঁহারাও তাঁহার প্রতিবিম্বের সদৃশ অর্থাৎ কৃশ ও বিবর্ণ হইতেছেন[২৮]। ভৃত্যগণ, অন্যান্য রাজগণ ও জননী সকল তাঁহাকে বারম্বার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি "কিছু না" এইমাত্র বলিয়া মৌন ও নিশ্চেষ্ট হন[২৯]। পার্শ্ববর্ত্তী সুহৃদ্গণকে নিয়তই উপদেশ দেন যে, "হে সুহৃদ্গণ! তোমরা আপাতমধুর ভোগে ঐকান্তিক নিমগ্ন হইও না[৩০]।" হে রাজন্! রামচন্দ্র বিপুলবিভবপূর্ণ বিলাসগৃহে বিবিধভূষণভূষিতা বিলাসবতী রমণীগণকে দেখিয়া কিছু মাত্র স্নেহ প্রকাশ করেন না; অধিকন্তু তাহাদিগকে বিনাশকারিণী বলিয়া মনে করেন[৩১]। তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষোভক্ষুভিত স্বরে বলেন, হায়! যে চেষ্টায অনায়াসে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় লোক সকল সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বৃথা আয়ুঃক্ষয় করিতেছে[৩২]। তাঁহাকে "সম্রাট হও" বলিলে তিনি পার্শ্বস্থ অনুজীবী দিগকে উন্মাদ মনে করেন ও অন্যমনা হইয়া উপহাস্য করেন[৩৩]। কাহার কথায় কর্ণপাত করেন না, তাঁহার সম্মুখে গেলে তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না, অন্যমনস্কের ন্যায দৃষ্টি পরিচালন করেন এবং মনোহর বস্তু উপস্থাপিত করিলে তিনি তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হন না[৩৪]। আকাশরূপ সরোবরে আকাশ-নলিনীর উৎপত্তি যদ্রূপ বিস্ময়াবহ ও অসম্ভব, সেইরূপ, মনও অসম্ভব ও বিস্ময়াবহ। এই বিশ্বাসে তিনি এই সকল মনঃকল্পিত বাহ্যবস্তু দর্শনে বিস্ময়বিহীন হইয়াছেন[৩৫]। কামবাণ নারীমধ্যগত রামের হৃদয় ভেদে অসমর্থ। যদ্রূপ জলধারা দুর্ভেদ্য বৃহৎ প্রস্তর ভেদ করিতে অসমর্থ, সেইরূপ, কামবাণও দুর্ভেদ্য রামহৃদয় ভেদে অশক্ত[৩৬]। তিনি ধন সমুদয়কে আপদের আকর মনে করেন, করিয়া অর্থী দিগকে বিতরণ করেন। তদুপলক্ষে সর্ব্বদাই বলেন, ধন আপদের অদ্বিতীয় বাসস্থান। তোমরা কেন তাহা প্রার্থনা কর[৩৭]? একটী শ্লোক গান করেন, তাহা এইরূপ—"ইহা আপদ, ইহা সম্পদ, এ সকল কেবল কল্পনা, মোহের মহিমা ও মনের খেলা[৩৮]।" তিনি প্রায়ই বলেন, লোক সকল "আমি হত হইলাম, অনাথ হইলাম," এইরূপে বিলাপ করে অথচ বৈরাগ্য গ্রহণ করে না। ইহা অতীব আশ্চর্য্য[৩৯]। মহারাজ! রঘুবংশকাননের শালবৃক্ষস্বরূপ শত্রুহন্তা রামের এইরূপ নির্ব্বেদ দর্শনে আমরা সাতিশয় খিদ্যমান হইয়াছি পরন্তু তাহার প্রতিবিধানার্থ কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। হে জলজলোচন! হে বহুশত্রুনাশন! আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি, অতএব আপনিই ইহার উপায় বিধান

করুন[৪০।৪১]। কোন রাজা কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপহাস করিয়া থাকেন[৪২]। ইহা অমুক, তাহা অমুক, তাহা এই, ইত্যাদি আকারের যে জগৎ নামক পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে, এ সমস্তই নশ্বর সুতরাং মিথ্যা অর্থাৎ অবস্তু। এ সকল কিছুই নহে এবং আমিও কিছু নহি। রাম এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন। নাথ! শত্রু, মিত্র, আত্মা, রাজ্য, মাতা, সম্পত্তি, এ সকলের প্রতি তাঁহার আস্থা নাই এবং কোনও বিষয়ে যত্ন, চেষ্টা, আশা বা আশয় নাই[৪৩।৪৪]। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে রামকে মূঢ় ও মুক্ত দুএর কিছুই বলিতে পারি না। কোন বিষয়ে আস্থা নাই, চেষ্টা নাই, স্পৃহা নাই, অথচ তাঁহার আত্মবিশ্রান্তি লাভ হয় নাই। আত্মবিশ্রান্তি অর্থাৎ শান্তি লাভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। রামের ঈদৃক অবস্থা দর্শনে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি[৪৫]। ধন, পিতা, মাতা, রাজ্য, কার্য্যচেষ্টা, এ সমুদায়ে কি হইবে? প্রয়োজন নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি প্রাণত্যাগসঙ্কল্পে কালকর্ত্তন করিতেছেন[৪৬]। যেমন চাতক পক্ষী অনাবৃষ্টি দর্শনে উদ্বিগ্নচিত্ত হয়, সেইরূপ, রামচন্দ্রও পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব ও রাজ্যাদি বিষয়ে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ সকল মোক্ষের প্রতিবন্ধক। মহারাজ! অপদরূপ লতা আপনার পুত্র রামকে আশ্রয় করিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে; দয়া করিয়া এই সময়ে তাহার উন্মূলন চেষ্টা করুন[৪৭।৪৮]। হে প্রভো! তাদৃক্‌স্বভাবান্বিত রাম এই সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়াও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সংসারকে বিষতুল্য জ্ঞান করিতেছেন[৪৯]। এই অবনীমণ্ডলে আপনি ভিন্ন এমন কোন মহাজ্ঞানী নাই যিনি রামচন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ[৫০]। যেরূপ দিনকর কিরণজাল বিস্তার দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিয়া স্বীয় সমুজ্জ্বল জ্যোতির সফলতা সাধন করেন, সেইরূপ, সদুপদেশদ্বারা রামচন্দ্রের হৃদয়স্থিত সন্তাপরাশি তিরোহিত করিয়া স্বীয় সাধুতার সফলতা সাধন করিতে পারে, এমন ব্যক্তি আপনি ব্যতীত আর কে আছে[৫১]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন, ওহে প্রাজ্ঞগণ! রামচন্দ্র যদি সত্য সত্যই তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে, হরিণগণ যেমন তাহাদের যূথপতিকে আনয়ন করে, সেইরূপ, তোমরাও তাঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর[১]। তাঁহার ঐ মোহ কোন বিপত্তি বা রাগবশতঃ হয় নাই। অনুমান হয়, তাহা বিবেক ও বৈরাগ্য প্রযুক্তই হইয়াছে। যাহারা বিবেকবৈরাগ্যে আক্রান্ত হয়, আমি জানি, তাহাদেরই ঐ প্রকার মহাফল বোধ (তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বলক্ষণ) উপস্থিত হইয়া থাকে[২]। রাম এখনই এখানে আসুন, এখনই আমরা তাঁহার সকল মোহ (সংশয়) বায়ুর পর্ব্বতাগ্রবর্ত্তী মেঘ অপনয়ন করার ন্যায় অপনয়ন করিব[৩]। যুক্ত্যাদির দ্বারা মোহ অপনীত হইলে তিনি আমাদের ন্যায় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন[৪]। মহারাজ! যদ্রূপ অমৃত পান করিলে সত্য, মুদিতা, (পরসুখে সুখী), প্রজ্ঞা (নির্ম্মল জ্ঞান), শান্তি, তাপশূন্যতা, পুষ্টি ও রূপলাবণ্যাদি লাভ করা যায়, সেইরূপ, রামচন্দ্রও ঐ সকল প্রাপ্ত হইবেন[৫] এবং সুখদুঃখাতীত, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমবুদ্ধি, পরাবর জ্ঞানী ও মহাসত্ত্ব হইবেন[৬]।[৭]

হে ভরদ্বাজ! মুনিনাথ বিশ্বামিত্র এই সকল কথা কহিলে নরনাথ দশরথ আহ্লাদিত হইয়া রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনরায় অন্য দূত প্রেরণ করিলেন[৮]। ওদিকে রাম পিতৃসন্নিধানে আগমন করিবার জন্য প্রফুল্লচিত্তে গৃহাবস্থিত আসন হইতে সূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হইলেন[৯]। অনন্তর লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে পিতৃসমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। যেমন সুরপতি স্বর্গভূমে আগমন করেন, তেমনি, রামও পিতৃসমীপে আগমন করিতে লাগিলেন[১০]। অনতিবিলম্বে রাম দূর হইতে অবলোকন করিলেন, মহারাজ দশরথ দেবগণপরিবৃত সুররাজের ন্যায় রাজন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন[১১]। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিগণ, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট আছেন[১২]। আরও দেখিলেন, চারুচামরধারিণী ললনাগণ উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে মূর্ত্তিমতী দিগঙ্গনা বলিয়া ভ্রম হয়[১৩]।

এ দিকে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, মহারাজ দশরথ ও অন্যান্য নৃপতিগণ দেখিলেন, সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবান্ রাম আগমন করিতেছেন[১৪]। তাঁহারা দেখিলেন, সর্ব্বজনসেব্য সত্ত্বগুণাবলম্বী রাম স্বীয় গাম্ভীর্য্যাদি গুণে তাপনাশন ও শৈত্যগুণযোগী ভূধরের সদৃশ[১৫] ও নিতান্ত প্রিয়দর্শন। তাঁহার অঙ্গ সকল সমবিভক্ত, সুব্যবস্থিত সুতরাং সুসৌষ্ঠব ও সর্ব্বমনোহর। তাঁহার মূর্ত্তি অনুগ্রহ ও পুরুষার্থ লাভের (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) একান্ত যোগ্য[১৬]। যৌবনের আরম্ভ হইলেও তাঁহার মূর্ত্তিতে যৌবনোচিত চাপল্য নাই, অধিকন্তু বৃদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়। অবিবেকের অবসান হওয়ায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেগপরিশূন্য অথচ পরমানন্দ (মোক্ষ) অপ্রাপ্তে অম্লানন্দবিশিষ্ট। দেখিলেই প্রতীত হয়, তাঁহার অভীষ্ট নিকটবর্ত্তী হইয়াছে[১৭]। তিনি বিচারশীল, পবিত্রগুণগণের আশ্রয়, সত্ত্বগুণের আধার, উদারস্বভাব, আর্য্য, অক্ষোভ ও দর্শনীয়তম[১৮।১৯]। কথিতপ্রকার গুণগণে ভূষিত, নির্ম্মল বস্ত্রাভরণশোভিত কমললোচন রাম পিতৃসমীপে আগমন করতঃ মনোহর মণি ভূষিত মস্তক নমন পূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন[২০।২১]

মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র "রামকে আনয়ন কর" এইরূপ বলিতেছিলেন, এই অবসরে রাম পিতৃপদ বন্দনার্থ তথায় আগমন করিলেন। প্রথমে, পিতার, পরে মাননীয়তম বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের, তৎপরে সভাস্থ বিপ্রবৃন্দের, বন্ধুবৃন্দের, অন্যান্য গুরুজনের ও সুহৃদ্বর্গের যথাযথ বন্দন অভিবাদন ও নমস্কারাদি করিলেন[২২।২৩]। সামন্ত (অধীন রাজা) রাজগণ নমস্কার করিলে অল্প শিরোনমন করতঃ বিনয়গর্ভবাক্যে তাহাদিগের পরিতোষ উৎপাদন করতঃ মুনিদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পিতার পুণ্যময় সমীপে উপনীত হইলে রাজা তাঁহার পুনঃ পুনঃ মস্তকাঘ্রাণ, আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন[২৪।২৬]। পরে সস্নেহে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়কে পুনঃ পুনঃ রাজহংস যেমন পদ্মকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে, সেইরূপ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন[২৭]। অনন্তর রাজা "পুত্র! ক্রোড়ে উপবেশন কর" এইরূপ বলিলে ও তাঁহারা সাস্তরণ বিচিত্রাংশুকযুক্ত ভূপ্রদেশে উপবেশন করিলেন[২৮]। রাজা কহিলেন, পুত্র! তুমি বিবেক প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কল্যাণভাজন হইয়াছ সত্য; পরন্তু জড়সমান জীর্ণ বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে খেদযুক্ত করা উচিত নহে[২৯]। বৎস! যাহারা বৃদ্ধ দিগের, ব্রাহ্মণগণের ও গুরুজনের আজ্ঞা বাক্য রক্ষা করে, তাহারাই পবিত্র পথ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাহারা মোহের অনুগামী—তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না[৩০]। হে পুত্র!

ানব যাবৎ না মোহবশবর্ত্তী হয় আপদ সকল তাবৎ তাহাদিগের অতিদূরে াবস্থান করে[৩১]।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! তুমি যখন দুর্জ্জয় বিষয়বাসনারূপ রিপু জয় করিয়াছ তখন তোমাকে অবশ্যই শূর বলিতে হইবে[৩২]। কেন তুমি অজ্ঞা-ীর ন্যায় তরঙ্গবহুল মলিন মোহসাগরে মগ্ন হইতেছ[৩৩]?

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাম! তুমি বিলোলনীলোৎপলসদৃশ নেত্রের চিত্ত-াপল্যকৃত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে কেন মোহগ্রস্ত হইতেছ[৩৪]? কান্ কারণে, কি অভিলাষে, কোন্ মনঃপীড়ারূপ মূষিক তোমার চিত্তরূপ গৃহ নন করিতেছে[৩৫]? আমার বিবেচনায় তুমি মনঃপীড়া পাইবার অনুপযুক্ত। রিদ্র ব্যক্তিরাই আপদের ভাজন হইয়া থাকে[৩৬]। হে অনঘ! তোমার অভি-প্রায় কি তাহা শীঘ্র বল। যাহাতে কোন প্রকার মানসিক সন্তাপ তোমাকে াক্রমণ করিতে না পারে আমি তাহার উপায় বিধান করিব[৩৭]। মহর্ষি াভনমতি বিশ্বামিত্র ঐরূপ কহিলে রঘুবংশতিলক রামচন্দ্র সেই স্বাভিলষি-ার্থদ্যোতী উত্তম কথা শ্রবণ করিয়া খেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ময়ূর যদ্রূপ মেঘা-মে আনন্দিত হয় তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন[৩৮]।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক কথিত প্রকারে জিজ্ঞাসিত ও আশ্বাসিত হইয়া শ্রবণমধুর ও অর্থসংযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, ভগবন্! যদিও আমি অজ্ঞ, তথাপি, আপনি যখন বলিতে আদেশ করিলেন তখন অবশ্যই আমি সমুদায় যথাযথ কথা বলিব, সন্দেহ নাই। কোন্ মূঢ় সজ্জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে[১।২]?

আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি এই পিতৃগৃহে অবস্থিতি করতঃ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি ও গুরুসকাশে বিদ্যা লাভ করিয়াছি[৩]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সদাচার রত হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সমুদ্রমেখলা মেদিনী পরিভ্রমণ করিয়াছি[৪]। মহর্ষে! এত কাল পরে সম্প্রতি আমার মন সংসারের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আমার মনে এইরূপ বিচারণা জন্মিয়াছে[৫]। আমি নিতান্ত বিবেকাক্রান্ত হইয়াছি ও ভোগের পরিণাম বিরস ফলও বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্প্রতি মনোমধ্যে এইরূপ বিচারণা উপস্থিত হইতেছে যে, এই যে সুখ, ইহা কি! এই যে সংসার, ইহাই বা কি! দেখিতেছি, লোক সকল কেবল নিরন্তরই মরিবার নিমিত্ত জন্মিতেছে ও জন্মিবার নিমিত্ত মরিতেছে[৬।৭]। কি চর কি অচর সমুদায় সংসারের চেষ্টা স্বপ্নমায়াদিসদৃশ মিথ্যা ও নশ্বর। কেবল নশ্বর ও মিথ্যা নহে, বিপদের আলয়, পাপের মূল ও অভিভবের ভূমি[৮]। প্রত্যেক সাংসারিক ভাব লৌহশলাকার সদৃশ পরস্পর অসংলগ্ন। এ সকল ভাব (পদার্থ) কেবল নিজেরই মনঃসঙ্কল্পনা প্রাদুর্ভূত[৯]। দেখা যায়, এই জগতের সমুদায় সুখ মনের অধীন। শূন্য মন নিতান্ত অসৎ (মিথ্যা)। সুখের মূল মন, তাহা যখন তুচ্ছ, তখন আর কেন বৃথা মুগ্ধ হইব[১০]? যদ্রূপ পিপাসাকাতর হরিণগণ মরীচিকায় জলভ্রান্ত হইয়া বৃথা ধাবমান হয়, সেইরূপ, মূঢ়চেতা আমরা সুখপ্রত্যাশায় আকৃষ্ট হইয়া বৃথা সংসারগহনে পরিভ্রমণ-কষ্ট স্বীকার করিতেছি[১১]। এই সংসারে কেহ আমাদিগকে বিক্রয় করে নাই অথচ আমরা সংসারের নিকট বিক্রীতের ন্যায় (কৃতদাসের ন্যায়) কালযাপন করিতেছি। কি খেদ! আমরা কি মূঢ়! এ সমস্তই শাম্বরী মায়ার সদৃশ (ইন্দ্রজাল তুল্য মিথ্যা,) ইহা জানিয়াও জানিতেছি না[১২]। আমরা সকলেই

থা সুখভোগের আশায় কেবল মাত্র ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইতেছি। বন-মধ্যে মৃগগণ যেরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ এই সংসারকূপে নিমগ্ন আছি। প্রপঞ্চ অর্থাৎ সংসার জগৎ কি? বিষয়ভোগই বা কি? এ সকল কিছুই নহে। বিষয়ভোগ কেবল নিরন্তর দুঃখপ্রদ দুর্ভাগ্য বিশেষ[১৩]। বহুকাল পরে জানিতে পারিয়াছি যে, আমরা বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া বৃথা সংসার-গর্ত্তে ভ্রমান্ধ পশুর ন্যায় নিপতিত আছি[১৪]। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, সুখভোগেও অভিলাষ নাই। আমি কে! এ সকল কোথা হইতে আসিল! ইহাই আমার বিচার্য্য। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, সমস্তই মিথ্যা সুতরাং ইহার আলোচনা করাও মিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাই থাকুক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি[১৫]? ব্রহ্মন্! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া মরুভূমিগত পথিকের ন্যায় এই সংসারের প্রতি আমার নিতান্ত বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে[১৬]। হে ভগবন্! আপনি বলুন, আমায় উপদেশ করুন, দৃশ্য সকল যে নষ্ট হইতেছে ও নাশানন্তর পুনরুৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে[১৭]? এ সকল নিতান্ত অসার, অনর্থ ও অপ্রয়োজনীয়। সম্পদও অনর্থ মধ্যে গণনীয়। এই দেহও জন্ম মরণ জরা প্রভৃতি অনর্থ পরম্পরায় আবদ্ধ। জীবের জন্ম ও মরণ আবির্ভাব তিরোভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং তাহারই অনুরূপ পুনঃ পুনঃ বৃথা পরিবর্দ্ধিত হয়। ঈদৃশ জীব-জন্মের ফল কি? প্রয়োজন কি? ইহাতে অনর্থপরম্পরা ব্যতীত অন্য কিছু সারভূত ফল দেখা যায় না[১৮]। আপনি দেখুন, পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ যেমন বায়ুর দ্বারা আহত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ হয়, সেইরূপ, আমরাও পুনঃ পুনঃ সেই সেই নিতান্ত তুচ্ছ ও অসার ভোগে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জরামরণাদির দ্বারা জর্জ্জরিত হইতেছি। যেমন বায়ুপূর্ণ কীচক বেণু * বৃথা শব্দ করে, সেইরূপ, এই সকল অচেতনপ্রায় অর্থাৎ পুরুষার্থযোগবিহীন জনগণ নাসারন্ধ্র দ্বারা দেহ মধ্যে প্রাণ-নামক বায়ু প্রবেশিত করিয়া বৃথা বাক্যোচ্চারণরূপ অনর্থ শব্দ করিতেছে[১৯।২০]। ঋষে! কিরূপে এই সংসারদুঃখের অবসান হইবে, সেই চিন্তায় আমি নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। কোন শুষ্ক বৃক্ষের অন্তরস্থ কোটরে বহ্নি থাকিলে তাহা যেমন অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, ঐ চিন্তায় আমিও

* বেণু=বাঁশ। বাঁশের ছিদ্র থাকিলে তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে ও তাহাতে বংশীনিনাদ তুল্য শব্দ হয়। বায়ুর তাড়নায় বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইলেও এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। তাদৃশ শব্দায়মান বাঁশ সংস্কৃত ভাষায় 'কীচক' নামে প্রসিদ্ধ। কীচকের শব্দ অর্থ শূন্য।

সেইরূপ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছি[২১]। সংসারদুঃখরূপ দুর্ব্বহ প্রস্তর, তদ্দ্বারা আমার হৃদয়রন্ধ্র একবারেই অবরুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি আমি লোকভয়ে ও পরিজন গণের ভয়ে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন ও শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক রোদন করি না[২২]। আমার হৃদয়স্থ বিবেক ব্যতীত অন্যে আমার রোদন বুঝিতে পারে না। আমার মুখের বৃত্তি সকল অর্থাৎ হাস্য-বাক্য-সংলাপ প্রভৃতি নিরন্তরিত নিরশ্রু নীরব রোদনে নীরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাছে আমার স্বজনগণ দুঃখিত হন, সেই ভয়ে আমি কৃত্রিম হাস্যাদি করিয়া থাকি[২৩]। যেমন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সহসা দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া পরিতাপিত হয়, আমিও সেইরূপ ভাবাভাবময় সংসারের চেষ্টা ও অবস্থা স্মরণ করিয়া অতিশয়িত মোহ প্রাপ্ত হইতেছি[২৪]। ঐশ্বর্য্য সমুদয় মানবগণের মনোবৃত্তি মোহিত করে, গুণরাশি বিনাশ করে, পরে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করে[২৫]। যদ্রূপ পুত্রকলত্রপরিবৃত গৃহ বিপন্ন ব্যক্তির আনন্দ প্রদ হয় না; তদ্রূপ, আমার এই ঐশ্বর্য্যও চিন্তানিচয় সমাক্রান্ত হওয়ায় প্রীতিপ্রদ হইতেছে না[২৬]। হে মুনে! যেরূপ বন্যহস্তী লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ, আমিও এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া চিন্তাজনিত মহামোহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অল্পমাত্রও সুখলাভে সমর্থ হইতেছি না[২৭]। লোক সকল অজ্ঞানরূপ রজনীতে জ্ঞানালোকবিহীন হওয়ায় দৃক্‌শক্তিশূন্য হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিষয়রূপ শত শত মহাখল চোর সমাগত হইয়া তাহাদের বিবেকরূপ মহাবস্ত্র অপহরণে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ সময়ে তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কেহ সেই সকল সুচতুর চোর গণকে রণে পরাজিত করিয়া বিবেকরত্ন রক্ষা করিতে সমর্থ নহে[২৮]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! মূঢ় ব্যক্তিরাই এই সংসারে শ্রীকে স্থিরা ও
কৃষ্টা মনে করে। বস্তুতঃ তাহা স্থিরা নহে; উৎকৃষ্টাও নহে। তাহা নিতান্ত
অর্থদায়িনী ও মোহের হেতু[১]। যদ্রূপ বর্ষাকালের তরঙ্গিণী অন্যান্য কল্লো-
নীর সহিত সঙ্গতা হইয়া তরঙ্গ সহকারে প্রবল বেগে প্রবাহিতা হয়, সেই-
প, বিষয়শ্রীও জ্ঞানজড় জনগণের উল্লাস দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে
াবিপদ্রূপ প্রবল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করে[২]। হে মুনে! চিন্তা বিষয়শ্রীর
হিতা। যেমন নদী হইতে অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, পরে বায়ুসহকারে বর্দ্ধিত
, সেইরূপ, বিষয়শ্রী হইতেও অসংখ্য চিন্তা দুহিতার উৎপত্তি হয়, পরে
াহারা বহুবিধ দুশ্চেষ্টার দ্বারা বর্দ্ধিতা হয়[৩]। যেমন কোন দুর্ভগা নারী
পদা হইয়া জ্বালায় ইতস্ততঃ ধাবমানা হয়, নিয়ত চেষ্টা করিলেও কোন
ানে পদস্থাপন করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ, বিষয়শ্রীও ভ্রষ্টাচার
রুষের হস্তগতা হইয়া স্থির থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ধাবমানা
য়[৪]। যেমন দীপশিখা কোন এক স্থানে সংলগ্ন হইয়া সে স্থানকে উত্তাপিত
কজ্জলের ন্যায় মলিন করে, সেইরূপ, ঐশ্বর্য্যশ্রীও আশ্রিত পুরুষ দিগকে
ন্তাপিত ও তাহাদের চিত্তকে মলিন করিয়া থাকে[৫]। রাজারা গুণাগুণ
চার না করিয়াই পার্শ্বচর পুরুষকে গ্রহণ করেন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি,
় ব্যক্তিরাও গুণাগুণ বিচার না করিয়া সন্নিহিত দুরাচার দিগকেই অবলম্বন
রে[৬]। যদ্রূপ দুগ্ধ পানে সর্পের বিষ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ, অধার্ম্মিক
গের শ্রীও তাহাদের দুর্ব্ব্যবহার সহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদের শ্রী কেবল
হ বিগ্রহাদি কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়। স্পষ্টই দেখা যায়, অধার্ম্মিক দিগের
লোভ, হিংসা ও পরস্বাপহরণ, ইত্যাদি আশয়েই প্রথিতা হইয়া থাকে[৭]।
মীরণ যাবৎ না হিমসংলগ্ন হয়, তাবৎ সুখস্পর্শ থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত,
তমনি, মনুষ্যও যাবৎ না ঐশ্বর্য্যশ্রীসমাকৃষ্ট হইয়া কর্কশভাবাপন্ন হয়, তাবৎ
াহারা কি স্বজন, কি অপর ব্যক্তি, সকলের প্রতি সুখস্পর্শ থাকে। অর্থাৎ
াদাক্ষিণ্যাদি গুণে বিদ্যমান থাকে[৮]। যেরূপ মণি ভস্মাচ্ছাদিত হইলে

মলিনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, সুপণ্ডিত, শূর, কৃতজ্ঞ ও নম্র ব্যক্তিরাও ঐশ্বর্য্য-ছন্ন হইলে স্ব স্ব স্বভাব পরিহার পূর্ব্বক মলিনভাব ধারণ করিয়া থাকেন[৯]। ভগবন্! বিষলতা যেরূপ কেবল মাত্র মৃত্যুরই কারণ, সেইরূপ, বিষয়শ্রীও সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। বিষবৃক্ষ লক্ষণাবেক্ষণ করিতে গেলেও নিধন লাভের সম্ভাবনা এবং সম্পত্তি রক্ষা করিতে গেলেও আত্মবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা[১০]। মহর্ষে! এই সংসারে শ্রীমান্ অথচ লোকের নিকট নিন্দনীয় নহে, শূর অথচ আত্মশ্লাঘাকারী নহে, প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ অথচ সমদর্শী, এরূপ লোক অতি দুর্ল্লভ[১১]। হে মুনিবর! অজ্ঞ লোক যাহাকে শ্রী বলিয়া জানে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই দুঃখরূপ ভুজঙ্গের দুর্গম আবাস ভবন (গর্ত্ত) এবং মোহরূপ হস্তীর বিন্ধ্যাচলস্থ মহাতট[১২]। এই শ্রীই সাধুজনের সৎকার্য্যরূপ পদ্মের যামিনী, দুঃখরূপ কুমুদের চন্দ্রিকা, সুদৃষ্টিরূপ (আস্তিকতা) দীপের নির্ব্বাণকারিণী প্রবল বাত্যা, ভবসাগরপারেচ্ছুগণের ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ[১৩]। উহা ভয়ভ্রান্তিরূপ মেঘের আদি পদবী অর্থাৎ পূর্ব্ব লক্ষণ, বিষাদ বিষের পরিবর্দ্ধক, সংশয় ও বিক্ষোভ প্রভৃতির ক্ষেত্র। ভয়রূপ বিষধর অবশেষে বিষাদ বিষ উদ্গীরণ করতঃ সেই সকল লোকদিগকে খেদান্বিত করিয়া থাকে[১৪]। অধিক কি বলিব, এই সংসারশ্রী বৈরাগ্য-বল্লীর হিমানী, বিকাররূপ পেচকের যামিনী, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহুদংষ্ট্রা ও মোহরূপ কৈরবের জ্যোৎস্না[১৫]। যদ্রূপ নানারাগরঞ্জিত পরম মনোহর ইন্দ্রধনু অনতিবিলম্বেই বিলীন হয়, চপলা যদ্রূপ উৎপন্নমাত্রেই বিনষ্ট হয়, মূর্খদিগের আশ্রিত আপাতরমণীয়া বিষয়শ্রীও সেইরূপ অচিরস্থায়িনী, পরন্তু তাহা তাহারা জানিয়াও জানে না[১৬]। বিষয়শ্রী বন-নকুলী অপেক্ষাও চঞ্চলা ও মৃগতৃষ্ণিকা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণা। যদ্রূপ দুষ্কুলজাতা রমণী প্রতারণা সহকারে প্রার্থী পুরুষের চিত্ত মোহিত করিয়া রাখে, সেইরূপ, এই দুষ্কুলীনা বিষয়শ্রীও প্রলোভন দ্বারা অজ্ঞ জীবের চিত্ত বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা জললহরী ও দীপশিখা অপেক্ষাও ভঙ্গুর ও ইহার গতিও দুর্ব্বিজ্ঞেয়[১৭,১৮]। বিষয়শ্রী বিগ্রহপ্রিয়-ব্যক্তিরূপ করীন্দ্রকুলের বিনাশকারিণী সিংহীর সদৃশী এবং খড়্গ-ধারার ন্যায় তীক্ষ্ণা। তীক্ষ্ণতমা বিষয়শ্রীকে নিয়ত খলস্বভাবদিগকে আশ্রয় করিতে দেখা যায়[১৯]। হে মহর্ষে! আমি দেখিতেছি, পরধনাপহরণাদি নানা পাপ দ্বারা পরিবর্দ্ধিতা ও মনঃপীড়ার একমাত্র আশ্রয় অভব্যা লক্ষ্মীতে দুঃখ ব্যতীত অল্পমাত্রও সুখের সম্ভাবনা নাই। মহাত্মন্! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অলক্ষ্মী

পূর্ব্বক লক্ষ্মীমান্ পুরুষের লক্ষ্মীকে দূরীকৃত করিয়া উপভোগ করিতেছে থচ সপত্নীতাড়িতা সেই দুঃশীলা লক্ষ্মী পুনর্ব্বার সেই সপত্নীভুক্ত পুরুষকে ালিঙ্গন করিতে মানবতী হইতেছে না, লজ্জাবোধও করিতেছে না[২০।২১]। ই নির্লজ্জা লক্ষ্মী যথাযথ কুকর্ম্ম ও পতনমরণাদি সাহসিককর্ম্মলভ্যা, অচির-ায়িনী, আশীবিষবেষ্টিতা, গর্ত্ত সমুত্থিতা অথচ পুষ্পলতিকার ন্যায় মনোরমা য়া নিরন্তর লোকের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছে[২২]। *

* সাহস ব্যতীত লক্ষ্মীকে পাওয়া যায় না। পাইলেও তিনি অধিক কাল থাকেন না। ার্য্যন্ত থাকেন সে পর্য্যন্ত ক্ষয়াদিজনিত বিষতুল্য দুঃখ প্রদান করেন। কিছু ক্ষতি হইলেই কে অসহ্যযন্ত্রণা অনুভব করে। ইনি পাপ গর্ত্তে বাস করেন ও তথা হইতে আইসেন। দোষ আছে তথাপি ইনি অজ্ঞ লোকের প্রিয়া ও লোভনীয়া।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, মুনিবর! শ্রীর ন্যায় আয়ুও অশুভাবহ। আমি সুস্পষ্ট দেখিতেছি, জীবের পরমায়ু পত্রাগ্রস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী। তথাপি অজ্ঞ জীব তাহা উন্মত্তের ন্যায় বৃথা কার্য্যে ক্ষয়িত করিয়া চলিয়া যায়। অর্থাৎ এই কুৎসিত শরীর পরিত্যাগ করে অথচ স্বার্থসাধন করিয়া যাইতে পারেনা[১]। যে মানবের মন নিরন্তর বিষয় বিষধবের সংসর্গে জর্জ্জরীভূত, যাহাদের মনে বিবেক ক্ষণকালের নিমিত্তও আরোহণ করে না, তাহাদিগের আয়ু (বেঁচে থাকা) বৃথা ও ক্লেশের হেতু[২]। কিন্তু যাঁহারা পরম জ্ঞেয় জানিয়াছেন, অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা লাভালাভে ও সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হইয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষ দিগের আয়ুই সুখপ্রদ[৩]। আমরা শরীরী, আমাদের এই শরীর সুখের আধার, এইরূপ নিশ্চয় থাকাতেই আমরা সংসার মেঘের অন্তরাবস্থিত ক্ষণপ্রভার ন্যায় অচিরস্থায়ী পরমায়ুকে বিশ্বাস করি ও নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হই না[৪]। ঋষে! বায়ুব বন্ধন, আকাশের খণ্ডন, তরঙ্গমালার গ্রন্থন, এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করিতে পারি; তথাপি, আয়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না[৫]। আয়ুঃ শরৎকালের মেঘের ন্যায়, তৈলশূন্য দীপের ন্যায় ও নদীতরঙ্গের ন্যায় লোল অর্থাৎ চপল; সুতরাং গতপ্রায় বলিলেও বলা যায়[৬]। তরঙ্গপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র, তড়িৎপুঞ্জ, আকাশপদ্ম, এ সকলেব গ্রহণ বিশ্বাস করিতে পারি, তথাপি অস্থির পরমায়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না[৭]। মূঢ়চেতা জনগণ অবিশ্রান্ত অলীক পরমায়ু বিস্তারের চেষ্টা করে, করিয়া অবশেষে গৃহীতগর্ব্ভা অশ্বতরীর ন্যায় মহাদুঃখে পতিত হয়[৮]। ব্রহ্মন্! সংসারভ্রমণের বল্লীয় স্বরূপ এই দেহ সৃষ্টিসমুদ্রের ফেন। সেই কারণে ইহাতে জীবিত থাকার বাসনা করি না[৯]। যাহার দ্বারা পরমপ্রাপ্য পুরুষার্থ পাওয়া যায়, যাহা পাইলে আর শোক করিতে হয় না, যাহা পরমা নির্বৃতির আস্পদ, ঋষি দিগের মতে তাহাই প্রকৃত জীবন[১০]। বৃক্ষগণ ও পশুপক্ষী জীবিত থাকে সত্য; পরন্তু মনন ফল তত্ত্বজ্ঞানে যাহার মন মৃতকল্প হইয়াছে অর্থাৎ যাহার চিত্ত বা মন বাসনাবর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্মায় রত হইয়াছে; সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবিত[১১]। যাহারা ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্জ্জন্ম পরিহার

রিতে পারে, তাঁহাদিগের জন্মই জন্ম এবং তাহাদের জীবনই সার্থক জীবন।
বশিষ্ট গর্দ্দভতুল্য। (গর্দ্দভেরা বৃথা ভার বহন করে; মূঢ় লোকেরাও বৃথা
হ ভার বহন করে[১২]।) ভগবন! শাস্ত্র অবিবেকীর নিকট, তত্ত্বজ্ঞান
ষয়ানুরাগীর নিকট, এবং মন অসাধুচিত্ত পুরুষের নিকট মহাভার বলিয়া
গ্য হয়। কিন্তু আধ্যাত্মবিদ্ দিগের নিকট এই স্থূল দেহও ভার নহে[১৩]।
য়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চেষ্টা, এ সমস্তই নির্ব্বোধ ও বৃথা আত্মাভিমানী
গের ভারস্বরূপ সুতরাং দুঃখপ্রদ। যেমন লৌকিক ভারবাহীরা শ্রান্ত ক্লান্ত
পদে পদে দুঃখ অনুভব করে, তেমনি, মূঢ় লোকেরাও ঐ সকল লইয়া পদে
দ দুঃখ প্রাপ্ত হয়[১৪]। অশান্ত পুরুষের কামনা আপদের আস্পদ, শরীর
গের আশ্রয় এবং পরমায়ু ক্লেশের আকর[১৫]। যদ্রূপ মুষিক শ্রান্তি ত্যাগ
রিয়া অনারত (নিরন্তর) ধীরে ধীরে গৃহক্ষেত্রাদি খনন করিতে থাকে এবং
হাতে গৃহাদি ও ক্ষেত্রাদি অল্পে অল্পে জীর্ণ হইয়া পড়ে; সেইরূপ, কালও
বরত দেহীর দেহ জীর্ণ ও পরমায়ু ক্ষীণ করিতেছে[১৬]। রোগরূপ ভীষণ
ঙ্গ শরীররূপ গর্ত্তে বাস করতঃ বিষতুল্য দাহ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিমুহূর্ত্তেই
য়ুরূপ অনিল ভক্ষণ করিতেছে[১৭]। যেমন কাষ্ঠকীট (ঘুণ) জীর্ণ শীর্ণ
সার বৃক্ষের অন্তরে থাকিয়া তাহার ক্ষয় সাধন করে, তেমনি, কালও
তান্ত তুচ্ছ অসার দেহের অন্তরে আশ্রয় লাভ করিয়া ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ
জর্জ্জরিত করিতেছে[১৮]। যদ্রূপ বুভুক্ষু বিড়াল ভক্ষণাভিলাষে আখুর প্রতি
ক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, তদ্রূপ; মৃত্যুও গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে আমা-
গের প্রতি অনবরত দৃষ্টিপাত করিতেছে[১৯]। যদ্রূপ বহুভুক্ পুরুষ ভক্ষিত
ংসিতান্ন জীর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ, নিতান্ত তুচ্ছা গুণগর্ব্বিণী জরানাম্নী
শক্তি বেশ্যাও পুরুষদিগকে ও তাহার আয়ুষ্কালকে জীর্ণ করিতেছে[২০]। যেমন
জন ব্যক্তি দুর্জ্জনসংসর্গে বাস করিয়া কতিপয় দিনের মধ্যেই তাহার স্বভাব
রিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, যৌবনও এতদ্দেহে কিঞ্চিৎ-
াল বাস করিয়া পুনরপি ইহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে[২১]। বিট অর্থাৎ লম্পট
ণ যেমন সৌন্দর্য্যের অভিলাষী, তেমনি, বিনাশের সুহৃদ ও জরামরণের সহায়
তান্তও পুরুষের ও পুরুষায়ুর সতত অভিলাষী[২২]। মুনিবর! অধিক কি
লিব, জীবন্মুক্তপুরুষপ্রসিদ্ধ নিত্য সুখ যাহাকে সর্ব্বকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ
রিয়াছে, সেই মরণভাজন অর্থাৎ ভঙ্গুরস্বভাব আয়ু যদ্রূপ গুণবর্জ্জিত, অকি-
ৎকর ও তুচ্ছ, এরূপ তুচ্ছ ও হেয় এ জগতে আর নাই[২৩]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, বৃথা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে বৃথা "অহং—আমি" এতদাত্মক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহা বৃথা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আমি সেই মিথ্যাময় দুরহঙ্কার শত্রু হইতে অতিশয় ভীত হইয়াছি[১]। সংসার একাকৃতি নহে, ইহার আকার অনেকবিধ। সাধ্য, সাধন, ফল, প্রবৃত্তি, এ সমস্তই সংসারের অঙ্গ। এই বহুরূপ সংসার যে দীন অপেক্ষাও দীন বিষয়-লম্পট (লোলুপ) দিগকে নিরন্তর রাগদ্বেষাদি দোষে নিক্ষিপ্ত ও লাঞ্ছনাক্রান্ত করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা কেবল অহঙ্কারের প্রসাদাৎ[২]। অহঙ্কার হইতেই আপদের জন্ম, শারীরিক ও মানসিক বিবিধ পীড়ার ও বিবিধ দুশ্চেষ্টার উদয় হয়। অহঙ্কার স্বয়ং রোগ। আমি উহাকে রোগ বলিয়া গণ্য করি[৩]। মুনিবর! চিরকালের পরম শত্রু অহঙ্কার আশ্রয় করায় আমি ঐশ্বর্য্য উপভোগ দূরে থাকুক, পান ভোজন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি[৪]। ব্যাধেরা যেমন বাগুরা (মৃগ ধরিবার ফাঁদ অর্থাৎ জাল) বিস্তার করতঃ মৃগ দিগকে বদ্ধ করে, সেইরূপ, অহঙ্কারদোষও এই সংসাররূপ দীর্ঘ রাত্রিতে মনোমোহন মায়াজাল বিস্তার করিয়া জীব দিগকে বদ্ধ করিতেছে[৫]। যেমন পর্ব্বত হইতে কণ্টকখচিত সুতরাং ক্লেশপ্রদ খদির বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি, অহঙ্কার হইতে ভয়ঙ্কর দুঃখ-পরম্পরা উৎপন্ন হইতেছে[৬]। যে অহঙ্কার শান্তিরূপ চন্দ্রের রাহু, গুণরূপ পদ্মের হিমানী ও সাম্য মেঘের শরৎকাল, আমি সেই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক[৭]। আমি রাম নহি, কোন বিষয়ে আমার ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্তিও নাই। আমি বুদ্ধের ন্যায় অথবা ইন্দ্রিয়জয়ীর ন্যায় আপনিই আপনাতে শান্ত গুণে (অচঞ্চল যোগে) অবস্থান করিতে বাসনা করি[৮]। ইতিপূর্ব্বে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভোজন, হোম, দান, যে কিছু করিয়াছি সে সমস্তই অবস্তু এবং এখন দেখিতেছি, অহঙ্কারশূন্যতাই বস্তু[৯]। হে ব্রহ্মন্! যে পর্য্যন্ত "অহং=আমি" এই জ্ঞান থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমি আপদ উপস্থিত হইলে দুঃখিত হইব। কিন্তু যখন ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইবে তখন আমি মহাবিপদেও সুখী থাকিব। সুতরাং, অহঙ্কার অপেক্ষা অনহঙ্কারই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর[১০]। মুনিবর! সম্প্রতি আমি তাদৃশ অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ শান্ত ও উদ্বেগশূন্য

হইব, এরূপ ইচ্ছা করিতেছি। ভঙ্গুরস্বভাব বিষয় ভোগে নিরুদ্বেগ হইবার আশা নাই[১১]। হে ব্রহ্মন্! যে পর্য্যন্ত হৃদয়াকাশে অহঙ্কার মেঘ উদ্দিত থাকিবে, বিষয়তৃষ্ণারূপ কূটজমঞ্জরী সেই পর্য্যন্ত বিকসিত হইতে থাকিবে[১২]। যখন হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ তিরোহিত হইবে তখন তৃষ্ণাবিদ্যুৎ দীপশিখার ন্যায় সেই মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইবে। এমন নির্ব্বাপিত হইবে যে তাহার নিদর্শনও থাকিবে না[১৩]। মেঘ যেমন আস্ফালন সহকারে গভীর গর্জ্জন করে, অহঙ্কাররূপ বিন্ধ্যশৈলে মনোরূপ মত্ত মহাগজ সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে[১৪]। এই যে দেহরূপ মহারণ্যে অহঙ্কাররূপ মত্তকেশরী নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, এই মত্তসিংহই এই সমুদায় জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে। (এবং পুণ্যপাপের বীজ বপন করিয়া বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিতেছে[১৫]।) যেমন লম্পট পুরুষেরা মুক্তামালা গ্রথিত করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করে সেইরূপ অহঙ্কারও আশাসূত্রে জন্মপরম্পরারূপ মুক্তামালা গ্রথিত করিয়া গলদেশে ধারণ করিতেছে[১৬]। হে মুনে! এই অহঙ্কাররূপ পরম শত্রুর দ্বারাই পুত্রমিত্রাদিরূপ অভিচারদেবতা * সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহারাই বিনা তন্ত্র মন্ত্রে মনুষ্যগণকে অশেষ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিতেছে[১৭]। আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, প্রবল শত্রু অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হইলেই সমুদায় দুর্ব্ব্যাধি দূরীভূত হইতে পারে। অল্পে অল্পে হউক আর তীব্রবেগে হউক, হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ উপশান্ত হইলে শান্তিনাশিনী মহামোহ মিহিকা (কুজ্ঝটিকা) অন্তর্হিত হইবে। আর তাহা লক্ষ্যও হইবে না[১৮।১৯]। হে ব্রহ্মন্! আমি নিরহঙ্কার হইয়াও মূর্খতা বশতঃ শোকে অবসন্ন হইতেছি, এজন্য প্রার্থনা, আমার পক্ষে যাহা বিহিত ও হিত, আমাকে তাহাই বলুন, উপদেশ করুন[২০]। হে মহাত্মন্! সর্ব্বপ্রকার আপদের আস্পদ শান্ত্যাদিগুণবিবর্জ্জিত অহঙ্কারকে আমি আশ্রয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না; অধিকন্তু ইহাকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছি। অতএব, যাহাতে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সম্প্রতি আমাকে সেইরূপ উপদেশ করুন[২১]।

* অভিচার=তন্ত্রোক্ত ও অথর্ব্ব বেদোক্ত মারণ-কার্য্য। হোম পূজাদির দ্বারা লোকের অনিষ্ট করার নাম অভিচার।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

রাম বলিলেন, সাধুসঙ্গ ও সৎকার্য্য এই দুই বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত না হইলে চিত্ত কামাদি দোষে জর্জ্জরিত ও বায়ুপ্রবাহপ্রেরিত ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগের ন্যায় প্রচলিত হইতে থাকে[১]। প্রভো! যেমন কুক্কুরগণ উদরপূরণার্থ ব্যগ্রচিত্তে দূর হইতেও দূরতর প্রদেশে ধাববান হয়, সেইরূপ, দোষদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি বৃথা ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকে[২]। হয়-ত তাহারা কোথাও কিছু পায় এবং প্রচুর পাইলেও না পাওয়ার ন্যায় অতৃপ্ত থাকে[৩]। করণ্ডক * যেমন বারি দ্বারা পূর্ণ হয় না, তেমনি, তাহাদের অন্তঃকরণও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। হে মুনে! মন সর্ব্বপ্রকারে রিক্তস্বভাব, বিশেষতঃ দুরাশা-রজ্জুবেষ্টিত থাকায় যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় সুখলাভে বঞ্চিত থাকে[৪]। মহর্ষে! আমার মন তরঙ্গের ন্যায় তরলভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষণকালের নিমিত্তও শীর্ণতা ব্যতীত পুষ্ট ও অন্যত্র স্থির হইতেছে না[৫]। যদ্রূপ মন্থনকালে মন্দরভূধরে আহত হওয়াতে ক্ষীরসমুদ্রসলিল উচ্ছলিত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইয়াছিল সেইরূপ আমার মনও বিষয়ানুসন্ধানদ্বারা আহত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইতেছে[৬]। ভোগ, লাভ ও উৎসাহ যাহার কল্লোল, যাহাতে মায়া অর্থাৎ পর বঞ্চনা মকররূপে বাস করিতেছে, সেই মনোময় অর্থাৎ মনোরথ নামক মহাসমুদ্রকে আমি কিছুতেই নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না[৭]। হে ব্রহ্মন্! মৃগগণ যেমন গর্ত্তপতন চিন্তা না করিয়া দূর্ব্বাঙ্কুরলোভে দ্রুতবেগে বহুদূর ধাবমান হয় সেইরূপ আমার মন নরকপাত ভয় ত্যাগ করিয়া ভোগলাভপ্রত্যাশায় বহুদূর ধাবমান হইতেছে[৮]। মহার্ণব যেমন স্বীয় চঞ্চলস্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তেমনি, মদীয় চিন্তাসক্ত ও চঞ্চলস্বভাব মনও বিষয়চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক প্রাপ্য পদে স্থিতি লাভ করিতেছে না। যদ্রূপ পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী অধীর হয় সেইরূপ অতিচপল মদীয় চিত্ত চিন্তাচঞ্চলা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে স্থিতি লাভ করিতেছে না[৯।১০]। যদ্রূপ হংস নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইতে

---

* বাঁশের শলায় অথবা বেতের ছালে রচিত পেটেরা নামক পাত্র করণ্ডক। তাহা জল পূর্ণ করিতে গেলে পূর্ণ হয় না, ছিদ্র দিয়া পড়িয়া যায়। কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় না।

ক্ষীরভাগই গ্রহণ করে, সেইরূপ, আমাদের মোহাক্রান্ত মনও এই শরীর হইতে উদ্বেগশূন্য সাম্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া কামক্রোধাদি দোষরূপ দুঃখকেই গ্রহণ করিতেছে[১১]।* হে মুনিনায়ক! মনের প্রত্যক্‌প্রবণা † বৃত্তি আছে সত্য; কিন্তু তাহা অসংখ্য দ্বৈতকল্পনা শয্যায় সুপ্তপ্রায়। তাহার তাদৃশী মোহ-নিদ্রা যে ভাঙ্গিতেছে না, তাহাতেও আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও সমাকুল হইয়াছি[১২]। হে ব্রহ্মন্! যেমন বিহঙ্গমগণ আহারলোভে ব্যাধজালে জড়িত হয়, বদ্ধ হয়, সেইরূপ, আমিও আমার তৃষ্ণাসূত্রে রচিত চিত্তরূপ জালে জড়িত ও বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতেছি[১৩]। আমি ক্রোধরূপ ধূম ও চিন্তারূপ-শিখা বিশিষ্ট মনোরূপ হুতাশন দ্বারা নিরন্তর শুষ্ক তৃণের ন্যায় দগ্ধ হইতেছি[১৪]। হে ব্রহ্মন্! যদ্রূপ মৃত শরীর ভার্য্যানুগামী কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তদ্রূপ, আমিও নিষ্ঠুর তৃষ্ণাভার্য্যার অনুগামী চিত্ত কর্ত্তৃক নিরন্তর জড়তা প্রাপ্ত ও ভুক্ত হইতেছি[১৫]। ব্রহ্মন্! নদীতীরস্থ বৃক্ষ যেমন তরঙ্গবেগদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, আমিও তরঙ্গতুল্য চঞ্চল জড়রূপী চিত্তের দ্বারা বিনষ্ট হই-তেছি[১৬]। যদ্রূপ তৃণরাশি প্রচণ্ডবায়ুবশে দূরে নিক্ষিপ্ত ও শূন্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ, আমিও বেগবান্ অন্তঃকরণ দ্বারা তত্ত্বপথ হইতে দূরে ও নিস্তত্ত্বরূপ শূন্যে পরিক্ষিপ্ত হইতেছি[১৭]। আমি যে প্রকৃতসুখশূন্য নিকৃষ্ট যোনিতে পতিত হইব, অথবা আমার মোক্ষলাভ যে দুষ্কর হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। মনু-ষ্যেরা যেমন সেতু (বাঁধ) বাঁধিয়া ক্ষুদ্র নদীর জল রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ, আমি প্রতিনিয়ত এই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টায় রত থাকিলেও কুচিত্ত আমাকে রুদ্ধ রাখিয়াছে, নিঃসৃত হইতে দিতেছে না[১৮]। যেমন রজ্জু-বদ্ধ কূপকাষ্ঠ [কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র। ইহার এক দিকে রজ্জুর দ্বারা জলকুম্ভ ও অন্য দিকে ভারার্থ একখণ্ড কাষ্ঠ বাঁধা থাকে] একবার ঊর্দ্ধে ও অন্য বার অধঃ উৎপতিত ও পতিত হয়, সেইরূপ, আমিও অসৎচিত্তরূপ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধাধঃ ভ্রমণ করিতেছি[১৯]। যেমন বালকবিভীষিকার্থে পরিকল্পিত বেতাল (বিকৃতাকৃতি ছবি) বালকের জ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতি-ভাত হয়, সেইরূপ, আমিও অজ্ঞান বশতঃ দুশ্চিত্তকে নিতান্ত দুর্জ্জয় মনে করিয়া

* একাত্মবিজ্ঞানই অভয় পদ ও সাম্য সুখ। সাম্য সুখই নিত্য ও নিরতিশয়। তদ্ভিন্ন যে কিছু—সমস্তই অসার ও দুঃখপ্রদ। দেহাত্মবিজ্ঞান অধিক অসার। এই শরীরে সার অসার উভয়ই বিদ্যমান আছে, পরন্তু মোহগ্রস্ত মন অসার ব্যতীত সার গ্রহণে সমর্থ হয় না।

† প্রত্যক্‌প্রবণা = আত্মাভিমুখী। বৃত্তি = ধর্ম্ম বা স্বভাব।

ব্যাকুল হইতেছি[২০]। বাল্য অপগত হইলে সে বিভীষিকা থাকে না, তাহার মিথ্যাত্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ, বিবেক উপস্থিত হইলেও চিত্তের মিথ্যাত্ব প্রকট হইয়া থাকে। মন বহ্নি হইতেও উষ্ণ, পর্ব্বত হইতেও দুরতিক্রমণীয় ও বজ্র হইতেও দৃঢ়। সুতরাং মনকে নিগ্রহ করা অর্থাৎ বশীভূত করা যার পর নাই দুঃসাধ্য[২১]। যদ্রূপ মাংসাশী পক্ষী মাংস দেখিবা মাত্র তদ্ভক্ষণার্থ ধাবিত হয়, হিতাহিত বিবেচনা করে না, সেইরূপ, মনও ইন্দ্রিয়দৃষ্ট বিষয়ে নিপতিত হয়, হিতাহিত বিচার করে না। মন বালকের বাল্যক্রীড়ার ন্যায় এ মুহূর্ত্তে এক প্রকার ও অন্য মুহূর্ত্তে অন্য প্রকার হইতেছে এবং বৃথা অবলম্বন করতঃ বৃথা কাল কর্ত্তন করিতেছে[২২]। সমুদ্র যেমন জড়স্বভাব, চঞ্চল, বিস্তীর্ণ, জন্তু-সমাকীর্ণ ও আবর্ত্তবিশিষ্ট; তেমনি, মনও জড়, চঞ্চল, বিস্তীর্ণ, বৃত্তিরূপ জন্তু পরিপূর্ণ ও আবর্ত্তবিশিষ্ট। সমুদ্রও জনগণকে দূরে নিক্ষিপ্ত করে; মনও আমাকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে[২৩]। হে সাধো! বহ্নিভক্ষণ, সমুদ্রপান ও সুমেরু উন্মূলন যেরূপ দুঃসাধ্য, মনকে নিগ্রহ করা তদপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য[২৭]। চিত্তই দৃশ্য দর্শনের হেতু, চিত্ত থাকাতেই তদ্দৃশ্য জগত্রয় আছে। তাদৃশ চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য জগতের দর্শন তিরোহিত হয়। হে মুনে! সেই কারণে সাধুগণ বলেন, চিত্তের চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ চিত্ত ও রোগের ন্যায় অবশ্য পরিহরণীয়[২৫]। যেমন পর্ব্বত থাকিলেই তাহাতে নানাবিধ তরু উৎপন্ন হয় তেমনি চিত্ত থাকাতেই তদাশ্রয়ে নানাবিধ ও শত শত সুখ দুঃখ হইতেছে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, চিত্তকে বিবেকাভ্যাস দ্বারা ক্ষীণ করিতে পারিলে তখন আর সুখ দুঃখ থাকিবে না[২৬]। মুমুক্ষুগণ যাহাকে জয় করিয়া শান্ত্যাদিগুণ বশীভূত করিয়া থাকেন, আমিও সেই চিত্তরূপ প্রবল শত্রু জয় করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার চিত্ত এক্ষণে বিষয়শ্রীতে আসক্ত নহে। সেই কারণে আমি জড়মলিনা বিলাসিনী রাজ্য লক্ষ্মীর প্রতি আনন্দিত নহি[২৭]।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

রাম কহিলেন, পরমপ্রেমাস্পদ আত্মতত্ত্ব ও তৎসহচর বিবেক তৃষ্ণারূপ দুরন্ত অমা-নিশায় আবৃত হওয়ায় জীবরূপ আকাশে কেবল দোষরূপ উলুক স্ফূর্ত্তি সহকারে বিচরণ করে[১]। পঙ্ক যেমন প্রখর রবিকিরণে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, অন্তর্দ্দাহপ্রদায়িনী চিন্তার দ্বারা আমি দিন দিন শুষ্ক হইতেছি[২]। ব্যামোহতিমিরে সমাচ্ছন্ন আমার চিত্তরূপ অরণ্যে আশারূপিনী পিশাচী নিরন্তর নৃত্য করিতেছে[৩]। বিলাপজনিত অশ্রুবারি নীহারে তৃষ্ণারূপ ক্ষেত্র স্থিত চিন্তারূপ চণক অনবরতঃ অঙ্কুরিত হইতেছে[৪]। যদ্রূপ উর্ম্মি অন্তঃপ্রচলন দ্বারা অম্বুনিধিস্থিত জলচরগণের উল্লাস উৎপাদন করে; সেইরূপ, বিষয়তৃষ্ণাও অন্তর্ভ্রমির কারণ হইয়া আমাকে কষ্টজনক বিষয়ে উল্লাসিত করিতেছে[৫]। যেমন পর্ব্বত হইতে প্রচণ্ডকল্লোলরবা তরঙ্গিণী প্রবল বেগে প্রবাহিতা হয় তেমনি বিষয়তৃষ্ণাও অসত্য বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে[৬]। যেমন প্রবল বায়ু ধূলি ও তৃণরাশি উড়াইয়া স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত করে, যেমন তৃষ্ণা জলাভিলাষীচাতককে নানা স্থানে বৃথা ভ্রমণ করায়, তেমনি বিষয়তৃষ্ণাও আমাকে দূরে নিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইতেছে[৭]। আমি যখন যখন গুণতন্ত্রী অর্থাৎ বৈরাগ্যবিবেকাদি গুণ (আলম্বন রজ্জু) আশ্রয় করি; তখন তখনই বিষয়তৃষ্ণা সেই সেই গুণকে মূষিকের ন্যায় ছেদন করিয়া দেয়[৮]। যদ্রূপ সলিলপ্রবাহমধ্যে জীর্ণ পত্র, বায়ুপ্রবাহমধ্যে শুষ্ক তৃণ ও শরৎকালের আকাশে মেঘমালা স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয় না, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে, সেইরূপ, আমিও কুতৃষ্ণা কর্ত্তৃক চিন্তাচক্রে নিপতিত হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি, স্থির থাকিতে পারিতেছি না[৯]। জালবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন স্বীয় বাসস্থান গমনে অসমর্থ হয়; সেইরূপ, আমরাও নির্ব্বুদ্ধিতা বিধায় বিষয়তৃষ্ণার দ্বারা বদ্ধ হইয়া আত্মপদে (ব্রহ্মপদে) গমন করিতে পারিতেছি না[১০]। হে তাত! আমি বিষয়বাসনারূপ অগ্নিশিখায় এরূপ প্রজ্বলিত হইতেছি যে দাহোপশমনকারী অমৃত লেপন করিলেও তাহার শান্তি হয় কি না সন্দেহ[১১]। মহর্ষে! বিষয়তৃষ্ণারূপ উন্মত্ত তুরঙ্গমী জীবগণকে লইয়া পুনঃ পুনঃ বহুদূরে ও দিগ্‌দিগন্তে বৃথা ধাবমানা হইতেছে[১২]। কূপ

হইতে জলোত্তোলনকারী ঘট যেমন রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া নিয়তই ঊর্দ্ধাধঃ গমন করিতে থাকে, রজ্জুপরিচ্যুত বা বন্ধনবিমুক্ত হইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, জীবও তৃষ্ণা রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া নিয়তঃই ঊর্দ্ধাধঃ ভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমনাগমন করিতেছে, তাহা হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিতেছে না[১৩]। মানব দুশ্ছেদ্য বিষয়তৃষ্ণায় আবদ্ধ হইয়া রজ্জুবদ্ধ বহনশীল বলীবর্দ্দের ন্যায় অনবরত বা অবিশ্রান্ত বৃথা ভার বহন করিতেছে[১৪]। যথা কিরাতপত্নী পক্ষিগণকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাল বিস্তার করিয়া রাখে, তথা বিষয়াশাও জীবগণকে বদ্ধ করিবার আশয়ে পুত্র কলত্রাদি রূপ মহাজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে[১৫]। হে মুনিশার্দ্দূল! যদিও আমি ধীর তথাপি তৃষ্ণাস্বরূপ কৃষ্ণপক্ষীয় তামসী রজনী আমাকে ভীত করিয়াছে। যদিও আমি চক্ষুষ্মান্ তথাপি তৃষ্ণা আমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যদিও আমি আনন্দময়, তথাপি তৃষ্ণা আমাকে সর্ব্বদাই খেদযুক্ত করিতেছে[১৬]। কালভুজঙ্গিনী যেমন কুটিলা, স্পর্শকোমলা, এবং দংশন দ্বারা প্রাণবিনাশকারিণী; বিষয়তৃষ্ণা ঠিক্ সেইরূপ। তৃষ্ণার গতি অত্যন্ত কুটিলা ও ঐশ্বর্য্যসুখনিবন্ধন স্পর্শকোমলা; কিন্তু পরিণামে বিষজ্বালাপ্রদায়িনী। ইহাকে স্পর্শ করিলে অব্যাহতি নাই; স্পর্শমাত্রেই এ স্বপ্রভাব প্রাণবিনাশকারিণী হয়[১৭]। বিষয়তৃষ্ণা জীবের মায়ারূপ রোগের উৎপত্তিস্থান, দুর্ভাগ্যরূপ দীনতার আকর ও পুরুষগণের হৃদয়ভেদকারিণী। যেমন ভগ্নতুম্বী বীণার তন্ত্রী হইতে মনোহর ধ্বনি উৎপন্ন হয় না; তেমনি, সুষুম্নাদি-তার-ত্রয়-সংযুক্ত জীবরূপ বীণাও আনন্দলাভে সমর্থ হয় না[১৮।১৯]। পর্ব্বতগুহা হইতে উৎপন্না সুদীর্ঘা ঘনরসযুক্তা রবিকিরণস্পর্শমলিনা উন্মাদদায়িনী বিষলতা যেমন পরিণামে দুঃখদায়িনী, বিষয়তৃষ্ণাও সেইরূপ দুঃখদায়িনী[২০]। তৃষ্ণাবৃক্ষের অগ্রভাগস্থিত পুষ্পফলশূন্য ব্যর্থ সমুন্নত ক্ষীণ মঞ্জরী অমঙ্গলকারিণী লতার অনুরূপা। ইহার দ্বারা কষ্ট ব্যতীত সুখ নাই, অপকার ব্যতীত উপকার নাই[২১]। যথা অবশীকৃতচিত্তা বৃদ্ধা বারবনিতা পুরুষবশীকরণার্থ ধাবমানা হয় কিন্তু ফল প্রাপ্ত হয় না; তথা, বিষয়তৃষ্ণাও জীবকে অনর্থ ভ্রমণ করায়, পুরুষার্থ ফল প্রদান করে না[২২]। যথা রঙ্গভূমিস্থা বৃদ্ধা গণিকা শৃঙ্গার, বীর ও করুণাদি রস উদ্ভাবন পূর্ব্বক নৃত্য করে, তথা বিষয়তৃষ্ণাও শোকমোহাদি নানাপ্রকার রস উদ্ভাবন করতঃ বিষয়রস সমাকুল সংসার মধ্যে নৃত্য করিতেছে[২৩]। মহর্ষে! এই সংসার বিস্তীর্ণ কাননের অনুরূপ। এক মাত্র তৃষ্ণাই এই কাননের সুদীর্ঘ বিষলতা,

জরা মরণাদি তাহার প্রস্ফুটিত কুসুম, এবং বিবিধ উৎপাতপরম্পরা তাহার ফল[২৪]। যেমন বর্ষীয়সী জীর্ণা নর্ত্তকী অসমর্থা হইলেও জনগণের মনো-রঞ্জনার্থ নর্ত্তন কার্য্যে প্রবৃত্তা হয়, দুর্ব্বলা সুতরাং অন্তরানন্দশূন্যা বিষয়-তৃষ্ণাও সেইরূপ জনবিমোহনার্থ সংসাররূপ রঙ্গভূমে নৃত্য করিতেছে[২৫]। অতি চপলা চিন্তা ময়ূরী বর্ষাকালীন মেঘাচ্ছন্ন দিবসের ন্যায় মোহাবরণ কালে হর্ষোৎফুল্লা হইয়া নৃত্য করে। মোহকালে নৃত্য করে সত্য; কিন্তু বৈরাগ্যরূপ শরৎ আগত হইলে সে আর নৃত্য করে না, উৎসাহবিহীনা হইয়া নর্ত্তন কার্য্যে নিরস্তা হয়[২৬]। যে প্রকার চিরশুষ্কা নদী বর্ষাকালে কতিপয় দিবসের জন্য উল্লসিতা হয় অর্থাৎ অসার তরঙ্গকল্লোলপরম্পরা বিস্তার করে, সেই প্রকার, চিরকাল শূন্যগর্ত্ত অসার বিষয়তৃষ্ণাও স্বল্পকালের নিমিত্ত বিফল আনন্দ-কোলাহলে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে[২৭]। যদ্রূপ পক্ষী ফলহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফলশালী বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, তদ্রূপ, বিষয়তৃষ্ণাও দ্রব্যবিহীন পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে[২৮]। তৃষ্ণা বানরী অপেক্ষাও চঞ্চলা। সে ফলপ্রত্যাশায় দুর্লঙ্ঘ্য স্থানেও পদসঞ্চালন করে এবং তৃপ্ত থাকি-লেও স্বভাব বশতঃ পুনঃ পুনঃ ফলান্তরের আকাঙ্ক্ষা করে। অপিচ সে কোনও প্রকারে দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, তৃষ্ণাও ভোগ বাসনায় অগম্য গমনে কুণ্ঠিত নহে, পুনঃ পুনঃ বিষয়ান্তরের আকাঙ্ক্ষা করিতেও লজ্জিতা নহে এবং এক লইয়া স্থির থাকিতে পারে না[২৯]। "এই কর্ম্ম শুভজনক" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মানবগণ তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে অশুভ বলিয়া বোধ হইলেও দুর্দ্দৈব বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বিষয়তৃষ্ণাও অসৎকর্ম্মে সৎকর্ম্মজ্ঞান আরোপ করিয়া পরিধাবিতা হয়। অনন্তর তাহা অসৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও তদনুষ্ঠানে নিবৃত্তা হয় না। প্রত্যুত তাহাতেই যত্নাতিশয় প্রকাশ করে[৩০]। ঋষে! তৃষ্ণা হৃদয়রূপ পদ্মের ভ্রমরী। তৃষ্ণারূপিণী ভ্রমরী কখন পাতালে কখন নভস্থলে কখন বা দিক্‌কুঞ্জে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করি-তেছে[৩১]। সংসারে যত প্রকার দোষ আছে সে সকলের মধ্যে তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখদায়িনী। তৃষ্ণা অন্তঃপুরস্থ ব্যক্তিদিগকেও বড়িশবৎ সবেগে আকর্ষণ করে, করিয়া মহাসঙ্কটে নিপাতিত করে[৩২]। মেঘোদয়ে বারিবর্ষণ ও দুর্দ্দিন হয়, সূর্য্যের আলোক অবরুদ্ধ হয়, শরীর ও মন জড়ভাবাপন্ন হয় বিষয়বাসনারূপ তৃষ্ণার উদয় হইলেও ঐ সকল হইয়া থাকে। হৃদয়াকাশে

তৃষ্ণার উদয় হইলে জ্ঞানালোক অবরুদ্ধ, বুদ্ধি জড়ীভূতা, ও মোহদুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকে৩৩। উহা বিচিত্র মনোবৃত্তিগ্রথিত মালার স্বরূপ অথচ উহাই সংসারব্যবহারী জীবের বন্ধন-রজ্জু। পশু যদ্রূপ রজ্জু বদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে অপারক হয়, সেইরূপ, মনুষ্যেরাও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা বিহীন হইয়া আছে৩৪। যদ্রূপ ইন্দ্রধনু * দেখিতে বিচিত্রবর্ণ, কিন্তু গুণবিহীন, (গুণ=জ্যা) দীর্ঘ ও শূন্যগর্ত্ত, সেইরূপ, বিষয়তৃষ্ণাও বিষয়-স্পর্শে বিচিত্রবর্ণ, নানারূপে রঞ্জিত, অসদ্‌গুণ, পুরুষমেঘে অবস্থিত, শূন্যগর্ত্ত অর্থাৎ অন্তস্ত। ইহার উদয় স্থান হৃদয়াকাশ, অথচ ইহা অলীক কল্পনা মাত্র৩৫। এবম্বিধা বিষয়বাসনা সদ্‌গুণ শস্যের অশনি, আপদ তৃণের শরৎকাল, জ্ঞান সরোজের হিমানী, তমোবৃদ্ধিবিষয়ে হেমন্ত কালের দীর্ঘা রজনী৩৬, সংসার নাটকের নটী, কার্য্যপ্রবৃত্তিরূপ নীড়ের পক্ষিণী, মনোরথরূপ অরণ্যের হরিণী, কামরূপ সঙ্গীতের বীণা৩৭, ব্যবহাররূপ সমুদ্রের লহরী, মোহ মাতঙ্গের শৃঙ্খল, সৃষ্টিরূপ বটবৃক্ষের প্ররোহ (নাম্‌না) ও দুঃখরূপ কৈরবের চন্দ্রিকা৩৮। এই নিত্যোন্মাদপরায়ণা বিলাসশালিনী বিষয়তৃষ্ণা মানবের আধি, ব্যাধি, জরা এবং মরণ প্রভৃতির পেটিকা (পেটরা)৩৯। ঈদৃশী তৃষ্ণা ব্যোমবীথির † সহিত তুলিতা হইতে পারে। কেননা ইহা কখন প্রকাশ, কখন অন্ধকারময় অর্থাৎ কখন নির্ম্মল কখন মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় এবং কখন বা নীহারগুণ্ঠিতের ‡ ন্যায় প্রতীয়মানা হয়৪০। যেমন কৃষ্ণ পক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন রজনী ক্ষীণা হইলে রাত্রিঞ্চর দিগের সঞ্চার নিবৃত্ত হয়, সেরূপ, জীবের বিষয়তৃষ্ণার শান্তি হইলে সকল প্রকার দুঃখের শান্তি হয়৪১। যখন এই সকল লোক চিন্তা অর্থাৎ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিবে তখনই ইহারা সর্ব্বদুঃখ পরিহারে সমর্থ হইবে। চিন্তা ত্যাগ ব্যতীত তৃষ্ণাবিসূচিকা রোগের অন্য ঔষধ নাই৪২।৪৩ যাবৎ বিষ-বিসূচিকা-সদৃশী তৃষ্ণার পরিত্যাগ বা পরিক্ষয় না হয় তাবৎ এই সমুদয় লোক মুগ্ধ, মুক ও ব্যাকুল অবস্থায় অবস্থান করে। যেরূপ জলাশয়স্থ মৎস্য অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে উপাদেয় ভক্ষ্য জ্ঞানে আমিষাবৃত বড়িশ আহার করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত আনন্দিত হয়, সেইরূপ, তৃষ্ণাক্রান্ত মনুষ্যে-রাও তৃণ পাষাণ কাষ্ঠাদি দ্রব্য লাভ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত আশাস্ফূর্ত্তি অনুভব করে৪৪। যদ্রূপ সূর্য্যকিরণ জলমগ্ন পদ্মকে উর্দ্ধে নীত, বিকসিত

---

* ইন্দ্রধনু=শক্রধনু। ইহার ভাষা নাম রামধনু। † ব্যোমবীথি=আকাশপ্রসর।

‡ নীহারগুণ্ঠিত=কোয়াষায় ঢাকা।

ও সকলের নিকট প্রকাশিত করে, সেইরূপ, পীড়াময়ী অঙ্গনারূপা বিষয়তৃষ্ণাও গম্ভীর পুরুষকেও গাম্ভীর্য্যশূন্য করিয়া সকলের নিকট লঘুচেতারূপে প্রকাশিত করিয়া থাকে[৪৫]। তৃষ্ণা বেণুলতার ন্যায় অন্তঃসারশূন্যা, গ্রন্থিযুক্তা, দীর্ঘা, অঙ্কুরকণ্টকময়ী অথচ মণিমুক্তালাভের প্রত্যাশা স্থান[৪৬]। কিন্তু মহর্ষে! আশ্চর্য্য এই যে, ঈদৃশী দুশ্ছেদ্যা বিষয়তৃষ্ণাকে ধীসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরা বিবেক খড়্গের দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিয়া থাকেন[৪৭]। হে ব্রহ্মন্! জীবের হৃদয়স্থিত বিষয়তৃষ্ণা যদ্রূপ সুতীক্ষ্ণা, শাণিত অসির্ ধার, বজ্রাগ্নি বা প্রতপ্ত অয়ঃকণ (অস্ত্রবিশেষ) * সেরূপ সুতীক্ষ্ণ নহে[৪৮]। যেমন দীপশিখা দেখিতে উজ্জ্বল, অসিতবর্ণতীক্ষ্ণাগ্র, স্নেহবিশিষ্ট, দীর্ঘদশাযুক্ত, প্রকাশমান ও দুস্পর্শ; বিষয়তৃষ্ণা ঠিক্ সেইরূপ[৪৯]। হে মহর্ষে! একমাত্র বিষয়তৃষ্ণাই সুমেরুসদৃশ গাম্ভীর্য্যশালী প্রাজ্ঞ, শূর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ নরোত্তমকে ক্ষণমধ্যে তৃণের ন্যায় লঘু করিয়া থাকে[৫০]। বিষয়পিপাসারূপিণী তৃষ্ণা রজোগুণপ্রচুরা আশা-রজ্জুর দ্বারা নির্ম্মিতা ও ধূলিপটলসঙ্কুলা অন্ধকারময়ী বিন্ধ্যাটবীর ন্যায় যার পর নাই বিস্তীর্ণা, গহনা ও ভয়ঙ্করী[৫১]। এই তৃষ্ণা অদ্বিতীয় হইয়াও সকল ভুবনের অন্তরালে লক্ষিত হইতেছে; এবং শরীরে থাকিলেও সহজে দর্শনের বিষয়ীভূত হইতেছে না। ফলতঃ চঞ্চলতরঙ্গসঙ্কুল ক্ষীরোদসলিলে যেরূপ মাধুর্য্যশক্তি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে, এই তৃষ্ণাও সেইরূপ সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে[৫২]।

* অয়ঃকণপ এক্ষণে বন্দুক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অয়ঃকণ গুলি নামে প্রসিদ্ধ। শুক্র-নীতি ও মহাভারত গ্রন্থের বর্ণনা দেখিলে অয়ঃকণ গুলি ও অয়ঃকণপ বন্দুক ব্যতীত অন্য কিছু হয় না।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, মহর্ষে! এই যে জীবদেহ প্রকাশ পাইতেছে ইহা কেবল কতকগুলি আর্দ্রনাড়ীর দ্বারা বিরচিত। অর্থাৎ মল, মূত্র, রেত ও রক্তাদি প্রক্ষিত শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত। বিবিধ বিকারবিশিষ্ট ও পতনশীল এই জীবদেহ কেবল দুঃখ ভোগেরই কারণ বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে[১]। যুক্তিপথ অবলম্বন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই জীবদেহ দ্বিরূপী। ইহা অজ্ঞ হইয়াও অভিজ্ঞের ন্যায়, অভব্য হইয়াও ভব্যের ন্যায়। ইহা জড় নহে ও চেতনও নহে[২]। * সুতরাং যাহারা সাধু তাহারা ইহার সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন এবং অসাধুগণ নিরয়গামী হন। ইহার দ্বারা যে আপনার চিদ্রূপতা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই ইহার অজ্ঞতার বৈপরীত্য[৩]। † দেখুন, এই দেহে অল্পেই আনন্দ ও অল্পেই খেদ উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহার সদৃশ গুণহীন, নিকৃষ্ট ও শোকস্থান আর কি আছে[৪] ? এই দেহ বৃক্ষের অনুরূপ। ভুজদ্বয় ইহার শাখা, অংসদেশ স্কন্ধ, চক্ষুর্দ্বয় কোটর, মস্তক বৃহৎফল, হস্তপদ পল্লব, রোগাদি লতাস্থানীয় এবং ইহা কর্ণরূপ দন্তুরস ‡ পক্ষীর চঞ্চুপ্রহারে জর্জ্জরিত। ইহাতে বুদ্ধি ও জীব এই দুই পক্ষী নিয়ত বাস করিতেছে। ইহা গুল্মবান্ ও কার্য্য-সংঘাত (দেহপক্ষে গুল্ম রোগবিশেষ, তদ্বিশিষ্ট।) বৃক্ষকে যেমন ছিন্নভিন্ন করিতে পারা যায়, তেমনি, শাস্ত্ররূপ কুঠারে ইহাকেও ছিন্নভিন্ন করা যায়। ইহা দন্তরূপ কেশরশালী ও হাস্যরূপ কুসুমে পরিশোভিত। এ বৃক্ষের শোভা

---

* এই চিজ্জড় সংযুক্ত দেহের দেহ ভাগ অজ্ঞ অর্থাৎ জড়। ইহার জ্ঞাতা আত্মা। তিনি অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞের সংযোগে এই অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহারই সাহায্যে মুক্তিপদ পাওয়া যায়; সুতরাং ইহা অভব্য অর্থাৎ অমঙ্গলময় হইলেও ভব্য। সেই কারণে ইহা অন্যান্য জড় হইতে বিলক্ষণ এবং শুদ্ধ চেতন আত্মার অন্যথাভাব।

† যাহারা ইহার তথ্য নির্ণয়ে অসমর্থ তাহারাই অসাধু। অসাধু, অবিবেকী ও মূঢ়, সমান কথা। মূঢ়েরাই এই দেহে আত্মভাব স্থাপন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু যাঁহারা আত্মায় আত্মদর্শী তাঁহারাই ইহার সাহায্যে মুক্তি লাভ করেন।

‡ দন্তুরস = কাঠঠোকরা নামক পক্ষী। কাঠঠোকরারা চঞ্চু প্রহারে বৃক্ষের গাত্র ছিদ্রিত ও কুট্টিত করে। কর্ণদ্বয়ও নিরন্তর কটুতীক্ষ্ণাদি বাক্য শ্রবণে ইহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে।

অতি অল্পকালস্থায়ী। এই দেহবৃক্ষ কান্তিরূপছায়াবিশিষ্ট এবং ইহা জীবরূপ পথিকের বিশ্রামস্থান। ইহার সহিত জীবের কোনরূপ বাস্তব সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইহা কাহার আত্মীয় নহে। ইহার প্রতি আস্থাই বা কি! অনাস্থাই বা কি[৫।৮]। হে তাত! সংসাররূপ মহাসমুদ্রে সন্তরণ করিবার জন্য এই দেহলতা বা দেহনৌকা পুনঃ পুনঃ আশ্রয় করা যাইতেছে অথচ ইহাতে কাহার আত্মবুদ্ধি হইতেছে না। (আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; পরন্তু তাহা হইতেছে না[৯]।) হে মুনিবর! বহুগর্ত্তসমাকুল তনুরুহ রূপ অসংখ্য তরুরাজি বিরাজিত দেহরূপ বিজন বনে বাস করিতে কাহার বিশ্বাস হয়? কে নিঃশঙ্কে বাস করিতে পারে[১০]? এই অসার সচ্ছিদ্র মাংসাদিনির্ম্মিত বাদ্যবিহীন পটহের (পটহ = ঢাক) অভ্যন্তরে আমি বিড়ালের ন্যায় বাস করিতেছি[১১]। সংসাররূপ নিবিড় অরণ্যে চিন্তামঞ্জরীবিশিষ্ট ও দুঃখঘুণক্ষত এই দেহ নামক জীর্ণ বৃক্ষে চিত্তরূপ চপল মর্কট আরূঢ় আছে[১২]। মহর্ষে! এই দেহপ্লক্ষ (প্লক্ষ = পাকুড় গাছ) আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখী করিতেছে না। ইহাতে তৃষ্ণাবিষধরী নিয়ত বাস করিতেছে ও ইহা ক্রোধরূপ বায়সের নিত্য আলয়। ইহা কেবল হাস্যরূপ প্রস্ফুটিত কুসুমে শোভমান। ইহাতে শুভ অশুভ এই দুইটি ফল অনবরত উৎপন্ন হইতেছে। স্কন্ধশাখাসমন্বিত এই দেহবৃক্ষ প্রাণবায়ু কর্তৃক নিরন্তর আলোড়িত হইতেছে। উন্নতজানুদ্বয় ইহার স্তম্ভ, ইন্দ্রিয় বিহঙ্গমগণ ইহাতে বসতি করে, ও ইহার যৌবনরূপ শীতল ছায়ায় কন্দর্পনামক পথিক বিশ্রাম করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের উপরিভাগে শিরোরুহরূপ তৃণরাশি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে অহঙ্কাররূপ গৃধ্র কুলায় নির্ম্মাণ করতঃ বসতি ও কঠোরধ্বনি করিতেছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ ছিদ্রযুক্ত (ধোঁড় বা খোঁড় পড়া *।) অথচ ইহা দুরুচ্ছেদ্য। বাসনা এই বৃক্ষের মূল ও ইহা সর্ব্বতোভাবে ব্যায়ামবিরস। অর্থাৎ শ্রমরূপ কাণ্ড পত্রাদির দীর্ঘতায় রুক্ষ ও সুখবিহীন। সেইজন্য আমি এই দেহ বৃক্ষে কিছুমাত্র সুখ অনুভব করিতে পারিতেছি না[১৩।১৭]। হে মুনিসত্তম! এই কলেবর অহঙ্কার গৃহস্থের মহাগৃহ। ইহা ভূমি পতিত হউক বা না হউক, ভগ্ন হউক অথবা স্থির থাকুক, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই[১৮]। অহঙ্কারস্বামিক এই গৃহে ইন্দ্রিয়রূপ পশু সকল নিরুদ্ধ রহিয়াছে। বিষয়বাসনা ইহার গৃহিণী এবং ইহা কামাদিরাগরঞ্জিত হওয়ায় শোভমান। সেজন্য এ

---

* গাছের মাইজ পচিয়া গেলে ধোঁড় বা খোঁড় বলে।

গৃহ আমার ইষ্ট নহে[১৯]। এই গৃহের পৃষ্ঠাস্থিরূপ কাষ্ঠ শূন্যগর্ত্ত সুতরাং অসার। এই গৃহ নাড়ীরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ ও রসরক্তাদিরূপসলিলকৃত কর্দ্দমে প্রলিপ্ত। এ গৃহ আমার অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নহে[২০]। অস্থি সকল ইহার স্তম্ভ এবং ইহাতে বাহুরূপ দীর্ঘকাষ্ঠ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আছে। ইহা পরিণামে শুক্লবর্ণ (কেশ লোমাদি পক্ক শাদা) হয়। চিত্ত ইহার ভৃত্য, বিবিধ কার্য্যচেষ্টা ইহার অবলম্বন, মিথ্যা ও মোহ ইহার স্থূলতা এবং মূর্খতা ইহার মনোহর শয্যা। তাহাতে দুঃখরূপ বালক সমূহ নিরন্তর রোদন করিতেছে ও দুশ্চেষ্টারূপ দগ্ধাস্যদাসী (পোড়ামুখী) ইহাতে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ গৃহ আমার নহে ও আমার ইষ্টও নহে[২১।২৩]। আরও দেখুন, এই দেহ-গৃহটী নিরবচ্ছিন্ন বিষয়মলে পরিপূর্ণ ও ইহা অজ্ঞানাদি ক্ষারে জর্জ্জরিত। এ গৃহ কিরূপে আমার অভীপ্সিত হইতে পারে[২৪] যাহাকে গুল্ফ বলে তাহাই এই গৃহের জঙ্ঘারূপ স্তম্ভের আধার কাষ্ঠ। জানু তদুপরি প্রতিষ্ঠিত। মস্তক ও স্বীয় আধারে অবস্থিত। দীর্ঘাকার দুই বাহু ও উরু এই গৃহের সংযোজক কাষ্ঠ (আড়া)। মূল শিথিল হইলে ইহার সমুদায়ই শিথিল হয়[২৫]। এ গৃহে ইন্দ্রিয়রূপ পুত্র ও চিন্তারূপিণী দুহিতা ক্রীড়া করিতেছে। এ ক্রীড়া গৃহ আমার ইষ্ট নহে[২৬]। মস্তক যাহার শিরোগৃহ (চিলের ঘর), সে শিরোগৃহ কেশরূপ ছাদে আচ্ছাদিত, কুণ্ডল পরিশোভিত কর্ণশোভায় শোভিত ও অঙ্গুলিশ্রেণী যে গৃহের কাষ্ঠচিক্কণিকা, সে গৃহ কি প্রকারে ইষ্ট হইতে পারে[২৭]? দেহগৃহের সর্ব্বাবয়ব লোমরাজিরূপ যবাঙ্কুরে আচ্ছাদিত এবং এ গৃহের অভ্যন্তর ছিদ্র উদর। ইহাতে নখ লূতাতন্তুসদৃশ। এতদ্গৃহপালিতা ক্ষুধাসরমা (শুনী, কুক্কুরী) ইহাতে অনবরত চীৎকার করিতেছে। ইন্দ্রিয়দ্বার সকল এই গৃহের গবাক্ষ। শ্বাস প্রশ্বাস বায়ু এই গৃহে অনবরত প্রবিষ্ট হইতেছে। মুখ এই গৃহের প্রধান দ্বার, দন্ত ঐ দ্বারের কপাট, জিহ্বা তাহার কিল (খিল বা হুড়কা।) সুচিকণ চর্ম্ম এ গৃহের সুধালেপ; তদ্দ্বারা ইহা মসৃণ। সন্ধি সকল এই গৃহের যন্ত্র। মনোরূপ মূষিক এই গৃহের ভিত্তি খনন ও ছিদ্রিত করিতেছে। কি কারণে আমি এই অভব্য গৃহ ইচ্ছা করিতে পারি[২৮।৩২]? কখন ইহা হাস্যরূপ দীপালোকে উদ্ভাসিত কখন বা অজ্ঞানতারূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে। ইহা সর্ব্বপ্রকার রোগের ও বিবিধ মনঃপীড়ার আধার ও জরার আবাসস্থলী। হে মহাত্মন্! এ প্রকার দেহ গৃহে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই[৩৩।৩৪]। মহর্ষে! ঘোরতমসাচ্ছন্ন অন্তঃসারশূন্য কোটরবিশিষ্ট দিকস্বরূপ লতাবিতানে অবরুদ্ধ,

এই দেহশাটবী, ইহাতে ইন্দ্রিয়রূপ ভয়ঙ্কর ভল্লুক বিভীষিকা প্রদর্শন করতঃ বিচরণ করিতেছে। এ অটবীতে আমার কিছুমাত্র ইষ্ট নাই[৩৫]। মুনিবর! যেমন পঙ্কনিমগ্ন হস্তীকে বলহীন অন্য হস্তী উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, আমিও এই দেহালয়কে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না[৩৬]। কি শ্রী, কি রাজ্য, কি দেহ, কি শারীরিক বা মানসিক চেষ্টা, আমার কিছু-তেই প্রয়োজন নাই। কারণ, ভয়ঙ্কর সর্ব্বভক্ষ কাল (যে সব গ্রাস করে) কতিপয় দিনের পরে এ সমস্তই গ্রাস করিবে[৩৭]। হে মুনীশ্বর! এই মাংস-শোণিতময় দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাবিয়া দেখুন, মরণধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছু ইহাতে নাই এবং ভ্রম ব্যতীত প্রকৃত রমণীয়তা নাই[৩৮]। এই দেহ জীব-কর্ত্তৃক পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত কিন্তু মৃত্যুকালে ইহা জীবের অনুগামী হয় না। অতএব হে তাত! কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কৃতঘ্ন দেহের প্রতি আস্থা রাখিতে পারে[৩৯]? এই দেহ মত্ত হস্তীর কর্ণাগ্রভাগের ন্যায় নিতান্ত অস্থির ও লম্বমান জলকণার ন্যায় পতনশীল। সুতরাং ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিবেই করিবে। পরন্তু এ আমাকে পরিত্যাগ করিতে না করিতে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি[৪০]। বায়ুবেগসঞ্চালিত পল্লবের ন্যায় চলন-শীল এই দেহ দিন দিন আধিব্যাধির দ্বারা জর্জ্জরিত হইতেছে। এই কটু-নীরস দেহে আমার কিছুমাত্র উপকার নাই[৪১]। চিরকাল পানভোজন করি-লেও ইহা নব পল্লবের ন্যায় কোমলতা ও অবশেষে কৃশতা প্রাপ্ত হইয়া বিনা-শের অনুগামী হয়[৪২]। এই দেহে বার বার কতবার সুখ দুঃখ অনুভব করা হইয়াছে তথাপি এ অধমের লজ্জা নাই[৪৩]। এ যখন চিরকাল প্রভুত্বসহকারে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও উৎকর্ষ বা স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না, তখন ইহার পরিপালনে বা পরিরক্ষণে ফল কি[৪৪]? ইহা জরাকালে জরাপ্রাপ্ত ও মৃত্যুকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইবেই হইবে। এ নিয়ম ভোগীর ও দরিদ্রের সমান। তাহাতে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু তাহা এ অধম (এই অজ্ঞ দেহ) জ্ঞাত নহে[৪৫]। এই দেহ মূক কচ্ছপের ন্যায় সংসাররূপ সমুদ্রের কুক্ষিমধ্যে তৃষ্ণারূপ গহ্বরে চিরপ্রসুপ্ত রহিয়াছে অথচ এ আপনার উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করিতেছে না[৪৬]। এই তরঙ্গায়মান সংসার সমুদ্রে শত শত দহনযোগ্য দেহকাষ্ঠ ভাসমান হইতেছে সত্য; পরন্তু ধীমান্ ব্যক্তি সে সকলের মধ্যে কোন কোন দেহকে "নর" বলিয়া জানেন। (যে দেহ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতে পারা যায় সেই দেহই নর-দেহ[৪৭]।) চিরদুরাত্মতা যাহার বেষ্টন

(লতায় জড়ান), অধোগতি যাহার পতনশীল ফল, তাহাতে বিবেকীর প্রয়োজন কি[৪৮]? ইহা পঙ্কনিমগ্ন ভেকের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগে একান্ত নিমগ্ন হইয়া জরাগ্রস্ত হইতেছে কিন্তু এ অচিরাৎ কোথায় যাইবে ও কি প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে তাহা জানিতেছে না[৪৯]। যেমন প্রবল বাত্যাকালে ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন পথে গমন করিলে নেত্র রুদ্ধ হয়, কিছুই দেখা যায় না, দৃষ্টিহীন হইতে হয়, এই দেহের সমুদায় আরম্ভ তাহারই অনুরূপ। অর্থাৎ ইহার চেষ্টা অনর্থপ্রদা, দৃক্‌শক্তিনাশিনী ও নীরসা। এই শরীরটাই ঝঞ্ঝাবায়ুর মূল। ইহাই রাজসী প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া আত্মদর্শনের বাধা জন্মাইতেছে[৫০]। বায়ুর, প্রদীপের ও মনের গতি, উৎপত্তি ও বিনাশ যদ্রূপ; এই শরীরের উৎপত্তি বিনাশাদিও তদ্রূপ। ইহা যে কেন, কি প্রকারে ও কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায়ই বা যাইতেছে তাহা কেহই জানিতেছে না[৫১]। যাহারা অনিত্য শরীরের অস্থায়ী কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়, সেই মোহমদিরোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে ধিক্[৫১]। মহর্ষে! আমি দেহের নহি ও দেহও আমার নহে। দেহ আমি নহি ও দেহও দেহ নহে। * এইরূপ চিন্তা করিয়া যাহাদের চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে তাহারাই উত্তম পুরুষ[৫২]। যাহারা বহুল পরিমাণে মানাপমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং যাহারা বহুলাভাকাঙ্ক্ষী হয়, তাদৃশ শরীরম্মন্য ব্যক্তিরা অবদ্ধ হইয়াও বদ্ধ ও মৃত্যুর বশীভূত হয়[৫৩।৫৪]। মহর্ষে! কষ্টের বিষয় এই যে, শরীরমধ্যস্থ হৃদয়শ্বভ্রশায়িনী তৃষ্ণাপিশাচী আমাদিগকে নিরন্তর প্রতারিত করিতেছে এবং অজ্ঞানরূপা রাক্ষসী সহায়হীনা প্রজ্ঞাকে সতত ছলনা করিতেছে[৫৫।৫৬]।

মহর্ষে! দৃশ্যমান বস্তুর কিছুই সত্য নহে। সুতরাং এই দগ্ধপ্রায় শরীর নিতান্ত অসত্য। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি দেখিতেছি, প্রায় সমুদায় লোকই দগ্ধ দেহ কর্ত্তৃক নিয়ত প্রতারিত হইতেছে[৫৭]। পর্ব্বতভূমি যেমন নির্ঝরবারি সেচনে কিঞ্চিৎকাল আর্দ্র থাকে, তেমনি, এই দেহও কিছু কালের নিমিত্ত কোমল থাকে, পরে কর্কশতা প্রাপ্ত হয়[৫৮]। ইহা সামুদ্রিক জলবিম্বের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত ও আপাততঃ বৃথা সাংসারিক ধাবনাদি (দৌড়াদৌড়ি) রূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে[৫৯]। হে দ্বিজবর! ইহা মিথ্যাজ্ঞানের বিকার, স্বপ্নভ্রান্তির নিলয় ও মরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

* দেহ অঙ্গ মাত্র; বস্তুতঃ ইহা পঞ্চভূতের বিকার। ভূত বিকারে অহংজ্ঞানও ভ্রম; দেহ জ্ঞানও ভ্রম।

ঈদৃশ দেহের প্রতি আমার ক্ষণকালের নিমিত্ত অল্পমাত্রও আস্থা নাই[৬০]। যাহারা তড়িৎ, শরৎকালের মেঘ ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, এ সকলকে চিরস্থায়ী মনে করে ও বিশ্বাস করে; তাহারাই এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে চিরস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করুক[৬১]। মুনিনাথ! এই দেহ সমুদায় ভঙ্গুর পদার্থের মধ্যে বিজয়ী। এ বিদ্যুৎ প্রভৃতিকেও জয় করিয়াছে। আমি তাহা জানিতে পারিয়া অশেষ দোষাকর এই শরীরকে তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ মনে করিয়াছি ও ইহার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি[৬২]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

উনবিংশ সর্গ।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! যাহাতে নিতান্ত অস্থির চতুর্ব্বিধ দেহ * বিভক্ত হয় এবং নানাবিধ কার্য্য ভার যাহার তরঙ্গ, জীব সেই এই সংসারসাগরে মানুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার মরণ পর্য্যন্ত কেবল দুঃখেই অতিবাহন করে। দেখুন, প্রথমতঃ বাল্য; তাহাতে কত প্রকার কষ্ট[১]। অশক্তি বা অক্ষমতা, আপদ, তৃষ্ণা, (ভক্ষণাদি বিষয়ে অনিবার্য্য অভিলাষ) মূকতা (কথা কহিতে না পারা,) মূঢ়বুদ্ধিতা (বুঝিতে না পারা,) ক্রীড়া কৌতুকে অভিলাষিত্ব, চাঞ্চল্য ও দৈন্য (ঈপ্সিত অপ্রাপ্তে দুঃখিত হওয়া ও রোদনাদি করা) সমুদায় দোষই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে[২]। জীব বাল্যাবস্থায় অকারণে ক্রোধ-রোদনাদির বশবর্ত্তী হইয়া নিগড়বদ্ধ হস্তীর ন্যায় অনন্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয় ও দুঃখে শৈশব কাল জীর্ণ করিতে থাকে[৩]। জীব এই কালে পরাধীনতাপ্রযুক্ত যেরূপ চিন্তাজর্জ্জরিত হয়; মরণকালে, জরাকালে, রোগে, আপদে ও যৌবনে সেরূপ জর্জ্জরিত হয় না[৪]। বাল্যকালে পশুপক্ষ্যাদির সহিত পশুপক্ষ্যাদির সমান হইয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতে প্রবৃত্তি হয় ও তাহাতে গুরুজনের নিকট সতত তিরস্কৃত ও উপহসিত হইতে হয় সুতরাং চাঞ্চল্যপ্রধান বাল্য মরণ অপেক্ষাও দুঃখপ্রদ[৫]। বাল্যকালে মন ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে এবং সেই কালে নিতান্ত তুচ্ছ নানাপ্রকার কল্পনা সমুদিত হইতে থাকে। সে সকল প্রায়ই সিদ্ধ হয় না, না হওয়ায় মন সর্ব্বদা দুঃখিত থাকে। মহর্ষে! সেরূপ বাল্য কিরূপে ও কাহার সুখপ্রদ হইতে পারে[৬]? শৈশবকালে, অজ্ঞানতা নিবন্ধন জল, বহ্নি ও অনিলাদির দ্বারা পদে পদে যেরূপ ভীত হইতে হয়, জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মহাবিপদ হইতেও সেরূপ ভয় হয় না[৭]। বালকগণ নিরন্তর বিবিধ দুশ্চেষ্টায়, দুরাশায়, দুর্লীলায়, দুরভিসন্ধানে ও দুর্ব্বিলাসে প্রধাবিত হয়, হইয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদাই মোহ বশতঃ সারে অসার ও অসারে সার বোধ করিয়া থাকে[৮]। অতএব, নিস্ফল কার্য্যপ্রবৃত্তির ও অশেষ দুষ্ক্রিয়ার আবাস স্বরূপ বাল্যকাল কোনও

---

* যাহা স্থায়ী নহে তাহা অস্থির। নশ্বর ও অস্থির সমান কথা। দেহ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকার।

প্রকারে শান্তিপ্রদ নহে। ঐ কালে প্রায় সর্ব্বক্ষণই গুরুজনের নিকট দণ্ডিত সুতরাং দুঃখিত হইতে হয়[৯]। যেমন পেচককুল দিবসে অন্ধকারময় গর্ত্তে লুক্কায়িত হইয়া থাকে সেইরূপ যে কিছু দোষ, যে কিছু দুরাচার, যে কিছু অকার্য্য, যে কিছু দুরাধি (মনঃকষ্ট,) সমস্তই বাল্যকালে জীবের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া থাকে[১০]। ব্রহ্মন্! যে সকল লোক বাল্য কালকে রমণীয় বলিয়া কল্পনা করে সেই সকল হতচেতা মূঢ়বুদ্ধি দিগকে ধিক্[১১]। যেকালে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা, যে অবস্থায় কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, যে কালে অভিনব বিষয় দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই তদ্বিষয়ে মনের চাঞ্চল্য জন্মে, সেই বাল্য কাল কি প্রকারে সন্তোষকর হইতে পারে[১২]? অন্যান্য অবস্থায় প্রাণিমাত্রেরই বিষয় বিশেষে মনশ্চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে সত্য; পরন্তু বাল্যাবস্থায় তদপেক্ষা দশগুণ অধিক চাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে। মন যত চঞ্চল হয় ততই দুঃখ বাড়ে ইহা সুপ্রসিদ্ধ[১৩]। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহাতে আবার ঐ কালে বালচাপল্য মিশ্রিত হয়; সুতরাং ঐ কালে তৎপ্রযুক্ত শত অনর্থ হইতে রক্ষা পাওয়া নিতান্ত কঠিন[১৪]। হে ব্রহ্মন্! কামিনীর নেত্র, (অপাঙ্গ = কটাক্ষ) বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখা, ইহারা যেন শিশুচাপল্যের নিকট হইতেই চঞ্চলতা শিক্ষা করিয়াছে[১৫]। শৈশব ও মন উভয়ই চঞ্চল,—সকল কার্য্যেই চঞ্চল। সমান স্বভাব বলিয়া উভয়কে সহোদর ভ্রাতা বলিতে পারা যায় এবং উক্ত উভয়ের স্থিতিও ক্ষণিক[১৬]। মানবগণ যেমন অর্থাভিলাষে ধনী ব্যক্তির অনুগামী হয়, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার আধি ব্যাধি বালকের অনুগমন করিয়া থাকে[১৭]। বালকেরা যদি প্রত্যহ অভিনব প্রীতিকর বস্তু প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে অত্যন্ত ম্লানচিত্ত হইয়া থাকে[১৮]। বালকের স্বভাব কুক্কুরের সদৃশ। তাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট ও অল্পেই অসন্তুষ্ট হয়। কুক্কুরেরা ঘৃণ্য পদার্থে রমমান হয়, বালকেরাও ঘৃণ্য পদার্থে রমমান হইয়া থাকে[১৯]। বালকেরা বর্ষাজলসিক্ত রবিকিরণসন্তপ্ত ভূমির সদৃশ। কেননা তাহারা অন্তরোষ্মাযুক্ত, অজস্র অশ্রুধারায় অবষিক্ত ও সর্ব্বদাই কর্দ্দমাক্তকলেবর অবস্থায় থাকে[২০]। বালকেরা কেবল আহারের, নিদ্রার ও ভয়ের অধীন। তাহারা দূরস্থ বস্তুতেও নিকটস্থের ন্যায় অভিলাষী হয় (চাঁদ ধরিবার অভিলাষও করে।) ইহাদিগের বুদ্ধি যেরূপ চঞ্চল, শরীরও সেইরূপ চপল। সুতরাং তাদৃশ বাল্যে দুঃখ ব্যতীত সুখের লেশও নাই[২১]। স্বীয় অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত না হইলে বালক দিগের আশা লতা এক কালে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে তাহারা বিশেষরূপে ম্লান ও

দুঃখিত হয়, দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত উপায় বিধানে অসমর্থ হইয়া তাহারা রোদন করিতে থাকে ও অপার দুঃখ অনুভব করে[২২]। মুনিবর! বালকেরা দুশ্চেষ্টায় ও দুষ্টমনোরথের দ্বারা স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়া যেরূপ ক্রূর অক্রূর উপায় অবলম্বন করে ও তদুপলক্ষ্যে তাহারা যে সকল দুঃখ প্রাপ্ত হয় সে সকল দুঃখ অন্য কাহার নাই[২৩]। গ্রীষ্মকালীনপ্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে পরিতাপিত বনস্থল যেরূপ সন্তপ্ত, স্বেচ্ছাচারী বালক গণের অভিলাষ পূর্ণ না হইলে তাহারা সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়া থাকে[২৪]। আলাননিবদ্ধ (আলান= বন্ধন স্তম্ভ অথবা শৃঙ্খল) ও অঙ্কুশাহত ভীষণ করীন্দ্র যদ্রূপ যন্ত্রণা অনুভব করে, বালকগণ বিদ্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকিয়া শিক্ষকের বেত্রাঘাতাদির দ্বারা সেইরূপ ঘোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে[২৫]। বাল্যকালে কালস্বভাব বশতঃ যে প্রকার বিবিধ বাসনা উপস্থিত হয়, মিথ্যা বস্তুর প্রতি চিত্তের যে প্রকার অভিনিবেশ জন্মে, ভাবিয়া দেখুন, সে সকল দুঃখপ্রদ ব্যতীত কদাচ সুখপ্রদ নহে। মিথ্যা বস্তুতে সত্যতা বুদ্ধি হওয়াও নিতান্ত কোমল স্বভাব বাল্যের স্বভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাদৃশ বাল্য অবশ্যই দীর্ঘ দুঃখের কারণ, সেপক্ষে সংশয় নাই[২৬]। লোকে রোরুদ্যমান বালক দিগকে কহিয়া থাকে "তোমাকে এই জগতের সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দিব"। তাহারাও ঐ প্রতারণা বাক্যে সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হয়। তাহারা কখন ভুবন খাইব বলিয়া রোদন করে এবং কখন বা আকাশ হইতে চন্দ্রগ্রহণের অভিলাষ করে। এরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাল্যাবস্থা কিরূপে সুখদায়ক হইতে পারে[২৭]? বালকের সহিত মহীরুহের প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। দেখুন, বৃক্ষের অন্তরে চেতনা আছে এবং বালকের অন্তরেও চেতনা আছে। কিন্তু উভয়েই শীতাতপ নির্বারণে একান্ত অশক্ত। সে সম্বন্ধে বালকের ও মহীরুহের প্রভেদ কি[২৮]? যেমন ক্ষুধার্ত্ত পক্ষিগণ নভোমণ্ডলের অত্যুচ্চ প্রদেশে উড্ডয়ন করিতে অভিলাষ করে কিন্তু রৌদ্রাদির জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ, নিতান্ত শিশু বালকেরাও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহার গ্রহণের অভিলাষ করে; কিন্তু শরীরে বশ্যতা না থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পক্ষী ও বালক উভয়েই ভয়ের ও আহারের বশবর্ত্তী; সে বিষয়ে বালকেরা পক্ষীর সমান[২৯]। শিশুকালে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট সতত ভীত থাকিতে হয়, সেজন্য শিশুকাল কেবল ভয়েরই মন্দির[৩০]। বাল্যকাল সমুদায়

দোষের আস্পদ। অন্তঃকরণ এই কালে সর্ব্বদাই দূষিত থাকে। সুতরাং তাহা কেবল মাত্র অবিবেকের আলয়। হে মুনিনাথ! প্রদর্শিত কারণে ইহ জগতে বাল্যাবস্থা কাহারও পক্ষে তুষ্টিকর নহে; অধিকন্তু তাহা দুঃখেরই পুষ্কল (বিস্পষ্ট) কারণ৩১।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! পুরুষ শত অনর্থের আস্পদ বাল্য অতিক্রম করিয়া অচিরাৎ ভোগবিলাসের উৎসাহে কামাদি কর্তৃক দূষিতান্তঃকরণ হয় ও নরক গমনের জন্যই যৌবনে আরোহণ করে[১]। * অজ্ঞ জীব যৌবন কালে বিবিধ বিলাস ও রাগদ্বেষাদি অনুভব করতঃ এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখে নিপতিত হয়[২]। এই কালেই চিত্তবিলস্থিত (বিল=গর্ত্ত) কাম পিশাচ বিবেককে বলপূর্ব্বক পরাভূত করিয়া আত্মবশে আনয়ন করে[৩]। এই কালে চিত্ত যুবতীচিত্ত অপেক্ষাও চঞ্চল হয় এবং তাহা (চিত্ত) বালকনেত্রার্পিত সিদ্ধাঞ্জনের ন্যায় ভোগ্যবস্তুপ্রদর্শী হইয়া থাকে। অপিচ, চিত্ত এইকালে অণুমাত্রও বশ্য থাকে না[৪]। † মুনিবর! কাম, ক্রোধ, লোভ ও দ্যূতাসক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ নিতান্ত দুঃখদায়ক, যৌবন কালে সে সমস্তই উপস্থিত হইয়া থাকে, অবশেষে সে সকল তদাসক্ত পুরুষকে বিনষ্ট (অধঃপাতিত) করিয়া থাকে[৫]। সতত ভ্রমপ্রদায়ক মহানরকের বীজস্বরূপ যৌবন যৎপরোনাস্তি ভীষণ। যে পুরুষ যৌবনে বিনষ্ট না হয়, সে পুরুষ অন্য কিছুতে বিনষ্ট হয় না[৬]। ক্রোধ, লোভ ও হিংসা প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ও শৃঙ্গারাদি রসে বিচিত্রিত যৌবনারণ্য যার পর নাই ভয়ানক। যিনি তাহা অনায়াসে জয় করিতে পারেন তিনিই যথার্থ বীর[৭]। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, নিমেষপরিমিতকাল দীপ্তিশালী ও অভিমানোক্তি

---

* বাল্য বরং ভাল, তথাপি যৌবন ভাল নহে। যৌবন বিশেষরূপে অধঃপতনের মূল। কারণ, বাল্যানুষ্ঠিত দুষ্কার্য্যে পাপ ও পাপফলে নরক হয় না। মাণ্ডব্য মুনি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের পর হইতে পাপ পুণ্য হওয়ার বিধান করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য, বাল্য অপেক্ষা যৌবন অধিক নিন্দনীয় ও দোষের আলয়।

† সিদ্ধ পুরুষেরা এক প্রকার অঞ্জন (কাজল) প্রস্তুত করিতে পারেন, যদ্দ্বারা নিধি দর্শন হয়। ভূমির ও প্রস্তরাদির মধ্যে যে গুপ্তধন থাকে তাহা নিধি নামে খ্যাত। নেত্রে সিদ্ধাঞ্জন প্রক্ষণ করিলে বালকেরাও কোথায় কি লুক্কায়িত নিধি আছে তাহা জানিতে পারে। যৌবনও ভোগবিলাসরূপ নিধির সিদ্ধাঞ্জন। অর্থাৎ যৌবনের উদয়ে যুবকগণ গুপ্ত ভোগ অনুসন্ধান করিয়া লয়।

বহুল সুতরাং অমঙ্গলদায়ক যৌবনের প্রতি আমি অনুরক্ত নহি[৮]। যৌবন আপাতমধুর সত্য, পরন্তু পরিণামে অত্যন্ত তিক্ত। যৌবন সুরার ন্যায় মত্ততাজনক ও সকল দোষের আকর। তাদৃশ দূষণীয় যৌবনে আমার কিছু মাত্র অনুরাগ নাই[৯]। যৌবন কাল নিতান্ত অসত্য হইলেও অজ্ঞের নিকট ক্ষণকাল সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। তাদৃশ বঞ্চক ও স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গমসদৃশ নিতান্ত-তুচ্ছ যৌবনের প্রতি আমার অনুরাগ রাখা কি সঙ্গত[১০]? যত প্রকার আপাত মনোরম বস্তু আছে, যৌবন সে সমুদয়ের শ্রেষ্ঠ। যৌবন স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল ও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। সেই জন্য যৌবনের প্রতি আমার অল্পমাত্রও অনুরাগ নাই[১১]। যদ্রূপ লক্ষ্যে শরনিপতিত হইলে কিঞ্চিৎকাল সুখানুভব হয়, কিন্তু পরে প্রাণিহত্যানিবন্ধন অনুতাপ আসিয়া আশ্রয় করে, সেইরূপ, যৌবনকালও ক্ষণকাল সুখপ্রদ পরন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ। অন্তর্দ্দাহজনক তাদৃশ যৌবন আমার রুচির বিষয় নহে[১২]। যৌবন বেশ্যাসংসর্গের ন্যায় আপাতরমণীয় ও বেশ্যার ন্যায় সদ্ভাব-শূন্য অর্থাৎ শুদ্ধভাবরহিত। যে যৌবন তাদৃশ, সে যৌবন আমার রুচির বিষয় নহে[১৩]। জগতে যে কোন কার্য্যোদ্যোগ—সমস্তই দুঃখদায়ক। যৌবন আগত হইলে সমুদায় দুঃখদায়ক আরম্ভ (কার্য্য) উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন প্রলয়কাল আগত হইলে অনিবার্য্যরূপে উৎপাত সকল উপস্থিত হয় সেইরূপ যৌবন আগত হইলেও উৎপাতসদৃশী কার্য্যপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে[১৪]। ভগবান্ ঈশ্বরও (ঈশ্বর=শিব) হৃদয়ান্ধকারকারিণী যৌবনাজ্ঞানযামিনীকে ভয় করেন[১৫]। যৌবনের সম্ভ্রম (মোহ) সদাচার নষ্ট করে, বুদ্ধিবিপর্য্যয় জন্মায়, ও যার পর নাই অধিক মোহ উৎপাদন করতঃ প্রমাদে লিপ্ত করে[১৬]। যেরূপ বনস্থ শুষ্ক বৃক্ষ দাবদহনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ, মানবগণ যৌবন কালে অসহ্য কান্তাবিয়োগহুতাশনে দগ্ধ হইতে থাকে[১৭]। যেরূপ অতিবিস্তীর্ণা নির্ম্মলসলিলা তরঙ্গিণী (নদী) বর্ষাকালে মালিন্যপ্রাপ্তা হয়; সেইরূপ, যৌবন কালে প্রভূতগুণশালী উদারস্বভাব মানব দিগেরও চিত্ত কালুষ্য ধারণ করে[১৮]। প্রবলতরঙ্গা অতিভীষণা নদী পার হওয়া যাইতে পারে ত তৃষ্ণাতরলিতান্তর ও তারুণ্যচঞ্চল যৌবন উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন[১৯]। "আহা! আমার সেই কান্তা, সেই মনোহর পীনস্তন, সেই চিত্তবিমোহন বিলাস, সেই নির্ম্মলশশধরপ্রখ্য সুন্দর আনন" যৌবন কালে যুবকগণ এই সকল চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে[২০]। সাধুগণ চঞ্চলচিত্ত বাসনাপ্রপীড়িত

যুবক দিগকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু বোধ করিয়া থাকেন[২১]। আলান যেমন মৌক্তিকধারী মত্ত করিবরের দর্প চূর্ণ করে, সেইরূপ, যৌবনও অভিমানমত্ত বহুদোষধারী পুরুষ দিগকে বিনাশ করিয়া থাকে[২২]। মহর্ষে! মনুষ্যের যৌবন কাননস্বরূপ। দারাপুত্রবিয়োগজনিত রোদন তাহার শুষ্ক বৃক্ষ, মন তাহার মূল, অসংখ্য দোষরূপ আশীবিষ (সর্প) সেই সকলকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই যৌবন কাননে দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই[২৩]। যৌবন পদ্মস্বরূপ। অনিত্য সুখ ইহার মধু, অনুরাগ কেশর, বিষয়চিন্তা ভ্রমরী, ইন্দ্রিয়গণ তাহার দল[২৪]। এই পদ্ম হৃদয়সরোবরবিহারী ধর্ম্মাধর্ম্মপক্ষদ্বয়বিশিষ্ঠ আধিব্যাধিরূপ বিহঙ্গম কুলের নীড়স্বরূপ[২৫]। নব যৌবন অপার মহা-সাগরের অনুরূপ। ইহাতে অসংখ্য কল্লোল ও কল্পনাতরঙ্গ বিরাজ করে[২৬]। যৌবন প্রবল বাত্যার অনুরূপ। যৌবনরূপিণী বাত্যা সমুদায় সদ্‌গুণ ও স্থৈর্য্য অপনয়ন করিতে (উড়াইতে) সক্ষম[২৭]। যৌবন এক প্রকার পাংশু (ছাই অথবা ধূলা।) এই পাংশু যৎপরোনাস্তি রুক্ষ। রুক্ষ যৌবনপাংশু যুবকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ করায়। অবশেষে তাহা দোষের উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করে ও উৎকরতুল্য (উৎকর=ঝেটেলা, অশুচি তৃণপর্ণাদিযুক্ত ধূলি) দুস্পর্শ হয়[২৮]। মানব দিগের যৌবনোল্লাস (যৌবনোৎসাহ) কেবল দোষের উদ্বোধন, গুণের উচ্ছেদ ও দুষ্কার্য্যলক্ষ্মীর (দুষ্কর্ম্মের সৌষ্ঠব) অর্থাৎ পাপ-সম্পদের বিলাস উৎপাদন করিয়া থাকে[২৯]।

হে মুনে! মনুষ্যের নবযৌবন চন্দ্রমাপ্রায়। ইহলোকে সেই নবযৌবনরূপ চন্দ্র মানব দিগের শরীররূপ পঙ্কজে রজোরূপ পরাগের দ্বারা প্রাপ্তচাপল্য বুদ্ধি-রূপ ষট্‌পদকে অবরুদ্ধ ও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে[৩০]। মহর্ষে! দেহরূপ উপবনে সমুদ্ভূত যৌবনরূপ পুষ্পমঞ্জরী মনোরূপ মধুকরকে নিয়তই মুগ্ধ ও উন্মত্ত করিতেছে[৩১]। যদ্রূপ মরুভূমিগত প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপতাপিত পিপাসা-কাতর হরিণগণ জলপান আশায় সবেগে ধাবমান হইয়া গর্ত্তে নিপতিত হয়, সেইরূপ, মনুষ্যের মনও সুখলাভবাসনায় যৌবনের প্রতি ধাবমান হইয়া বিষয়-বিষপূর্ণ গহ্বরে নিপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং যৌবন মৃগতৃষ্ণিকা অপেক্ষাও প্রতারক[৩২]। যৌবন শরীররূপ রজনীর জ্যোৎস্না, চিত্তরূপ কেশরীর জটা, এবং জীবনরূপ অম্বুনিধির লহরী। ঈদৃশ যৌবন আমার অসন্তোষকর বৈ সন্তোষকর নহে[৩৩]। এই যে যৌবন, ইহা মানবগণের দেহকাননে ক-দিন ফলবান্ থাকে? ইহার ফলকাল অতিসংক্ষিপ্ত। কতিপয় দিবস পরেই

ইহাতে শরতের আগমন হয়। (যৌবন শুকাইয়া যায়।) যাহা কতিপয় দিন পরেই শুকাইয়া যাইবে তাহার প্রতি সমাশ্বাস কি[৩৪]? চিন্তামণি (রত্ন-বিশেষ) যেমন অল্পভাগ্য নরের হস্ত হইতে শীঘ্রই অন্তর্ধান করে, সেইরূপ, যৌবনপক্ষীও দেহপিঞ্জর হইতে সত্বর পলায়ন করিয়া থাকে[৩৫]। যে পরিমাণে যৌবনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মনুষ্যের কামক্রোধাদি রিপুগণ তাহার বিনাশের নিমিত্ত উৎসাহিত হইতে থাকে[৩৬]। যাবৎ না এই যৌবনযামিনী প্রভাতা হয়, তাবৎ অসংখ্য রাগদ্বেষাদি পিশাচ দেহমধ্যে বিচরণ করিতে থাকে[৩৭]। হে মুনিশার্দ্দূল! জনগণ মৃতপ্রায় পুত্রের প্রতি যেরূপ করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিকারগ্রস্ত ও বিবেকবিহীন নশ্বর যুবক লোকের প্রতি সেইরূপ করুণা বিতরণ করুন[৩৮]। যে মানব এই ক্ষণভঙ্গুর যৌবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মোহবশতঃ আনন্দিত হয় সে মানব পশুমধ্যে গণনীয়[৩৯]। যে মানব অভিমানের মোহে উন্মত্ত হইয়া যৌবনের অভিলাষ করে, সেই মূঢ়চেতা মানব শীঘ্রই অনুতাপের উদরে দগ্ধ হইবে[৪০]। হে সাধো! যে সকল মহাপুরুষ যৌবনসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই ভূমণ্ডলে তাঁহারাই পূজনীয় এবং তাঁহারাই মহাত্মা[৪১]। মহর্ষে! মকরাকর ভীষণ সমুদ্রও সন্তরণদ্বারা পার হওয়া যায়, তথাপি, অশেষদোষাকর দুর্যৌবন অতিক্রম করা যায় না[৪২]। নির্দ্দোষে যৌবনার্ণব অতিক্রম করা যার পর নাই দুঃসাধ্য। মনুষ্যের পক্ষে বিচিত্রশোভাসম্পন্ন দেবোদ্যান যদ্রূপ দুর্লভ, বিনয়বিভূষিত আর্য্যজনসেবিত শমদমাদিগুণবিশিষ্ট সুযৌবন মনুষ্যের পক্ষে ততোধিক দুর্লভ[৪৩]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

রাম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, মহর্ষে! স্ত্রীমূর্ত্তি কি! স্ত্রীমূর্ত্তি কেবল মাংসাদির পুত্তলিকা। উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যন্ত্রের (যন্ত্র=কল) ন্যায় চপল এবং কতকগুলি অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত। এই ত পদার্থ! ইহাতে শোভাই বা কি! রমণীয়তাই বা কি[১]! হে বন্ধুগণ! ত্বক, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও জল প্রভৃতি পৃথক করিয়া দেখ, বিবেক চক্ষে অবলোকন কর, যদি সত্য সত্যই রম্য হয় তবে উহাতে আসক্ত হইতে নিষেধ করি না। নচেৎ বৃথা মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কি[২]? প্রমদাতনু কি? তাহার কতক অংশ কেশ, কতক অংশ রক্ত, এবং কতক অংশ মাংসাদি। ঐ সকলের রম্যতা কোথায়? ঐ সকল নিতান্ত ঘৃণ্য ও হেয়। সেই কারণে বিবেকসম্পন্ন প্রাজ্ঞ লোকেরা প্রমদাগণের কেশ, রক্ত, শরীর, সকলই নিন্দনীয় বলিয়া জানেন[৩]। ললনাগণ বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষণে ও সুগন্ধি অনুলেপনে যে-শরীরের সৌষ্ঠব সাধন করে, সে শরীর শ্মশানে শৃগাল ও কুক্কুরগণ ভক্ষণ করিবে। তাহাই তাহার শেষ ফল বা চরম পরিণাম[৪]। যে মেরুশিখরাকার উত্তুঙ্গ স্তনে গঙ্গালহরীর ন্যায় লাবণ্যময়ী মুক্তামালার শোভা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, সেই স্তন অচিরাৎ শ্মশানে ও দিগন্ত ভূমিতে শৃগাল কুক্কুরের অত্যুত্তম অন্নপিণ্ড তুল্য ভক্ষ্য হইবে[৫]।[৬]। বনচারী করভাদি জন্তুগণের শরীর যেরূপ রক্তমাংসাদিময়, কামিনী-শরীরও সেইরূপ রক্তমাংসাদিময়। তাহার নিমিত্ত এত আগ্রহ কেন[৭]? মুনিবর! রমণীশরীর অবিচার কালে রমণীয় বলিয়া কল্পনা করা যায় বটে; পরন্তু উহা মোহের উপকরণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৮]। বিপুলোল্লাসদায়িনী চিত্তবিকারকারিণী কামসন্তাপজননী রমণী হইতে মদোর কিছু মাত্র প্রভেদ নাই[৯]। ললনারূপ আলানে নিবদ্ধ পুরুষরূপ হস্তী সদুপদেশরূপ দৃঢ়তর অঙ্কুশে আহত হইলেও প্রবোধিত হয় না[১০]। কেশকজ্জলধারিণী রূপলাবণ্য-বতী লোচনপ্রিয়া রমণীরা অগ্নিশিখার ন্যায় দুস্পর্শা। ইহারা নরগণকে তৃণের ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে[১১]। কামিনীগণ দূরে থাকিয়াও গাত্রদাহ উপস্থিত করে এবং বস্তুতঃ নীরসা হইলেও সরসার ন্যায় প্রতীতা হয়। রমণীরা আপাতদর্শনে রসপূর্ণা বলিয়া প্রতীতা হইলেও পরিণামে অত্যন্ত

নীরসা হয়। অধিক কি বলিব, ইহারা নরকাগ্নির উত্তম কাষ্ঠ[১২]। কৃষ্ণবর্ণকবরীবিশিষ্টা তরলতারকনয়না পূর্ণেন্দুবিম্ববদনা বিকসিতকুসুম-সম-সুহাসিনী শৃঙ্গারলীলাদির দ্বারা চিত্তচঞ্চলকারিণী ও পুরুষগণের কার্য্য-সংহারিণী কামিনীরা দীর্ঘযামিনীর অনুরূপা। ইহারা মানবগণের বুদ্ধিকে মোহান্ধকারে নিমগ্ন করিয়া রাখে। পুষ্পসদৃশমনোহরা পল্লবশালিনী ভ্রমর-নয়না বিবিধবিলাসিনী সুস্তনী পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী চিত্তোন্মাদকারিণী রমণীরা বিষলতার ন্যায় মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে[১৩।১৬]। যদ্রূপ ভুজঙ্গদলন-কারী জন্তুগণ নিশ্বাসাদির দ্বারা গর্ত্ত হইতে ভুজঙ্গগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে; সেইরূপ, কামিনীরাও বিবিধপ্রলোভন ও আশ্বাস প্রদান দ্বারা পুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভূত করে[১৭]। হে ব্রহ্মন্! কাম-নামক কিরাত মুগ্ধচিত্ত নররূপ বিহঙ্গম দিগকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নারী-রূপিণী বাগুরা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে[১৮]। মনোরূপ মত্তমাতঙ্গ রমণীরূপ আলানে রতিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মূকবৎ অবস্থিতি করিতেছে[১৯]। লোকে যাহাদিগকে রমণী বলে, আমি দেখিতেছি, তাহারা কেবল ভবপল্বল-বিহারী মৎস্যরূপ পুরুষের দুর্ব্বাসনাসূত্রস্থ পিষ্টপিণ্ডিকাবৃত বড়িশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২০]। বামলোচনাগণ তুরঙ্গমগণের মন্দুরা, দন্তিগণের আলান, এবং ভুজঙ্গমগণের বশীকরণ মন্ত্র ও ঔষধ। ইহাদের দ্বারাই পুরুষরূপ আশী-বিষ গণ ধৃত ও বদ্ধ হয়[২১]। হে মুনে! নানারসবতী বিচিত্রভোগভূমি এই পৃথিবী স্ত্রীগণকে আশ্রয় করিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে[২২]। অশেষদোষাকর দুঃখশৃঙ্খলরূপিণী কামিনীতে আমার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই[২৩]। উহা-দিগের স্তনমণ্ডলে আমার কি হইবে? বিশাল নেত্রে ও ভ্রূযুগলেই বা আমার কি হইবে? ঐ সকল কেবল মাংসসার সুতরাং হেয়[২৪]। হে ব্রহ্মন্! মাংস-শোণিতময়ী অস্থিসারা রমণীগণের লাবণ্য কতিপয় দিবসেই বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল মাংস, রক্ত ও অস্থি যে কোথায় বিপ্রকীর্ণ হইয়া যায় তাহার নিদর্শনও থাকে না[২৫]। হে তাততুল্য! অদূরদর্শী পুরুষেরা যে সকল রমণীকে প্রণয়িনী বোধে লালন করিয়া থাকে সেই সকল অঙ্গনাগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অচিরাৎ শ্মশানভূমে নিপতিত হইবে[২৬]। পুরুষগণ আজ অত্যন্ত স্নেহের সহিত কামিনীগণের যে-মুখমণ্ডল অলকাদির দ্বারা সুশোভিত করিতেছে, কাল তাহা শ্মশানে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ করিবে। কামিনীগণের শরীর শ্মশানে ভস্মীভূত অথবা নিক্ষিপ্ত হয়। নিক্ষিপ্ত হইলে

তাহাদিগেব সেই সুদীর্ঘ কেশপাশ তত্রস্থ বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন গুচ্ছামরবৎ উদ্বেল্লিত এবং তাহা দিগের অস্থি সকল ভূমিতলে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় শোভমান হইতে থাকে। তাহাদিগের রক্ত তখন ধূলিসংলগ্ন হয়, তাহাদিগের মাংস ক্রব্যাদগণ ভক্ষণ ও শিবাগণ তাহাদিগের চর্ম্ম চর্ব্বণ করে, এবং তাহাদিগের প্রাণবায়ু আকাশে গমন করে। হে মুনিবর! স্ত্রী লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় বা পরিণামপ্রকার কথিত হইল। এক্ষণে তাহাতে যে ভ্রান্তি আছে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে সংসারস্থ লোকবৃন্দ! কি জন্য তোমরা ভ্রান্তির অনুগামী হইতেছ তাহা আমায় বল২৭।৩০

নারীদেহ পঞ্চ ভূতের দ্বারা সৃষ্ট। পঞ্চভূতনির্ম্মিত নিতান্ত অসার বস্তুর প্রতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত অনুরাগ প্রকাশ করে তাহা বলিতে পারি না!৩১ মনুষ্যের কান্তানুসারিণী চিন্তা সুতাল লতার ন্যায় (সুতাল=এক প্রকার বন্য লতা) কটূম্লফলশালিনী, মূর্দ্ধবিস্তীর্ণা ও অত্যন্ত দুর্গম শাখা প্রশাখার দ্বারা জটিল৩২।* যেমন যূথভ্রষ্ট মৃগ কোন্ দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে পারে না, না পারিয়া ব্যাকুল হয়, তেমনি, পুরুষগণও স্ত্রীর ভরণ পোষণার্থ ধনলোভে আকুল হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না, না পারিয়া ব্যাকুল হয়৩৩। পর্ব্বতখাতে (গহ্বরে) নিপতিত করিণীর জন্য অনুরক্ত মহাগজ যদ্রূপ অনুতাপ ভোগ করে, প্রমদানুরক্ত যুবক ব্যক্তিরা সেইরূপ শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে৩৪। যাহার স্ত্রী আছে তাহারই ভোগাভিলাষ জন্মে। যাহার স্ত্রী নাই তাহার আবার ভোগাভিলাষ কি? স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই পরম পবিত্র অখণ্ডসুখভোগে (ব্রহ্মানন্দানুভবে) সমর্থ হওয়া যায়৩৫। হে ব্রহ্মন্! এই চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর সুদুস্তর বিষয়ভোগে আমার অণুমাত্রও ইচ্ছা নাই। আমি কিরূপে জরামরণাদি ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইব, পরাৎপর পরমাত্মার পরম পদ লাভ করিব, শান্ত ও স্থির পদ প্রাপ্ত হইব, প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর কেবল তাহারই চিন্তা করিতেছি৩৬।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* মূর্দ্ধবিস্তীর্ণা—অগ্রভাগ বিস্তৃত। জটিল=জড়ান বা বায়ু প্রবেশ শূন্য। ভাবার্থ=স্ত্রী-চিন্তার পরিণাম অপরিহার্য্য দুঃখে পরিব্যাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! ক্রীড়া কৌতুকাদির অভিলাষ পূর্ণ হইতে না হইতেই যৌবন আসিয়া বাল্য কাল গ্রাস করে। আবার স্ত্রীসম্ভোগাদির অভিলাষ পূর্ণ না হইতেই বার্দ্ধক্য আসিয়া যৌবনকে গ্রাস করে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাল্য ও যৌবন কিরূপ কর্কশ (অসুখাবহ[১]।) হিম যেমন পদ্মকে, প্রবলবাত্যা যেমন শারদীয় (শরৎকালের) তৃণাদির অগ্রভাগস্থিত শিশির বিন্দুকে, নদী যেমন তীরতরুকে বিনষ্ট করে, তেমনি, জরা এই ভৌতিক দেহকে বিনাশ করিয়া থাকে[২]। মুনিবর! বিষ কণামাত্র ভক্ষিত হইলেও তাহা যেমন অচিরাৎ দেহবৈরূপ্য আনয়ন করে, তেমনি, জরঠ-রূপিণী জরা শীঘ্রই এই দেহস্থ-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জর্জ্জরীকৃত করিয়া অত্যন্ত বিরূপ করিয়া তুলিবে[৩]। কামিনীগণ শিথিল জরাজীর্ণ পুরুষকে বলীবর্দ্দের বা উষ্ট্রের সমান জ্ঞান করে[৪]। যেমন সপত্নীতাড়িতা স্ত্রী বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে ও গৃহান্তরে প্রস্থান করে, সেইরূপ, মনুষ্যও ক্লেশদায়িনী জরায় আক্রান্ত হইলে প্রজ্ঞা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়[৫]। স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ, বান্ধব, দাস, দাসী, সকলেই জরাগ্রস্ত মানবকে উন্মত্ততুল্য (পাগল) জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে[৬]। গৃধ্র যেমন উচ্চ বৃক্ষের আশ্রয়ে গমন করে, তেমনি, দুরাশা আসিয়া কুদৃশ্য, দৈন্যগ্রস্ত, গুণহীন ও পরাক্রমবিহীন বৃদ্ধ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। (বৃদ্ধ হইলে আশা ও অভিলাষ বাড়ে[৭]।) দৈন্যদোষময়ী অন্তর্দ্দাহ-প্রদায়িনী সুদীর্ঘা বিষয়বাসনা বালসখীর ন্যায় বৃদ্ধকালেও বর্দ্ধিতা হইতে থাকে[৮]। বার্দ্ধক্যে "হায়! এখন আমার কর্ত্তব্য কি! পরেই বা না জানি কি কষ্ট হইবে!" এইরূপ অপ্রতিবিধেয় ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে[৯]। মহর্ষে! বৃদ্ধ হইলে "আমি দুঃখী, আমি অকর্ম্মণ্য, আমি নিতান্ত হেয় বা তুচ্ছ, আমি কি করিব, ক্ষমতাই বা কি, কি প্রকারেই বা জীবন ধারণ করি, আমার কথায় কি প্রয়োজন, আমি মৌন হইয়াই থাকি।" ইত্যাদি প্রকার দৈন্য উদিত হইতে থাকে[১০]। অধিকন্তু বৃদ্ধকালে "আমি কখন্ কি প্রকারে কাহার নিকট হইতে সুস্বাদু ভক্ষ্য পাইব" এইরূপ চিন্তা অগ্নিসম বর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকে[১১]। বস্তুতঃই বৃদ্ধকালে সকল বিষয়েই অভিলাষ বৃদ্ধি পায় কিন্তু কোনও বিষয় উপভোগ করিবার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং

সামর্থ্যহীনতাপ্রযুক্ত বৃদ্ধদিগের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে[১২]। হে মুনিবর! এই দেহরূপ বৃক্ষে অঙ্গপীড়নকারিণী সুতরাং অপকারকারিণী জরা-রূপা বকী রোগরূপ কাল-সর্পে আক্রান্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে। সেই সময় আবার দীর্ঘমূর্চ্ছারূপ অন্ধকারের প্রত্যাশায় মৃত্যুরূপ উলূক (কাল-প্যাঁচা) আসিয়া দেখা দেয়[১৩।১৪]। যেমন সায়ংকাল আগতে তিমিরবিহারী পেচকগণ অন্ধকারের অনুগামী হয়, তেমনি, এই নশ্বর দেহে জরার আবির্ভাব দেখিলে মৃত্যু আহ্লাদ সহকারে তাহার অনুগমন করে[১৫]। হে মুনিনাথ! দেহবৃক্ষে জরাকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিলেই তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যু-রূপ বানর আসিয়া তাহাতে আরোহণ করে[১৬]। জনশূন্য নগরের লতাহীন তরুর ও অনাবৃষ্টিযুক্ত দেশের কিছু না কিছু শোভা থাকে, কিন্তু জরাজর্জ্জরিত দেহের অণুমাত্রও শোভা থাকে না[১৭]। জরা আমিষভোজিনী গৃধ্রীর সমান। গৃধ্রী যেমন মাংস খণ্ড গিলিবার জন্য কর্কশধ্বনি ও বেগ সহকারে মাংসখণ্ড গ্রহণ করে, সেইরূপ, জরাও কুৎসিত কাসধ্বনি সহকারে মানবগণকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে সমাগত হয়[১৮]। কুমারীগণ যেমন দর্শনমাত্রে সমুৎসুক চিত্তে কুমুদপুষ্পের শিরশ্ছেদন করে ও গ্রহণ করে, তেমনি, জরাও দেহস্থ সুশোভন যৌবন পুষ্প অবলোকন করিবামাত্র তাহার সংহারার্থ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে[১৯]। যেমন প্রবলবাত্যা তরুসমূহকে ধূলিধূসরিত ও তাহার শাখাপল্লবাদি বিশীর্ণ করিয়া থাকে, তেমনি, জরাও বহুবিধ রোগদ্বারা শরীরকে পাংশুবর্ণবিশিষ্ট ও জর্জ্জরিত করিয়া থাকে[২০]। যেমন তুষার পাতে পদ্মের ম্লানদশা জন্মে, সেইরূপ, জরার দ্বারাও দেহ জীর্ণ ও বিশীর্ণ হয়[২১]। জরারূপা কৌমুদী মস্তকরূপ গিরিপৃষ্ঠে উদিত হইয়া শীঘ্রই বাত ও কাসরূপ কুমুদ্বতীকে বিকসিত করিয়া থাকে[২২]। মানবগণের মস্তক জরারূপ লবণে ধূসরিত হইলে পক্বকুষ্মাণ্ডাকার হয়। অনন্তর কাল তাহা অবলোকন করিয়া ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হয়[২৩]। জহ্নুসুতা গঙ্গা তীরস্থিত বৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করেন, জরারূপিণী গঙ্গাও আয়ুঃপ্রবাহের চলনে শরীররূপ তীরবৃক্ষের মূল উন্মূলিত করিয়া থাকে[২৪]। জরারূপিণী মার্জ্জারী বলপূর্ব্বক যৌবনরূপ মূষিককে গ্রাস করে, করিয়া উল্লাসিতা হয়[২৫]। দেহজঙ্গলবাসিনী জরাজম্বুকী যেরূপ কর্কশ ও অমঙ্গল রব করে, সেরূপ রব অন্য কুত্রাপি শ্রুত হয় না[২৬]। জরা এক প্রকার অগ্নির প্রজ্বলন। দুঃখ তাহার মালিন্যকারক ধূম, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগ তাহার শীৎকার এবং এই জীবদেহ তাহার দাহন

(কাষ্ঠ)[২৭]। এই দেহ জরাবস্থায় পুষ্পফলভারাবনত লতার ন্যায় বাঁকিয়া যায় ও শ্বেতবর্ণ হয়[২৮]। এই দেহরূপ কদলীবৃক্ষ যখন জরাপ্রভাবে ধবলিত হয়, তখন, মৃত্যুরূপ মাতঙ্গ আসিয়া তাহা উৎপাটিত করিয়া থাকে[২৯]। মুনিবর! মৃত্যুরাজ আগমন করিবেন, সেই সূচনায় আধিব্যাধিরূপ তদীয় বহু সৈন্য জরারূপ শ্বেত চামর ধারণ করিয়া অগ্রে আগমন করিতে থাকে[৩০]। হে মুনিনায়ক! আপনি দেখুন, যাহারা গিরিগুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক পলায়ন করে, শত্রুরা তাহা দিগকে জয় করিতে অসমর্থ হয়। তাহারা শত্রুহস্তে রক্ষা পাইলেও জরারূপিণী রাক্ষসীর হস্তে পরিত্রাণ পায় না[৩১]। বালকগণ যেমন তুষারাচ্ছন্ন গৃহে অবস্থিতি করিয়া শরীরের অবশতাপ্রযুক্ত অঙ্গসঞ্চালন করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়গণ এই জরাক্রান্ত শরীরে অবসাদ প্রাপ্তে স্ব স্ব কার্য্যে অসমর্থ হয়[৩২]। যদ্রূপ নর্ত্তকী যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক মুরজবাদ্যতালে নৃত্য করে, তদ্রূপ, দেহ যষ্টি অবলম্বনে কাসবায়ুনিঃসরণরূপ মুরজবাদ্যতালে অতিবৃদ্ধা জরাযোষিৎ অনবরতঃ স্খলিত পদে নৃত্য করিয়া থাকে[৩৩]। যদ্রূপ গন্ধকুটিতে অর্থাৎ সুগন্ধিদ্রব্য নির্ম্মিত আধারে রাজব্যবহারযোগ্য শ্বেত-চামরাদি আন্দোলিত হয়, তদ্রূপ, জরাকালে মনুষ্যের দেহদণ্ডের উপরিভাগে পরিপক্ক কেশ সকল সংসার নামক রাজার ব্যবহার্য্য শ্বেত চামর দোলায়িত হইতে থাকে। * মহর্ষে! কুমুদ যেমন চন্দ্রোদয় হইলে বিকসিত হয়, তেমনি, জরা উপস্থিত হইলেও মৃত্যু অতীব প্রফুল্ল হয়[৩৪।৩৫]। এই শরীররূপ অন্তঃপুর যখন জরারূপ সুধায় (সুধা = চূর্ণ) ধবলিত হয়, তখন, এতন্মধ্যে অশক্তি, আর্ত্তি (ব্যাধি পীড়া) ও আপদ, এই তিন অঙ্গনা পরম সুখে বসতি করিতে থাকে[৩৬]। মহর্ষে! যাহাতে মৃত্যুর আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা জরাজিত, তাহাতে আমার আস্থা কি? আমি বশিষ্ঠাদির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ নহি; সুতরাং আমি জরামৃত্যুগ্রস্ত শরীরের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি[৩৭]। এই জরাক্রান্ত দুঃখময় শরীর ধারণ করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার ফল কি? সংসার-বিজয়িনী জরা সকলকেই জয় করিয়া হতোদ্যম করিবে; পরন্তু ইহাকে জয় করিতে কেহই সমর্থ হইবে না[৩৮]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* গন্ধকুটী। গন্ধ = কস্তূরী প্রভৃতি দ্রব্য। কুটী = আধার। শরীর পক্ষে = গন্ধ = বিষয়ভোগ। তাহার কুটী অর্থাৎ আশ্রয় স্থূল দেহ। ইহা লম্বায়মান বা দীর্ঘ বলিয়া যষ্টি।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাম বলিলেন, মুনিবর! সংসাররূপ গর্ত্তে নিপতিত মূঢ়বুদ্ধি মানবগণ নানাপ্রকার অলীক কল্পনাজাল বিস্তার করতঃ তন্নিবন্ধন রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ মহাভ্রমে পতিত হইয়া থাকে[১]। কিন্তু যাঁহারা সাধু তাঁহারা এই মাংসাস্থিময় দেহের বা সংসারের প্রতি অল্পমাত্রও আস্থা প্রকাশ করেন না। যাহারা বালক তাহারাই মুকুরপ্রতিবিম্বিত ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র ও লোলুপ হয়, অন্যে নহে[২]। যাহাদের ইহাতে অর্থাৎ এই সংসারে সুখবাসনা আছে, কালরূপ মূষিক তাহাদের সেই সেই বাসনা-রজ্জুর ছেদনকর্ত্তা। তাহারা যতই বাসনা রজ্জু নির্ম্মাণ করুক, কাল মূষিক সে সমস্তই অল্পে অল্পে ও অলক্ষ্যে ছেদন করিবে[৩]। যদ্রূপ বাড়বানল উচ্ছলিত সমুদ্রের সলিলরাশি গ্রাস করে, সেইরূপ, সর্ব্বভক্ষক কালও সংসারের সকল বস্তু গ্রাস করিয়া থাকে। এমন কিছুই নাই যাহা সর্ব্বভক্ষক কালের ভীষণ গ্রাসে পতিত না হয়[৪]। কাল সমুদায় পদার্থের অতিভীষণ সংহার রুদ্র। যে কিছু দৃশ্য দেখিতেছেন সমস্তই কালকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে[৫]। যিনি যতই বড় হউন, বল বুদ্ধি বৈভব যাঁহার যতই থাকুক, দ্যোতমান কাল সমস্তই বিনাশ করিবেন, কিছুমাত্র বিলম্ব ও কাহারও প্রতিক্ষা করিবেন না। লোক সকল জন্মিয়াই কালবদনে নিপতিত হয়[৬]। কালের কোনপ্রকার দৃশ্য রূপ নাই। কাল কেবল যুগ, বৎসর ও কল্পাদির দ্বারা অল্পমাত্র প্রকাশ পাইতেছে ও জগতীস্থ সমুদায় বস্তু আক্রম করিয়া আছে[৭]। গরুড় যেমন নাগ দিগকে নিগীরণ করে (নিগীরণ=গলাধঃকরণ), সেইরূপ, কালও পরমরূপবান সৎকর্ম্মশালী সুমেরুসদৃশগৌরবান্বিত ব্যক্তি দিগকেও নিগীরণ ও জীর্ণ করেন[৮]। কি নির্দ্দয়, কি কঠিন, কি ক্রূর, কি কর্কশ, কি কৃপণ, কি উত্তম, কি অধম, সকল ব্যক্তিই কালের উদরস্থ। এমন কেহই নাই যিনি কালের গ্রাসে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন[৯]। কাল মহা অদ্মর। মহা অদ্মর (অদ্মর=পেটুক) কালের মতি গতি কেবল ভক্ষণেই পর্য্যবসিত। কাল প্রত্যহই অসংখ্য লোক (জগৎ সংসার) ভক্ষণ করিতেছে তথাপি সে মহাশন (বহুভোজী) তৃপ্ত হইতেছে না[১০]। নট যেমন নাট্যশালায় নানারূপ ধারণ

ও ক্রীড়া করে, তেমনি, কালও এই সংসারে হরণ, নাশ, ভক্ষণ প্রভৃতি নানা আকারে নৃত্য করিতেছে[১১]। যেমন শুক পক্ষী দাড়িম্ব ফল বিদীর্ণ করিয়া তাহার বীজ সমুদয় ভক্ষণ করে, সেইরূপ, কালও এই অসৎ জগৎ ভেদ করিয়া তদন্তর্গত জীব সমুদয়কে অনবরত ভক্ষণ করিতেছে[১২]। যেমন বন্য হস্তী শুণ্ডাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করতঃ তরুরাজি উৎপাটিত করে, সেইরূপ, কালও এই জগৎ নিরন্তর আলোড়িত ও উন্মূলিত করিতেছে[১৩]। এই অপার ব্রহ্মাণ্ড অপঞ্চীকৃত ভুতাত্মা ব্রহ্মার উদ্যান। দেবগণ তাহার ফল। সর্ব্বব্যাপী কাল সে সমস্তই আক্রমণ করিয়া আছে। এই কালরূপ পুরুষ অবিশ্রান্ত যামিনীরূপ-ভ্রমরীপরিপূর্ণ ও দিনরূপমঞ্জরীবিশিষ্ট বৎসর, কল্প, যুগ ও কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি লতা রচনা করিতেছে, তাহাতে তাহার অল্প মাত্রও শ্রান্তি হইতেছে না[১৪।১৫]। হে মহর্ষে! ধূর্ত্তচূড়ামণি কাল কোনও প্রকারে ছিন্ন, ভিন্ন, ভগ্ন, দগ্ধ ও দৃশ্য-যোগ্য হয় না অথচ কাল ব্যতীত অন্য কিছু ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন দগ্ধ ও দৃক্‌গোচরে উপস্থিত হয় না[১৬]। কাল মনোরাজ্যের অনুরূপ। কালের ও মনোরাজ্যের প্রভেদ নাই। কাল মনোরাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত ও নিমেষমধ্যে বহুবস্তুসমন্বিত জগতের উৎপাদন ও নিধন কর্ত্তা[১৭]। আত্মম্ভরি কাল দৃঢ়ব্রতা বিবিধক্লেশ-দায়িনী ও দুর্ব্বিলাসশালিনী চেষ্টার সহিত মিলিত আছে। কালের সেই সেই চেষ্টায় এই ভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই চেষ্টায় তদুৎপাদিত দেহে আত্মাধ্যাস। এই কালই জীবদিগকে স্বর্গ নরক ভোগ করাইতেছে এবং এই আত্মম্ভরি কাল তৃণ পর্ণ হইতে মহেন্দ্র ও সুমেরু পর্য্যন্ত বস্তু গ্রাস করিতে উদ্যত আছে[১৮।১৯]। ক্রূরতা, লোভ, দুশ্চাঞ্চল্য ও দুর্ভাগ্য, সমুদায়ই কালে অবস্থিত[২০]। যেমন বালকেরা আপন আপন প্রাঙ্গণে কন্দুক নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রীড়া করে, সেইরূপ, কালও গগন চত্বরে পুনঃ পুনঃ চন্দ্রসূর্য্য নামক কন্দুক-দ্বয় আস্ফালন (উদয় ও অস্ত) করতঃ ক্রীড়া করিতেছে[২১]। এই কাল কল্লান্তে সমুদায় প্রাণিবিভাগ বিনাশ ও তাহাদের ভূতপঞ্চকময় অস্থি মালায় আপনার সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করতঃ (আপাদ মস্তক শোভমান করিয়া) ক্রীড়া করিতে সঙ্কুচিত হয় না[২২]। কালের চরিত্র (কার্য্য) নিরঙ্কুশ, নিতান্ত বিচিত্র, ও স্বাধীন। কল্লান্ত কালে ইহারই অঙ্গনির্গত বায়ু সুমেরু পর্ব্বতকেও ভূর্জ্জত্বকের ন্যায় শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেয়[২৩]।* এই কাল কখন রুদ্র,

* কল্লান্ত = মহাপ্রলয়। বায়ু অর্থাৎ প্রলয়-বায়ু। ভূর্জ্জত্বক্ = ভূর্জ্জপত্র। প্রবল বায়ুর আঘাত পাইলে ভূর্জ্জপত্রের গাছ বিশীর্ণ হইয়া যায়। টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়।

কখন মহেন্দ্র, কখন ইন্দ্র, কখন কুবের, আবার কখন কিছুই নহে। অর্থাৎ তাহার কোনও প্রকার রূপ থাকে না[২৪]। যদ্রূপ. সরিৎপতি স্বীয় অঙ্গে অজস্র তরঙ্গমালা উৎপাদন, ধারণ ও সংহার করে, তদ্রূপ, কালও আপ্নাতে অজস্র সৃষ্টিপ্রবাহ ধারণ ও অজস্র সে সকলের সংহার করিতেছে[২৫]। * কাল মহাকল্প নামক বৃক্ষ হইতে দেবতা ও অসুর নামক পক্ক ফল পাতিত করিতেছে[২৬]। ঋষে! কাল একটী বৃহৎ উড়ুম্বর বৃক্ষ (এক প্রকার ডুমুর গাছ।) তাহার ফল অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণী সকল তন্মধ্যগত মশক, তাহারা কিছুকাল বৃথা ঘুঁ ঘুঁ করে, করিয়া মরিয়া যায়[২৭]। মুনিবর! কাল চৈতন্যরূপ জ্যোৎস্নার সন্নিধান বশতঃ প্রফুল্লিতা অর্থাৎ ব্যক্তভাবপ্রাপ্তা জগৎসত্তাসামান্যরূপিণী প্রিয়তমা ক্রিয়া কুমুদিনীর সহিত মিলিত বা এক শরীর হইয়া হর্ষানুভব করিতেছে[২৮]। † কাল অনন্ত অপার অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত নিজ বপু অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব মহাশৈলের ন্যায় অবস্থান করিতেছে[২৯]। মহর্ষে! কাল কোথাও বা গাঢ়শ্যামবর্ণ, কোথাও বা উজ্জ্বল কমনীয় বর্ণ, কোথাও বা উভয়বর্জ্জিত কার্য্য উৎপাদন করতঃ অবস্থিতি করিতেছে[৩০]। ‡ কাল অসংখ্যপ্রাণিবিভাগ লীন করিয়াছে, তাহার অবশিষ্ট সারের (স্থিরাংশের) ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে। কালের সে রূপ পৃথিবীর ন্যায় আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, কাল সর্ব্বাধার ও স্থির, আর সব অসার ও অস্থির)[৩১] শতকল্প অতীত হইলেও কাল খেদান্বিত হয় না, আদর প্রাপ্তও হয় না। কালের গতি, স্থিতি, উদয় ও অস্ত, কিছুই নাই[৩২]। কাল জগৎসৃষ্টিরূপ

---

* সমুদ্রে তরঙ্গ বা ঢেউ নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। এই ক্ষণধ্বংসী বিশ্ব সমুদ্রলহরীর অনুরূপ। কালরূপ মহাসমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গ অজস্র উঠিতেছে ও লীন হইতেছে।

† চৈতন্য=ব্রহ্ম। তাঁহারই সন্নিকর্ষ বিশেষে রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের আবির্ভাব হয়। সেইজন্য জগতের পৃথক অস্তিত্ব নাই ও সেইজন্যই জগৎবিকাশের কারণ চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য। এস্থলে জগতের অস্তিতা কুমুদ্বতী, তৎসম্বন্ধীয় জ্যোৎস্না ব্রহ্মচৈতন্য। কাল ঐ দুই লইয়া শুভাশুভ কর্ম্মরূপ ভার্য্যার সহিত একশরীর হইয়া আপনি আপনার ইচ্ছাশরীরে আনন্দ অনুভব করিতেছে। স্থূল কথা এই যে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, শুভাশুভ কর্ম্ম, তদনুসারে স্বর্গ নরকাদি ভোগ, সমস্তই কালের প্রভাব বা মহিমা।

‡ নিশায় ও অঞ্জন প্রভৃতিতে কৃষ্ণবর্ণ কার্য্য। দিবসে, পূর্ণিমার রাত্রে ও মণি প্রভৃতিতে কমনীয় উজ্জ্বল বর্ণ কার্য্য। গৃহভিত্তি প্রভৃতিতে উভয়বর্জ্জিত কার্য্য।

ক্রীড়ায় আস্থাপরিশূন্য ও অভিমানত্যাগী হইয়া আপনিই আপনাকে বিবর্ণ করিতেছে ও পালন বা পরিরক্ষণ করিতেছে[৩৩]। কাল সরোবরের অনুরূপ; রাত্রি তাহার পঙ্ক, দিন তাহার ফুল্ল কোকনদ, মেঘাদি তাহার ভ্রমর[৩৪]। যদ্রূপ কৃপণ অর্থাৎ লোভী ব্যক্তি মার্জ্জনীর দ্বারা কনকাচলের চতুর্দ্দিক হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করিবার বাঞ্ছা করে, সেইরূপ, কালও রজনীরূপ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা জগতের প্রাণিনিবহ অজস্র সংগ্রহ করিতেছে[৩৫]। যেমন মনুষ্যেরা অঙ্গুলির দ্বারা দীপবর্ত্তিকা সঞ্চালন করিয়া গৃহকোণস্থ বস্তুসমুদয় দর্শন করে; সেইরূপ, কালও ক্রিয়ারূপ অঙ্গুলির দ্বারা (ক্রিয়া=সূর্য্যাদির গতি। দিন বা তিথি)। সূর্য্যরূপ দীপ উজ্জ্বলিত করিয়া জগতের কোথায় কি আছে তাহা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছে[৩৬]। কাল অনবরত নিমেষরহিত সূর্য্যরূপ নেত্রে অবলোকন করতঃ জগৎরূপ জীর্ণারণ্য হইতে লোকপালরূপ পক্ব ফল চয়ন করতঃ ভক্ষণ করিতেছে[৩৭]।

মহর্ষে! কাল জীর্ণকুটীরস্থ মণির ন্যায় জগতের গুণশালী লোকদিগকে যত্ন সহকারে মৃত্যুরূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখে এবং লোক সমুদায়কে রত্নমালার ন্যায় গ্রন্থন করতঃ ভূষণার্থ অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে[৩৮।৩৯]। নিতান্ত চপল (চঞ্চল) কাল দিনরূপ হংসানুগত তারারূপ কেশরযুক্ত নিশারূপ ইন্দীবর মালা বলয়িত করিয়া ধারণ করিতেছে ও শৈল, সিন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবী, এই শৃঙ্গচতুষ্টয়শালী জগদ্রূপ মেষের নক্ষত্রপুঞ্জরূপ শোণিতকণা প্রত্যহ ভক্ষণ করিতেছে[৪০।৪১]। * অধিক কি বলিব, হিংসাপরায়ণ কাল যৌবনরূপ নলিনীর চন্দ্রমা ও আয়ুরূপ মাতঙ্গের কেশরী। জগতে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ এমন কোন বস্তু নাই, কাল যাহার তস্কর নহে[৪২]। জীবগণ যেমন সুষুপ্তিকালে সর্ব্ব দুঃখ সংহার করিয়া অজ্ঞান

---

* ইন্দীবর=নীলপদ্ম। রাত্রিগুলি যেন সূত্রগ্রথিত নীলপদ্মের মালা। অন্তরালে বা মধ্যে মধ্যে যে দিন আছে, সেই গুলি শ্বেত হংস। পদ্মবনে—হংসের বিচরণ প্রসিদ্ধ। রাত্রে যে নক্ষত্র প্রকাশ পায়, সে গুলি যেন কেশর অর্থাৎ রাত্রিরূপ নীলপদ্মের কিঞ্জল্ক (পদ্মের ঝুরি) এই মালা কালের গলদেশে বলয়িত হইয়া আছে (ঝুলিতেছে)। মালা যেমন দুই তিন ফের বা পেঁচ দিয়া ধারণ করে, এ মালাও সেইরূপ অনন্ত ফেরে বা পেঁচে ধৃত হইয়াছে। জগৎ যেন একটী মেষ (ভেড়া), শৈলাদি তাহার শৃঙ্গ। নক্ষত্রগণ তাহার শোণিত বিন্দু, এবং কাল তাহার ভক্ষক। অর্থাৎ প্রতি কল্পেই জগৎ মেষের নক্ষত্ররূপ রক্ত কালের উদরস্থ হয়। এক এক কল্প কালের এক এক দিন।

মাত্র অবলম্বনে স্থিতি করে, তেমনি, কালও কল্পান্তক্রীড়াবিলাসচ্ছলে, সমুদায় জন্তু সংহার করিয়া ব্রহ্মমাত্র অবলম্বনে অবস্থিতি করে। কালই বিশ্বের কর্ত্তা, ভোক্তা, সংহর্ত্তা ও স্মর্ত্তা এবং কালই সুভগদুর্ভগরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। কেহই সামান্য বুদ্ধির দ্বারা কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এবং সমুদায় জীবলোকের মধ্যে একমাত্র কালই সমধিক বলবান্[৩৩।৩৫]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।
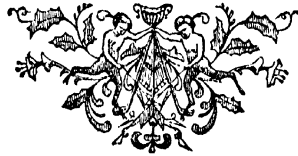
চতুর্ব্বিংশতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! কালের লীলা অদ্ভুত ও পরাক্রম অচিন্ত্য। এই সংসারে রাজপুত্ররূপ * কালের চরিত্র বর্ণন করি, শ্রবণ করুন[১]। রাজপুত্র কাল এই অত্যন্ত জীর্ণ জগৎ অরণ্যে অজস্র অজ্ঞজীবরূপ মৃগের প্রতি মৃগয়া অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ করিতেছে, তথাপি তাহার তৃপ্তি নাই। মহর্ষে! জগৎ জঙ্গলের প্রান্তে অবস্থিত কল্পান্তকালের মহার্ণব কাল নামক মৃগয়াচারী রাজপুত্রের ক্রীড়া পুষ্করিণী। সে পুষ্করিণীর পঙ্কজ বাড়বানল[২।৩]। এই সকল প্রাণিবিভাগ অথবা ভূতবিভাগ কটু, তিক্ত ও অম্লাদি স্থানীয়। এ সকল দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতিতে মিশিয়া উত্তম পানক হয় †। তাহা জগৎ রাজ্যের যুবরাজ কালের প্রাতরাশ (প্রাতর্ভক্ষ্য) নির্ব্বাহ করে[৪]। কালের প্রণয়িনী চণ্ডী অর্থাৎ প্রলয়রাত্রি। সর্ব্বভূতবিনাশিনী কালপ্রিয়া প্রলয়রাত্রি মাতৃগণপরিবৃতা (জরা ও মৃত্যু প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিতা) হইয়া নিরন্তর এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতেছে[৫]। সর্ব্বরসসমন্বিতা কমল-কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতি সুগন্ধি-কুসুমগন্ধ-মোদিতা এই বিস্তৃতা পৃথিবী কালের করতলস্থিত পানপাত্ররূপে বিরাজমানা আছে[৬]। মহর্ষে! যাহার ভুজাস্ফালন নিতান্ত দুঃসহ, যাহার কেশর নিতান্ত দুর্দ্দর্শ ও স্কন্ধদেশ পীবর, সেই নৃসিংহদেব (হিরণ্যকশিপুবধার্থ বিষ্ণুর অবতার) কালের স্বভুজবিরচিত পিঞ্জরের দৈত্যরূপ ক্ষুদ্রপক্ষিবধের ক্রীড়াশকুন্ত অর্থাৎ বাজপক্ষী (বাজ এক প্রকার পক্ষী। ব্যাধেরা ক্ষুদ্র পক্ষী মারিবার জন্য বাজ পুষিয়া রাখে।

---

* রাজা অর্থাৎ পরব্রহ্ম। তদীয় তেজে মায়া নাম্নী মহিষীর গর্ভে (মায়ায় চিৎপ্রতিবিম্বের আবেশ হওয়ায়) কালের জন্ম হইয়াছে। সুতরাং কাল রাজপুত্র। এই জগৎ রাজ্যের রাজা ব্রহ্ম ও যুবরাজ কাল।

† পানক=পানা। সরবত। পশ্চিম দেশে দধি প্রভৃতি অম্ল পদার্থের সহিত চিনি ও মরিচ প্রভৃতি অর্থাৎ মিষ্ট ও ঝাল প্রভৃতি মিশাইয়া সরবত প্রস্তুত করার প্রথা আছে। ভূতবিভাগ অর্থাৎ ইহা মানুষ, ইহা পশু, ইত্যাদি। কাল সমুদায় ভূতবিভাগ সমুদ্রে মিশাইয়া সরবত করিয়া পান করিয়া থাকে। কালের এক এক বার পানক-পান অর্থাৎ সরবত খাওয়া এক একটী কল্প বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে।

আবশ্যক হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেয় দিলে তৎক্ষণাৎ সে প্রদর্শিত পক্ষী মারিয়া ফেলে[৭])। যাঁহার ধ্বনি বহু অলাবু ঘটিত বীণার ন্যায় গভীর ও মধুর, এবং যাঁহার ছবি শরন্মেঘের সদৃশ, সেই সংহারভৈরব নামধেয় মহাকালও এই কাল নামক যুবরাজের ক্রীড়াকোকিল[৮]। কালাভিধান রাজপুত্রের অভাব (সংহার) নামা কোদণ্ড (ধনুঃ) সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছে। সে ধনুর টঙ্কার অনবরত শ্রবণগোচর হইতেছে এবং তাহা হইতে অজস্র দুঃখবাণ নিঃসৃত হইতেছে[৯]। ব্রহ্মন্! যার পর নাই বিলাসচতুর রাজপুত্র কাল নিজেও দৌড়িতেছে এবং তাহার লক্ষ্যও নিরন্তর দৌড়িতেছে। অথচ সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে না। সে সকলকেই দুঃখ বাণে বিদীর্ণ করিতেছে। মহর্ষে! আমি সেই জন্যই মনে করি, রাজপুত্র কালই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবেধী এবং ইহার বাণও অব্যর্থ। এই কাল নামক রাজপুত্রই এই জীর্ণ জগতে বিষয়লোলুপ দিগকে মর্কট অপেক্ষা অধিক চঞ্চল করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ইহ জগতে উক্তপ্রকারে বিরাজমান থাকিয়া কথিত প্রকাবের মৃগয়াবিহার অনুভব করিতেছে[১০]।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতিতম সর্গ।

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে! আমার বিবেচনায় কাল দুর্বিলাসী দিগের চূড়ামণি অর্থাৎ দুষ্টাশয়গণের বরিষ্ঠ। ইনি পূর্ব্বোক্ত মহাকাল নহেন। ইনি অন্য কাল। অন্য কাল হইলেও ইনি পূর্ব্বোক্ত মহাকালের অন্তর্গত (অবস্থান্তর)। এই কালই ইহলোকে পদার্থ নিচয় সৃজন করে, আবার সংহারও করে। এই কালের অপর নাম দৈব[১]। * একমাত্র ক্রিয়াই ইহার রূপ বা স্বরূপ। অন্য কোন রূপ বা স্বরূপ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার কর্ম্মফল নিষ্পাদন করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য বা চেষ্টা নাই[২]। যেমন প্রখর তাপ দ্বারা হিমরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, কর্ম্মের বা কালের দ্বারা এই নিখিল প্রাণী বিনষ্ট হইতেছে। (ভাবার্থ এই যে, যে কিছু অর্থ ও অনর্থ—সমস্তই দৈব নামক কালের কার্য্য[৩])। এই যে পরিদৃশ্যমান জগন্মণ্ডল, ইহা উক্ত কালের নর্ত্তনাগার এবং ইহাতে সে নিরন্তর নৃত্য করিতেছে[৪]। এই কাল পূর্ব্বোক্ত মহাকাল অপেক্ষা তৃতীয়। লোকে যাহাকে মহাকাল বলে, তাহাই দৈব ও কৃতান্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ নরাস্থিধারীর বেশে নৃত্য করিতেছে[৫]। মহর্ষে! এই নর্ত্তনশীল কৃতান্ত স্বীয় ভার্য্যা নিয়তির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত[৬]। তাহার সংসাররূপ বক্ষে শশিকলার ন্যায় শুভ্র ত্রিধাবিভক্তগঙ্গাপ্রবাহ নিবীত, উপবীত ও অবীতরূপে † বিদ্যমান আছে[৭]। হে ব্রহ্মন্! চন্দ্র ও সূর্য্য কালের করভূষণ, ব্রহ্মাণ্ড তাহার কর্ণিকা (কর্ণাভরণ), এবং সুমেরু তাহার ক্রীড়াসরোজ[৮]। বিচিত্রনক্ষত্রবিন্দুশোভী প্রলয়মেঘদশান্বিত (দশা=বস্ত্রের ছিলা। ফুঁপি)। এই অসীম নভোমণ্ডল কালের বস্ত্র। ইহা একার্ণব জলে

---

* পূর্ব্বোক্ত মহাকালের অবান্তর ভেদ দৈব ও কাল। যে কাল বা কালের যে অবস্থা জীবগণের স্বকৃত কর্ম্মের ফলোৎপত্তির কারণভাব প্রাপ্ত হয় তাহা দৈব। "দীব্যতি ব্যবহরতি প্রাণিনাং কর্ম্মফলদানেন" ইতি দৈবম্। এই দৈবই কৃতান্ত ও ফলাবস্থ কাল। "কলয়তি ফলং সম্পাদয়তি ইতি কালঃ।" অতএব, কাল স্বরূপতঃ এক হইলেও পূর্ব্বাবস্থা ও উত্তরাবস্থা ভেদে দ্বিভেদবিশিষ্ট হয়। পূর্ব্বাবস্থা দৈব ও উত্তরাবস্থা কাল, মৃত্যু ও কৃতান্ত।

† গঙ্গার ৩ ধারা। এক ধারা স্বর্গে, এক ধারা পাতালে, এক ধারা পৃথিবীতে। এই তিনটী কালের গলদেশে উপবীত, নিবীত ও অবীত যজ্ঞসূত্রের ন্যায় ঝুলিতেছে। উপবীত—বামস্কন্ধা-

ধৌত হইয়া থাকে[৯]। এবম্বিধ কালের পুরোভাগে নিয়তিনাম্নী তদীয় কামিনী আলস্যপরিশূন্যা ও প্রাণিভোগানুকূল কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া অনবরত নৃত্য করিতেছে[১০]। প্রাণিগণ ও সেই চঞ্চলা অমোঘক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্টা কৃতান্তকামিনীর নৃত্যদর্শনার্থ জগৎরূপ নর্ত্তনাগারে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে[১১]। দেবলোকাদি সমুদয় লোক উক্তকালকামিনী নিয়তির মনোহর অঙ্গভূষণ এবং পাতালাদি নভস্তল পর্য্যন্ত লম্বমান তাহার কেশ-কবরী[১২]। নিয়তির পাতালরূপ চরণে নরলোক স্থিত জীবমালা নূপুরের ন্যায় শোভমান আছে। সে নূপুর সুকৃত-দুষ্কৃত-সূত্রে গ্রথিত, হাস্য-রোদনাদিরূপ শব্দকারী, ও স্বর্গনরকাদিরূপ উজ্জ্বলতায় ও মালিন্যে ব্যাপ্ত। চিত্রগুপ্ত শুভক্রিয়ারূপা তদীয় সখীর উপকল্পিত প্রাণিকর্ম্মসৌরভ্যরূপ কস্তূরি-তিলকদ্বারা উক্তকালকামিনী নিয়তির যমরূপ (যম=মৃত্যু বা কৃতান্ত। নিয়তি মৃত্যুর দ্বারা এ সমুদায় ভক্ষণ করে; সেইজন্য মৃত্যু তাহার মুখ)। মুখমণ্ডল উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছে ও করিতেছে[১৩।১৪]। এই কালকামিনী নিয়তি কল্পান্ত সময়ে স্বীয় স্বামীর ইঙ্গিতযুক্তমুখভাব অবগত হইয়া অতিশয় চাঞ্চল্যসহকারে নৃত্য করিয়া থাকে। তখন পর্ব্বতস্ফোটাদিজনিত ভয়ঙ্কর শব্দ তাহার নর্ত্তনশীল চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়[১৫]। নিয়তির পশ্চাদ্ভাগে প্রলয়সমুদ্ভূত ভীষণ বহ্নিরূপ কুমার, ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিয়া থাকে। তৎকালে সংহারদেব মহাদেবের নয়নত্রয়মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ রন্ধ্র হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বহিরাগত হয়। মহর্ষে! মহাদেবের জটাজূটমণ্ডিত চন্দ্রলাঞ্ছিত বদনপরম্পরা ইহার মুখ এবং ভগবতীর বিকসিতমন্দারমণ্ডিত কবরীভার ইহার চামর[১৬।১৭]। নৃত্য সময়ে তৎসমস্তই পুনঃ পুনঃ বিচলিত বা আন্দোলিত হয়। সংহারভৈরবের উদররূপ বৃহৎ অলাবু তদীয় সহস্রছিদ্রান্বিত ইন্দ্রদেহ-ভিক্ষার কপাল (ভিক্ষাপাত্র)। এই কপাল তখন তদীয় হস্তে বিকটধ্বনি সহকারে অবস্থান করে[১৮]। তখন সর্ব্বসংহারকারিণী নিয়তি কঙ্কাল মালায় নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করতঃ আপনা আপনি ভীত হইতে থাকেন[১৯]। বিবিধাকারসম্পন্ন জীবের মস্তক সকল পুষ্করমালার ন্যায় নিয়তির কণ্ঠদেশে

সক্ত যজ্ঞসূত্র। অবীত=দক্ষিণস্কন্ধাসক্ত যজ্ঞসূত্র। নিবীত=কণ্ঠলম্বিত মালাকার যজ্ঞ সূত্র। বিন্দু=ফুট ফুট। আকাশ যেন ছিট্ কাপড়, নক্ষত্রবৃন্দ তাহার চিত্রবিন্দু, প্রলয়কালের মেঘ তাহার ছিলা বা ফুঁপি, কাল ঈদৃশ ছিট্-কাপড় পরিধান করিয়া আছে।

দেদীপ্যমান হয়। কালের কল্পান্ততাণ্ডববিলাসে * তাহা নিরন্তর বিচলিত হইতে থাকে[২০]। মহর্ষে! প্রলয়কালে কালের ও কালবনিতার নৃত্যধ্বনি (পদশব্দ) শ্যামবর্ণ পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদি † মেঘের গর্জ্জন এবং সে গর্জ্জনে দেবগায়ক গন্ধর্ব্বেরাও পলায়ন করিয়া থাকেন[২১]।

মহর্ষে! চন্দ্রমণ্ডল এই নৃত্যকারী কৃতান্তের কুণ্ডল, এবং তারকা ও চন্দ্রিকা সমন্বিত ব্যোম (নভোমণ্ডল) কেশভূষণ[২২]। তাহার এক কর্ণে হিমালয় ও অপর কর্ণে কাঞ্চনগিরি সুমেরু শোভা পাইয়া থাকে[২৩]। চন্দ্রও কালকৃতান্তের কর্ণাভরণ অর্থাৎ শোভমান কুণ্ডল এবং লোকালোক পর্ব্বত তদীয় কটিতটের মেখলা (কটীভূষণ অর্থাৎ গোট্[২৪])। ঋষে! বিদ্যুৎ এই কালের বলয়াকৃতি কঙ্কণ (হস্তভূষা)। এ কঙ্কণ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া থাকে। অপিচ, জলদজাল ইহার বিচিত্র অংশুপট্টিকা (গায়ের কাপড়। দোলাই)। এ অংশুপট্টিকা বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া শোভা বিতরণ করিয়া থাকে[২৫]। অপক্ষীয়মান (যাহা দিন দিন ক্ষয় হয় তাহা অপক্ষীয়মান) জগৎ হইতে বিনির্গত অথবা পূর্ব্ব সৃষ্টি হইতে কৃতান্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত মুষল, পট্টিশ, প্রাস, শূল, তোমর ও মুদ্গর প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমূহে বিরচিত শোভাময় মালা ইঁহার গলদেশে নিক্ষিপ্ত আছে[২৬]। এই মালা সংসরণশীল জীবমৃগ-বন্ধনার্থ দীর্ঘীকৃত, অনন্ত মহাসূত্রে গ্রথিত এবং এই মালা উক্ত মহাকালের করচ্যুত হইয়া কৃতান্ত নামা কালের কণ্ঠে শোভা বিস্তার করিতেছে[২৭]। বিবিধরত্নসমুজ্জ্বল জীবরূপমকরলাঞ্ছিত সপ্তসাগররূপ কঙ্কণশ্রেণী তদীয় কম্বুদ্বয়ের আভরণ[২৮]। অপিচ, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহাররূপ আবর্ত্তযুক্ত, সুখদুঃখসংশ্রববিশিষ্ট, এবং শ্যামবর্ণ প্রকৃতিগুণ তদীয় রোমাবলিরূপে বিরাজ করিতেছে[২৯]। ‡

এবংরূপবিশিষ্ট বা এবম্প্রকার কৃতান্তরূপী কাল কল্পশেষে তাণ্ডবোদ্ভব নৃত্য-চেষ্টা উপসংহার করতঃ অবস্থান করেন। অর্থাৎ তাদৃশ নৃত্যচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া কিছু কাল বিশ্রাম করেন। পরে পুনর্ব্বার ব্রহ্মাদির সহিত

* পুরুষের উৎকট নৃত্য তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের কোমল নৃত্য লাস্য।

† মহাপ্রলয় সময়ে জগৎ বিনাশার্থ যে মেঘ সমূহের উদয় হয় সেই সকল মেঘের নাম পুষ্কর, আবর্ত্তক, সম্বর্ত্তক, প্রভৃতি এবং সে সকল প্রগাঢ় নীলবর্ণ।

‡ পক্ষান্তরে আবর্ত্ত = জলের ভ্রমণ। জলস্রোতের পাক। শ্যামবর্ণ প্রকৃতিগুণ অর্থাৎ তমোগুণ।

মহেশ্বর প্রভৃতি সৃজন পূর্ব্বক এই জরা মরণ শোক দুঃখ ও অবিভব বিভূষিতা সৃষ্টিরূপিণী স্বীয় নাট্যলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন৩০।৩১। বালক যেমন কর্দ্দম লইয়া নানাপ্রকার পুত্তলিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, এবং পর ক্ষণেই আবার তাহা সংহার করে, তেমনি, কালও চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ দেশ, বন, নানাবিধ শৈল, অসংখ্য ও বিবিধ জীব ও তাহাদের আচারপরম্পরা সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার তাহা সংহার করিতেছে৩২।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশতিতম সর্গ।

শ্রীরাম কহিলেন, মহর্ষে! কাল এই সংসারে উল্লিখিত সমুদায়ের স্বজন ও সংহার করিতেছে করুক—তাহাতে আমার কি? কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে তাহাতে আস্থাবান্ হইতে পারে?[১] হে মুনিবর! দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত দৈব প্রভৃতির দ্বারা আমরা বিমোহিত হইয়া বিক্রীতের ন্যায় ও আরণ্য মৃগের ন্যায় অবস্থান করিতেছি[২]। বলিতে কি, অনার্য্যচরিত সংহারসমুদ্যত কাল লোক সকলকে নিরন্তর আপদ সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। অগ্নি যেমন উচ্চ প্রকাশ শিখার দ্বারা দগ্ধ করে, সেইরূপ, কালও দুরাশা ও দুশ্চেষ্টা উদ্দীপিত করিয়া লোকদিগকে দগ্ধ করিতেছে[৩।৪]। নিয়তি এই কালমর্য্যাদারূপ কৃতান্তের প্রিয়া ভার্য্যা। সে স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাপল্য বশতঃ সমাধিপরায়ণ যোগীদিগকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিতেছে[৫]। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তেমনি, ক্রূরহৃদয় কৃতান্ত অবিশ্রান্ত প্রাণী দিগকে আক্রমণ ও তাহাদিগের তরুণ শরীরে জরা উপস্থিত করিয়া গ্রাস করিতেছে[৬]। আর্ত্ত ব্যক্তিও এই নৃশংসচূড়ামণি কালের করুণাপাত্র নহে। ইহার উদারতা এরূপ অসীম যে এতৎ সংসারে তাহার কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই। অর্থাৎ সে সকলকেই সমভাবে ভক্ষণ করে[৭]। মুনিবর! অজ্ঞ লোক যাহাকে ভোগস্থান বলিয়া জানে, সে সমস্তই দারুণ দুঃখের আধার এবং তৃণাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোকশ্রেণীও দুঃখের আবাস ভূমি। তাহাদের ঐশ্বর্য্য বিরক্ত দশায় নিতান্ত তুচ্ছ[৮]। জীবন নিতান্ত চঞ্চল, যৌবন অচিরস্থায়ী, বাল্যকাল অজ্ঞানাচ্ছন্ন,[৯] লোক সকল বিষয়ানুসন্ধানে কলঙ্কিত অর্থাৎ মলিনচিত্ত, বন্ধুবান্ধব ভববন্ধনের রজ্জু, ভোগ সকল মূর্ত্তিমান্ মহারোগ, এবং সুখ মৃগতৃষ্ণিকার অনুরূপ[১০]। ইন্দ্রিয়গণই পরম শত্রু। সে সত্যে অসত্য দেখাইতেছে। আত্মার পরম রিপু মন, আত্মা তৎসহবাসে আপনিই আপনাকে ক্লেশ দিতেছেন[১১] অহঙ্কার আত্মকলঙ্কের কারণ, বুদ্ধি নিতান্ত মৃদু, অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠায় অদৃঢ়, ক্রিয়া অর্থাৎ শারীরিক প্রবৃত্তি ক্লেশপ্রসবিনী, লীলা অর্থাৎ মানসী চেষ্টা স্ত্রীপ্রসঙ্গে পর্য্যাপ্ত,[১২] বাসনা বিষয়ের প্রতিই ধাবমানা, আত্মস্ফূর্ত্তি দুর্লভ, স্ত্রী সকল দোষের পতাকা ও

অনুরাগ নীরস (রস=ব্রহ্মানন্দ, তৎপরিশূন্য) হইয়াছে[১৩]। অধিক কি বলিব, বস্তু অবস্তু বলিয়া প্রতীত হইতেছে অহঙ্কারপরায়ণ জীব তাহাতেই অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়াছে, এবং ভাব সকল অভাবে পূর্ণ হইয়াছে[১৪]। মহর্ষে! কাহারও অন্তঃকরণ সুস্থির নহে, সকলেই নিরন্তর দহ্যমান, এবং সকলেরই রাগরূপ রোগ নিতান্ত প্রবল। সুতরাং বৈরাগ্য নিতান্ত দুর্লভ[১৫]। লোকের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান রজোগুণে কলুষিত। তমোগুণ অনবরত বর্দ্ধিত হইতেছে ও সত্ত্বগুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে। কাযেই তত্ত্বজ্ঞান দূরপরাহত[১৬]। জীবন অস্থির অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী, মৃত্যু আগমনোন্মুখ, ধৈর্য্য নাই বলিলেও বলা যায়। অনুরাগ কেবল অসার বিষয় সুখের অনুসরণে নিরন্তর ধাবমান[১৭]। বুদ্ধি মূর্খতাদোষে নিতান্ত মলিনা, শরীর বিনাশের বশীভূত, জরা এই শরীরে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে ও পাপ অনবরত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে[১৮]। যৌবন যত্ন করিলেও থাকে না, সৎসঙ্গ দূরপরাহত, স্বর্গাদি গতি স্বপ্নতুল্য ও সত্যের উদয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না[১৯]। অন্তঃকরণ মোহজালে অত্যন্ত আচ্ছন্ন, সন্তোষ দূরে পলায়ন করিয়াছে, উজ্জ্বল দয়া উদিত হয় না, কেবল নীচতারই (নীচতা=অসূয়াদি) প্রাদুর্ভাব দেখা যায়[২০]। ধীরতা অধীরতায় পরিণত, লোক সকল মাত্র জন্মমৃত্যুস্বর্গনরকপরিভ্রমণকারী, দুর্জ্জনসঙ্গই সর্ব্বত্র সুলভ ও সাধুসঙ্গ নিতান্ত দুর্লভ[২১]। দৃশ্যমাত্রেই জন্ম মৃত্যুর বশীভূত ও বিষয়বাসনা বন্ধনের হেতু। মৃত্যু এই প্রাণিনিকায় (জীব সংঘ) হরণ করিয়া নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা বোধগম্য হয় না[২২]। ঋষে! যাহাতে কালভয় নাই, মৃত্যু ভয় নিবারিত আছে, তাহা এ সংসারে দৃষ্টি গোচর হয় না। যাহা সদুপদেশ, তাহাও এ সংসারে অপদেশতা প্রাপ্ত অর্থাৎ স্থানপ্রাপ্ত হইতেছে না। (দিক্ সকল কালে অদৃশ্য হইবে, দেশ সকল নামান্তর প্রাপ্ত হইবে ও পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইবে)। এ অবস্থায় মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আস্থাবান্ হইতে পারে?[২৩] সন্মাত্র স্বভাব ঈশ্বর এই আকাশকেও ভক্ষণ করিবেন, পৃথিবীর সহিত সমুদায় ভুবন প্রলয় কবলে নিপতিত হইবে, সাগর সকল শুষ্ক হইবে, তারকাস্তবক বিশীর্ণ হইবে, সিদ্ধগণও বিনষ্ট হইবেন, অসুরগণও বিদীর্ণ হইবেন, ধ্রুব অধ্রুব হইবেন, অমরগণও মৃত্যুর বশীভূত হইবেন, কিছুই থাকিবে না। সমস্তই ফেণতুল্য। ঋষিবর! মাদৃশ ব্যক্তি কি রূপে এই ফেণতুল্য সংসারে আস্থাবান্ হইতে পারে?[২৪।২৫] দেবরাজ ইন্দ্র কালবদনে চর্ব্বিত হন, যমও নিমন্ত্রিত হন,

বায়ু অবায়ু হন, সোম ব্যোম হন, মার্ত্তণ্ডও খণ্ডিত হন, ভগবান্ অগ্নিও চিরকালের নিমিত্ত নির্ব্বাপিত হন। কাহারও স্থায়িত্ব দেখিনা। এ দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া কোন্ জ্ঞানী এই সারশূন্য সংসারে আস্থা স্থাপন করিতে পারে?[২৭।২৮] ব্রহ্মাও থাকিবেন না, হরিও সংহার দশা প্রাপ্ত হইবেন, সর্ব্বহর হরও অভাব প্রাপ্ত হইবেন। ইহা মনে হইলে কি প্রকারে মাদৃশ ব্যক্তি সংসারে আশ্বাস পাইতে পারে?[২৯] যেহেতু কালের কাল, নিয়তির বিলয় ও শূন্যের (ভূতাত্মক বাহ্যাকাশের) বিনাশ সুস্থির; সেই হেতু এই মিথ্যা সংসারের প্রতি মাদৃশ ব্যক্তির আস্থা স্থাপন নিতান্ত অসম্ভব[৩০]।

ব্রহ্মন্! শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিষয়, বাগিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অজ্ঞাতমূর্ত্তি, এমন এক তত্ত্ব আপনিই আপনাতে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বভুবন দেখাইতেছেন। যাহা তত্ত্ব, যাহা স্বরূপ, তাহা প্রচ্ছন্ন। তাহাতেই এই ভুবনরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে[৩১]। পরমাত্মার মূর্ত্তি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, বাক্যের ও চক্ষুর অধিগম্যও নহে। আমরা তাঁহাকে না জানিতে পারিয়াই পদে পদে ভ্রান্ত হইতেছি। সেই অচিন্ত্যরূপ পরমপুরুষ মায়াযোগে আত্মপ্রতিবিম্বে বিরাজমান থাকিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী। ত্রিলোক মধ্যে এমন কিছুই নাই—যাহা তাঁহার বাধ্য বা নিয়ম্য নহে। তিনিই অহঙ্কারাবিষ্ট ও অভিমানধারী হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান[৩২]। যদ্রূপ প্রস্তরখণ্ড প্রস্রবণবেগে অবশ হইয়া পর্ব্বত হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ, রথ ও অশ্ব সহিত দিবাকর সেই তত্ত্ব (পরমাত্মা) কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শিলা, শৈল, বপ্র, প্রভৃতি প্রদেশ আলোকিত করতঃ বিচরণ করিতেছেন[৩৩]। যেমন পক্ক আক্ষোট ফল (আখ্‌রোট) ত্বকবেষ্টিত, তেমনি, তাহারই প্রভাবে এই সুরাসুরগণের আশ্রয় ভূগোল বিষ্ণ্যচক্রে (জ্যোতিশ্চক্রে) বেষ্টিত[৩৪]। * স্বর্গে দেবগণ, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ, পাতালে ভুজঙ্গমগণ, তাঁহারই সঙ্কল্পমাত্রে সমুৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাপ্রভাবে বিনষ্ট হইবেন[৩৫]। দুরাচার কন্দর্প তাঁহারই প্রভাবে লব্ধপরাক্রম হইয়া নিতান্ত বিশদৃশরূপে লোক সকলকে আক্রমণ পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে[৩৬]। যেমন মত্তমাতঙ্গগণ মদবর্ষণ করতঃ সমন্তাৎ

---

* ভূ=পৃথিবী। গোল=বর্ত্তুল। পৃথিবী কদম্বফুলের মত গোল। ধিষ্ণ্যচক্র=খ গোলস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ প্রভৃতির সংস্থান। ধিষ্ণ্যচক্রের অন্য নাম জ্যোতিশ্চক্র। চক্রতুল্য ভ্রমণ করে বলিয়া চক্র। জ্যোতিশ্চক্র পৃথিবী বেষ্টন করিতেছে।

সুরভিত করে, তেমনি, ঋতুরাজ বসন্তও তাঁহার মহিমায় বিকসিত কুসুমের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া লোকের অন্তঃকরণ বিচলিত করিয়া থাকেন[৩৭]। কামিনীরা যে অনুরাগ ভরে চঞ্চলনয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, যে কটাক্ষে দৃঢ় হৃদয় ভেদ ও অতিবিবেকীর চিত্ত ধৈর্য্যচ্যুত হয়, সে কটাক্ষেও তাঁহার (পরমাত্মার) প্রভাব অনুস্যূত আছে[৩৮]।

মহর্ষে! যাহারা পরোপকারকারিণী ও পরসন্তাপতাপিতা স্নিগ্ধা বুদ্ধির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, আমি বিবেচনা করি, তাহারাই সুখী[৩৯]। এই সংসাররূপ সাগরে কালরূপ বাড়বানল নিরন্তর প্রজ্বলিত। ইহার কল্লোলপরম্পরা প্রতিনিয়ত সমুত্থিত ও বিলীন হইতেছে[৪০]। মৃগ যেমন অরণ্যমধ্যে লতাজালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ, মানবগণও মোহবশতঃ জীবনরূপ অরণ্যে দুরাশাপাশে বদ্ধ হইয়া ক্লেশরাশি ভোগ করতঃ অবসন্ন হইতেছে[৪১]। হে ব্রহ্মন্! লোক সকল পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিয়া স্ব স্ব আয়ু বৃথা নষ্ট করিতেছে। তাহারা যে ফলকামনায় ঐরূপ জুগুপ্সিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সে সকল আকাশজাত বৃক্ষের লতার ফলের সদৃশ। সে সকল যে কিরূপ সত্য তাহা বিখ্যাত বিচারবিৎ পণ্ডিতগণও বিশেষরূপে অবগত নহেন[৪২]। ঋষিপ্রবর! লোক সকল আজ্ উৎসব, আজ্ এই সুখ, আজ্ এই ভোগ, এই আমার বন্ধু, ইত্যাদি মিথ্যা ভাবে ভাবিত হইয়া এবং সুখময়ী কল্পনায় মোহিত হইয়া দিবারাত্র বিগলিত হইতেছে[৪৩]।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে তাত! আরও বলি, শ্রবণ করুন। জগতের স্বরূপ আপাত-রমণীয় সত্য; পরন্তু ইহা অতীব অরমণীয়। অত্রস্থ সমুদায় বস্তুই পরিণাম-বিরস। ইহাতে অবস্থান করিলে এমন কোন পদার্থ পাওয়া যায় না যাহা পাইলে চিত্ত বিশ্রান্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়[১]। ভাবিয়া দেখুন, বাল্যকাল কেবল নানাপ্রকার কল্পিত ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাহিত হয় এবং অন্তঃকরণ তথন নিতান্ত চঞ্চল থাকে। পরে যৌবন, তাহাও দোষদুষ্ট। যৌবনকালে মনোরূপ হরিণ কেবল নারীরূপ গিরিগুহার অন্বেষণে কালহরণ করে; সুতরাং সে কালেও শান্তির অভাব। অনন্তর বার্দ্ধক্য আগত হইলে শরীর জীর্ণ হয়, সুতরাং তথন ক্লেশ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয না। হে ঋষিপ্রবর! লোক সকল কথিত প্রকার অবস্থায় নিপতিত থাকিয়া কেবল দগ্ধই হইতেছে, শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছে না[২]। জরারূপ তুষার-সম্পাতে শরীররূপ সরোজিনী বিগলিত হইলে, প্রাণরূপ মধুকর তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরিত হয়, তখন এই সংসাররূপ সরোবর শুষ্ক হইয়া যায়[৩]। লতা যেমন যেমন পুষ্পভরে অবনত ও পরিপাক প্রাপ্ত হইতে থাকে তেমনি তেমনি দর্শকের মনঃপ্রীতি হইতে থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এই দেহবল্লীও জরার আবির্ভাবে যেমন যেমন পাক প্রাপ্ত হইতে থাকে, তেমনি তেমনি কৃতান্ত তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইতে থাকে। (জরাজীর্ণ দেহ দেখিলে কৃতান্তের আনন্দ হয়)[৪]। দেখা যায়, তৃষ্ণা ইহলোকে কেবল বৃথা তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলপ্রবাহে অখিল ও অনন্ত পদার্থ কবলিত ও সন্তোষ-তরুর মূল উৎখাতিত করিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে[৫]। আর এই চর্ম্মনিবদ্ধা দেহ-তরণী ভবসাগরোপরি প্রতিমুহূর্ত্তেই লোলিত, ভ্রমিগ্রস্ত ও আলোড়িত হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ মকর আক্রম করিলে ইহা আর ক্ষণকালও থাকিবেক না, নীচে নিমগ্ন হইবে[৬]। ঋষে! কাম প্রকাণ্ড মহীরুহের সদৃশ। তাহা তৃষ্ণা-লতায় সমাচ্ছন্ন। তাহার শাখা ও প্রশাখা অসংখ্য। মনোরূপ শাখামৃগ ফল-কামনায় তাহাতে নিরন্তর পর্য্যটন করিতেছে অথচ অভিলষিত সাধনে সমর্থ হইতেছে না[৭]। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, সম্প্রতি বিপদে বিষণ্ণ,

মোহে অভিভূত, স্বার্থলাভে গর্ব্বিত ও সুন্দরীগণের কটাক্ষে বিচলিত হন না, এরূপ নর নিতান্ত দুর্লভ[৮]। যাঁহারা মাতঙ্গতরঙ্গসঙ্কুল দুস্তর সংগ্রাম-সাগর অনায়াসে অতিক্রম করেন তাঁহারা আমার নিকট শূর বলিয়া পরিগণিত নহেন কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়রূপ জলনিধির মনোবৃত্তিরূপ তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়াছেন আমার মতে তাঁহারাই যথার্থ বা উৎকৃষ্ট শূর[৯]। লোক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছে সত্য; পরন্তু যাহা পরিণামে সুখ ফল প্রসব করে, যাহাতে সংসারক্লেশের অবসান হয়, যাহা আশ্রয় করিলে বিশ্রামসুখ অর্থাৎ পরমা শান্তি লাভ করা যায়, যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তবৃত্তি দুরাশাপিশাচী কর্ত্তৃক অভিহত হয় না, এরূপ ক্রিয়া কাহার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না[১০]। যাঁহার ধৈর্য্য নিতান্ত দুশ্ছেদ্য, কীর্ত্তি ত্রিভুবনসঞ্চারিণী, বিক্রম সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী, সম্পত্তি অর্থিগণের গৃহপরিপূরণে নিয়োজিত ও লক্ষ্মী বিনয়াদিগুণপরম্পরায় শোভমানা এরূপ মহাপুরুষ দুর্লভ[১১]। ঋষে! সংসারের সর্ব্বত্রই বিপদজাল বিস্তৃত আছে। পর্ব্বতের অভেদ্য প্রস্তরময় ভিত্তির অভ্যন্তরে বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেও বিপদ তন্মধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায়, বিপদের ন্যায় সম্পদও অণিমাদি সিদ্ধির সহিত ভাগ্যবন্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে[১২]। হে তাত! ভ্রান্তি বশতঃ পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি যে সকল বস্তু সুখসাধন বলিয়া পরিগৃহীত হয়, চরম সময়ে তদ্দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হয় না; প্রত্যুত বিষমূর্চ্ছনার ন্যায় যার পর নাই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে[১৩]। বয়সের ও শরীরের অবসান সময়ে বিষাদময়ী বিষমাবস্থা আগমন করে। অনন্তর সেই জরাকবলিত মনুষ্য তখন আপনার ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য অতীত কর্ম্মপরম্পরা স্মরণ করতঃ দুর্ব্বিষহ অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে থাকে[১৪]। মনুষ্য আগে ধনার্জ্জনের ও ভোগতৃষ্ণার প্রাবল্যে মোক্ষ-পথ পরিহার পূর্ব্বক কেবল কাম ও অর্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করণ দ্বারা সময় অতিবাহিত করে; কিন্তু যখন চরম সময় আইসে তখন তদীয় অন্তঃকরণ বাতকম্পিত ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইতে থাকে, তখন সে কোনও প্রকারে শান্তি লাভে সমর্থ হয় না[১৫]। পরমার্থচিন্তা বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গাদি ফল কামনায় কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। ভাবিয়া দেখুন, স্বর্গ সুখই বলুন, আর পার্থিব সুখই বলুন, সমস্তই স্বকৃত কর্ম্মের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কিন্তু ক্রিয়াফল মাত্রেই জললহরীর ন্যায় ভঙ্গুর। সুতরাং তাহা পাওয়া না পাওয়া সমান; অথবা তাহা দৈবাৎ

প্রাপ্য। লোক সকল ভিন্নরুচি ও তাহারা দৈবাৎ প্রাপ্য বৃথা সেই সেই কর্ম্ম-ফলে বিড়ম্বিত হইতেছে[১৬]। * মানুষ আজ এই করিব, কাল অমুক করিব, অনবরত সেই সেই চিন্তায় রত আছে। কিন্তু এ সমস্তই শেষে বৈরস্য প্রাপ্ত হয়। কথিত প্রকার পরিণামবিরস চিন্তায় নিবিষ্ট ও দিবানিশি পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের সন্তোষসম্পাদনে রত থাকিয়া কালযাপন করিতে করিতে জরার কবলে নিপতিত হইয়া বিবেকবিহীন হইয়া পড়ে[১৭]। যেমন বৃক্ষের পত্র পুনঃ পুনঃ সমুৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই সকল বিবেকবিধুর লোক কতিপয় দিনের মধ্যে বার বার জন্মগ্রহণ করে ও বার বার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়[১৮]। ব্রহ্মন্! আমি জিজ্ঞাসা করি, মূঢ় ব্যক্তি ব্যতীত কোন্ জ্ঞানী, বিবেকী লোকের অনুসরণ ও সৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃথা ইতস্ততঃ পর্য্যটনে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাসময়ে গৃহে প্রবিষ্ট হয়? হইয়া সুখময়ী সুপ্তি লাভ করিতে পারে?[১৯] মনে করুন, যেন সমুদায় শত্রু বিদ্রাবিত হইয়াছে, লক্ষ্মীও অভিমুখী হইয়াছেন, সুখভোগও আরব্ধ হইয়াছে; কিন্তু হইলে কি হইবে, মনুষ্য যেমন কষ্ট কল্পনার পর সুখভোগে প্রবৃত্ত হয়, অমনি মৃত্যু অলক্ষিতরূপে আগমন করিয়া তাহাকে কবলিত করে[২০]। জানিনা, কিজন্য যে লোক সকল কি এক অদ্ভুত অনির্দ্দেশ্য কারণে পরিবর্দ্ধিত, নিতান্ত অসার, তুচ্ছ ও ক্ষণধ্বংসী সাংসারিক ভাবে নিরন্তর বিমোহিত ও ঘূর্ণমান হইতেছে তাহা বোধগম্য করা নিতান্ত কঠিন। ঐ সকল লোক মৃত্যুকে দেখিতে পায় না এবং আপনার আগমন ও গমন দুএর কিছুই জ্ঞাত নহে[২১]। যদ্রূপ যজমান যজ্ঞকার্য্যসাধনার্থ যূপনিবদ্ধ মেষ দিগকে সংহার করে, সেইরূপ, লোক সকল বিষয়ভোগে ও দেহপোষণাদির দ্বারা যাহার পুষ্টি সাধন করে এবং যাহার নিমিত্ত কুৎসিত কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়, সেই প্রিয়তম প্রাণও তাহাদিগকে কালমুখে নিপাতিত করিয়া শরীরাবসানে অন্তর্হিত হয়[২২]। † মহর্ষে! তরঙ্গমালার ন্যায় ভঙ্গুর এই লোকপ্রবাহ যে কোথা

* কর্ম্মফল স্বর্গাদি ক্ষণিক। সেই হেতু তাহা পাওয়া না পাওয়া তুল্য। তাহা বিড়ম্বনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্নায়ু পুত্র লাভ ও মৎস্যের বড়িশবিদ্ধ আমিষ লাভ যদ্রূপ, কাম্য ফললাভও তদ্রূপ। অথবা ভিন্নরুচি অর্থাৎ বিবিধ বিষয় লাভ তদ্রূপ। ইহা শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভব, ত্রিবিধ প্রমাণে প্রমিত হয়।

† অন্য প্রকার অর্থও হয়। যথা—যাহারা কেবল মাত্র বিষয়সেবা ও দেহপোষণে তৎপর হইয়া বৃথা পীবর অবস্থায় অবস্থান করে, এক দিনের জন্যও বিবেকবৈরাগ্যাদি

হইতে নিরন্তর আগমন করিতেছে ও কোন স্থলেই বা নিরন্তর গমন করিতেছে তাঁহা কেহই বিদিত নহে[২৩]। যদ্রূপ চঞ্চলষট্‌পদসেবিত লোহিতপর্ণা বিষলতা অগ্রে মনোহারিণী, পরে প্রাণনাশিনী হয়, সেইরূপ, তরলায়তলোচনা বিম্বোষ্ঠী রমণীরাও অগ্রে সৌন্দর্য্যচাতুর্য্যে মনোহরণ ও তৎপরে প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে[২৪]। যেমন যাত্রায় বা মহোৎসবে লোক সকল নানা স্থান হইতে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত ও অভিপ্রায় অনুসারে একত্র সমবেত হয়, তেমনি, জীবগণও পরস্পর পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদি সহ একত্র মিশ্রিত হইয়া থাকে। এ ভাব বা এ সংযোগ মায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৫]। প্রদীপ যেমন রাত্রিকালে রাশি রাশি তৈল ও ভূরি ভূরি বর্ত্তি গ্রাস করিয়া অবশেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার অস্তিত্বপ্রতীতি হয় না, এই দশা(অবস্থা)-শতসমন্বিত ও স্নেহপরিপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী সংসারও সেইরূপ। অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রতীত হয় না[২৬]। এই সংসার কুলালচক্রের সদৃশ। কুলালচক্র যদ্রূপ অস্থির, ইহাও তদ্রূপ অস্থির। সংসার ও কুলালচক্র বর্ষাকালসমুদ্ভূত জলবিম্বের ন্যায় ভঙ্গুরস্বভাব ও ভ্রমিশীল। পরন্তু উক্ত উভয়ই বিদ্যুতের ন্যায় অস্থায়ী হইলেও অসাবধানবুদ্ধি পুরুষের স্থায়িত্ব ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। (কুলালচক্র যখন অত্যন্ত বেগে ঘুরে, তখন বোধ হয়, তাহা ঘুরিতেছে না, স্থির হইয়াই আছে)[২৭]। যেমন শিশির কাল আগত হইলে সুশোভন সরোরুহের সমুজ্জ্বল শোভা ও সৌগন্ধ্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, জরার আবির্ভাবেও মনুষ্যের সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে[২৮]। আপনি দেখুন, ইহ সংসারে পাদপগণ দৈব (ভূমি, জল ও অনল প্রভৃতি) হইতেই জন্ম, বৃদ্ধি, পত্র, পুষ্প, ফল ও ছায়া প্রভৃতি লাভ করে, করিয়া পুনঃ পুনঃ লোকের উপকার সাধন করে ; কিন্তু দুরাচার লোক কঠোর কুঠারের আঘাতে অনায়াসেই তাহাদিগকে ছেদন করিয়া থাকে। এরূপ দুর্ব্বৃত্ত সংসারে আশ্বাস লাভের সম্ভাবনা কি ? (মৃত্যু উপকারী অপকারী গণনা করেন না, সকলকেই

অভ্যাস করে না, তাহারা নর-মেষ। এই সকল নর-মেষ নিতান্ত কুৎসিত কর্ম্মযূপে বাঁধা থাকে এবং প্রাণরূপ যজমান—যে যজমান তাহাদিগকে পীবর করিয়াছিল সেই যজমান—প্রথমতঃ তাহাদের মুখ দোষ-কজ্জলে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া সংস্কার সাধন করে, অনন্তর রোগরূপ পুরোহিত আনিয়া তাহাদিগের সংজ্ঞপন ও বিশসন কার্য্য (বধ ও খণ্ড খণ্ড করা) সমাধা করিয়া থাকে। তখন তাহারা অভাবগ্রস্ত হয় এবং যে সুখের আশায় ছিল, বা সেই সকল কার্য্য করিয়াছিল, সে সুখে বঞ্চিত হয়।

হনন করিয়া থাকেন)[২৯]। স্বজনসংসর্গ বিষবৃক্ষের অনুরূপ। বিষবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর, স্বজনসংসর্গও আপাত রমণীয়। বিষবৃক্ষ সংসর্গী নরের দাহ ও কাশ্মল্যাদি (মূর্চ্ছা প্রভৃতি) জন্মায়, স্বজনসংসর্গও সংসর্গীর দাহমোহাদি উৎপাদন করে। বিষবৃক্ষ অন্তর্ব্বিঘাতের অর্থাৎ জীবন বিনাশের কারণ, স্বজনগণও অন্তস্তত্ব (আত্মজ্ঞান) বিঘাতের হেতু। মহর্ষে! এতাদৃশ দোষাস্পদ স্বজনসংসর্গে অবস্থান করিলে যে পদে পদে মোহাভিভব সঙ্ঘটিত হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই[৩০]। সংসারে এরূপ দৃষ্টি কি আছে—যাহাতে দোষসম্পর্ক নাই? এরূপ বিষয় কি আছে—যাহাতে দুঃখদাহ উপস্থিত হয় না? এমন প্রজা (উৎপন্ন বস্তু) কি আছে—যাহার বিনাশ নাই? এমন ক্রিয়াই বা কি আছে—যাহা মায়াসম্পৃক্ত নহে?[৩১] হে মহর্ষে! যে ব্যক্তি কল্লান্তজীবী সে বহুকল্পজীবীর নিকট অল্পায়ুঃ। আবার বহুকল্পজীবী তদপেক্ষা বহুকল্পজীবী ব্রহ্মার নিকট অল্পজীবী। অতএব, অবয়বশালী কালসমূহের অল্পত্ব বহুত্ব অসত্য বৈ সত্য নহে। অর্থাৎ কালের অল্পত্ব ও বহুত্ব ঔপাধিক ও কাল্পনিক; সুতরাং মিথ্যা[৩২]। যেমন পর্ব্বত সকল সর্ব্বত্রই পাষাণময়, পাদপ সকল দারুময়, পৃথিবী মৃত্তিকাময়, তেমনি, মানবগণ সর্ব্বত্রই মাংসাদিময়। সুতরাং সে সকল জড়বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পুরুষপরম্পরাপ্রচলিত ব্যবহার অনুসারে বস্তু সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকৃতি প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে মাত্র; বস্তু কল্পে সমস্তই অসত্য[৩৩]। পর্ব্বত বলুন, আর পাদপ বলুন, সমস্তই মহাভূতের বিকার। দুঃখের বিষয় এই যে, অবিবেকী নর মোহ বশতঃ ভূতবিকারে সত্য জগৎ দর্শন করিতেছে। যাঁহারা বিবেকী অর্থাৎ জ্ঞানবান্ তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে পঞ্চভূতের সমবায় ব্যতীত কোন বাস্তব পদার্থ মনে করেন না[৩৪]। * হে সাধো! মানুষ যখন স্বপ্নে অলীক বিষয় সম্ভোগ করিয়াও বিস্মিত হয়, তখন, এই মিথ্যাবিজৃম্ভিত জগতে সাধুদিগের বিস্ময়াবেশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[৩৫]। পূর্ব্ব বয়স হইতে এ পর্য্যন্ত যে আকাশলতার ফলতুল্য

---

* মূল শ্লোকটীতে অম্বুবিৎ, প্রভৃতি কএকটী শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতাত্মকতা বুঝান আছে। আমরা তাহার ভাবার্থের অনুবাদ দিলাম। যদি কেহ শব্দার্থ বুঝিতে চাহেন, তাহা হইলে টীকা দেখিবেন। যথা—পরস্পরং অম্বুবিধ্যত ইতি অম্বুবিৎ। অর্থাৎ পঞ্চভূতই পরস্পর মিলিত হইয়া পর্ব্বতাদি আকারে প্রতিভাত হইতেছে। পয়ঃ অর্থাৎ জলভূত। তদম্বুবদ্ধভূত অগ্নি অর্থাৎ তেজোভূত। অন্তময় অর্থাৎ বায়ুভূত। নভঃ অর্থাৎ আকাশ। স্থা অর্থাৎ পৃথিবী পদার্থলক্ষ্মী চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধি—অবিবেকীর বুদ্ধি।

মিথ্যা ভোগের প্রতি লোকের অত্যাসক্তি জন্মিয়াছে, আমার বিশ্বাস—তাহাতেই আত্মতত্ত্বের কথা উদিত হইতেছে না[৩৬]। যেমন ছাগাদি পশু ফলভক্ষণবাসনায় অশঙ্কিত হৃদয়ে ধাবমান হইয়া উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে ধরাতলে নিপতিত হয়, তেমনি, জড়বুদ্ধি লোকেরাও অবিচারিতচিত্তে উচ্চ পদের অভিলাষী হইয়া যার পর নাই অভিভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৭]। দুর্গমগহ্বরস্থ বৃক্ষাদি ও অদ্যতনীন লোক প্রায় তুল্যানুতুল্য। দুর্গম গিরিগহ্বরস্থ বৃক্ষের অথবা লতার ফল, পুষ্প, পত্র, ছায়া, কিছুই লোকের উপকারে আইসে না। সুতরাং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই ব্যর্থ। সেইরূপ সংসারী লোকও বৃথা শরীর পীবর করে, এবং তদর্থে বিদ্যা, বিনয়, ধন, সম্পদ, সমস্তই বিনাশ করিয়া থাকে[৩৮]। যেরূপ কৃষ্ণসার মৃগ গহন কাননে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সেইরূপ, মানবগণও কথন দয়াদাক্ষিণ্যাদিভূষিত সজ্জনসমাজে এবং কথন বা ক্রোধলোভাদিপরিপূর্ণ ও পাপাসক্ত দুরাচারগণের সন্নিধানে বিহরণ করিয়া থাকে[৩৯]। মহর্ষে! দুরাচার বিধাতা এই সংসারে প্রতিদিন যে সকল নূতন নূতন আপাতমনোহর ও পরিণামদুঃখ ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত করেন, তদ্দর্শনে কোন্ বিবেকসম্পন্ন পুরুষের অন্তঃকরণ বিস্ময়াবিষ্ট না হয়?[৪০] হায়! ব্যক্তিমাত্রেই কামনা, চাতুর্য্য ও প্রতারণা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বশীভূত, ক্রিয়ামাত্রেই নিষ্ফল ও ক্লেশদায়িনী, সাধুসংবাস স্বপ্নেও সুলভ নহে; না জানি, এই ভয়াবহ সংসারে আমার জীবিতসময় কিরূপে অতিবাহিত হইবে![৪১]

সপ্তবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্য জগৎ স্বপ্ন-সন্দর্শনের ন্যায় (ক্ষণিক বা ভ্রম প্রতীতির ন্যায়) অলিক বা অস্থির[১]। আজ্ যেখানে শুষ্কসাগরসংকাশ গভীর খাত দেখা যায়, কাল হয় ত সেই স্থানে মেঘমালা মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইবে[২]। আজ্ যেখানে অভ্র-ভেদী উচ্চবৃক্ষের নিবিড় বন, কাল হয় ত সেই স্থানে সমতল পৃথিবী অথবা গভীর কূপ বিদ্যমান দেখিতে পাইবেন[৩]। আজ্ যে শরীর কৌশেয় বস্ত্রে, মাল্যে ও বিলেপনে ভূষিত; কাল হয় ত দেখিবেন, সেই দেহ বিবস্ত্র অবস্থায় দূরবর্ত্তী গর্ত্তে নিপতিত থাকিয়া পচিতেছে[৪]। এই দেখি, যে নগর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারসম্পন্ন মানবগণে পরিপূর্ণ; কতিপয় দিবস পরেই দেখি, সেই নগর জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে[৫]। আজ্ এই যে তেজস্বী পুরুষ নৃপতিপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন, ইনিই কিছুদিন পরে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবেন[৬]। বিস্তীর্ণতায় ও নীলিমায় আকাশের সহিত তুলিত হইতে পারে এরূপ ভীষণ অরণ্যানীও পতাকা-পরিশোভিত নগরী হইতে পারে[৭]। আজ্ যে ঐ লতাচ্ছন্ন ভীষণদর্শন অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, ঐ অরণ্য এক দিবসেই নির্জ্জীব ও নিষ্পাদপ মরুভূমি হইতে পারে[৮]। অধিক কি বলিব, জল স্থল হইতেছে, স্থল জল হই-তেছে ও সমুদ্রও মরু হইতেছে। অধিক কি বলিব, জল, কাষ্ঠ ও তৃণা-দির সহিত সমুদায় জগৎ বার বার বিপরীত ভাব ধারণ করে ও করি-তেছে[৯]। ঋষে! কি বাল্য, কি যৌবন, কি শরীর, কি দ্রব্য, সমুদায় বস্তু অনিত্য ও তরঙ্গের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল[১০]। এ জগতের জীবন বাতায়নসন্নিহিত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল এবং লোকত্রয়বিরাজিত পদার্থশ্রী (বস্তুর শোভা) ক্ষণপ্রভার (বিদ্যুতের) প্রভার ন্যায় ক্ষণিক অর্থাৎ অচির-স্থায়ী[১১]। যেমন কুশূলপূর্ণ (কুশূল=ধান্যাধার, ধানের গোলা) ধান্যরাশি পুনঃ পুনঃ ব্যয় নিবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা ক্ষেত্রে বপন করিলে বিপরীত অবস্থা (অঙ্কুর) ধারণ করে; তেমনি, এই বহুভূত-পরম্পরাও (প্রাণী অপ্রাণীও) ক্রমানুযায়ী ক্ষয় ও বিপরিত পরিণাম

প্রাপ্ত হইতেছে[১২]। বলিতে কি, এই আড়ম্বরাতিশয়শালিনী সংসার-রচনা কৌশলাতিশয়শালিনী নর্ত্তকীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ইহাঁ নর্ত্তনাবিষ্টা নর্ত্তকীর ন্যায় অতি কৌশলে অঙ্গবেশাদি পরিবর্ত্তন দ্বারা পদে পদে ভ্রম জন্মাইতেছে। মনোরূপ পবন যে জীবরূপ ধূলি উদ্ধূত করিতেছে, তাহাই সংসাররচনা নর্ত্তকীর বস্ত্র এবং প্রাণিগণ যে একবার স্বর্গে অন্যবার নরকে ও আরবার মধ্য লোকে উৎপতি ও আপতিত হইতেছে, তাহাই তাহার অভিনয়[১৩।১৪]। লোকপ্রসিদ্ধ ক্ষণভঙ্গুর ব্যবহারপরম্পরা তাহার মনোহর চঞ্চল কটাক্ষ। এ নর্ত্তকী অদ্ভুত গন্ধর্ব্ব-নগরতুল্যভ্রমবিধায়িনী। যদ্রূপ ঐন্দ্রজালিক-বনিতা তন্ত্র মন্ত্রবিশেষ বিস্তার করিয়া লোকের নেত্ররশ্মি প্রচ্ছাদন ও অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই সংসাররচনানর্ত্তকী সেইরূপ ভ্রান্তি অর্থাৎ বস্তুতে অবস্তু ও অবস্তুতে বস্তু দর্শন করাইতেছে। ইহার দৃষ্টি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও চঞ্চল। সুতরাং তাহা নৃত্যাসক্তা সংসাররচনা নর্ত্তকীর অনুরূপা[১৫।১৬]। ঋষে! আপনি ভাবিয়া দেখুন,—সেই দিবস, সেই সম্পদ, সেই ক্রিয়া, সেই মহাপুরুষগণ, সকলেই নয়নপথবহির্ভূত ও স্মর্ত্তব্যশেষ হইয়াছেন এবং আমরাও ক্ষণকাল পরে তাঁহাদেরই অনুরূপ রূপ হইব[১৭]। সংসার প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও প্রতিদিনই উৎপন্ন হইতেছে। কত কাল অতীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই অথচ আজ্ পর্য্যন্ত পোড়া সংসারের অন্ত অর্থাৎ শেষ হইল না[১৮]। মনুষ্য পশু ও পশু মনুষ্য হইয়া জন্মিতেছে। দেব অদেব ও অদেব দেব রূপে উৎপন্ন হইতেছে। প্রভো! সংসারে স্থির বস্তু কি![১৯] কালরূপী সহস্রকিরণ (সূর্য্য) পুনঃ পুনঃ ভূতরূপ কিরণ জাল সৃষ্টি করতঃ পুনঃ পুনঃ দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত করিয়া জীবগণের সংহার বিধান করিতেছেন[২০]। অন্যের কথা কি বলিব,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টৃগণও স্ব স্ব সৃষ্ট বস্তুর সহিত বাড়বানলকবলিত সলিলরাশির ন্যায় নিয়তই বিনষ্ট হইয়া থাকেন[২১]। কি আকাশ, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ, কি বায়ু, কি পর্ব্বত, কি নদী, কি দিক্, সমুদায় বস্তুই সংহাররূপ বাড়বানলের পরিশুষ্ক ইন্ধন (কাষ্ঠ)[২২]। মৃত্যুভীত নরের নিকট ভৃত্য, মিত্র, বান্ধব, বিত্ত, সমস্তই নীরস[২৩]। ভগবন্! যতক্ষণ না মৃত্যুরূপ কুরাক্ষস স্মৃতিপথাগত হয় ততক্ষণ এই জগতের ভাব (বিষয়) সকল রুচিকর অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ হইতে থাকে[২৪]। লোক সকল ক্ষণমধ্যে

ধনশালী হয়, আবার ক্ষণমধ্যে দরিদ্র হয়। সেইরূপ, ক্ষণমধ্যে নীরোগী হয়, আবার ক্ষণমধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে[২৫]। হে ব্রহ্মন্! এই দগ্ধ সংসার সর্ব্বথা ভ্রমময় ও প্রতিক্ষণেই নানাপ্রকার বিপর্য্যাস সংঘটিত করিতেছে। অথচ ইহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিমোহিত হইতেছেন[২৬]। আর এক আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখুন। এই আকাশ কখন নিবিড়নীলমেঘ-মালায় আচ্ছন্ন হইতেছে, কখন বা সুবর্ণদ্রবসন্নিভ সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছে, কখন নীরদপটলরূপ নীলোৎপলমালায় পরিবৃত হই-তেছে, কখন বা গভীরঘনগর্জ্জনে পরিপূর্ণ হইতেছে, কখন বা তারকা-স্তবকে রঞ্জিত, কখন বা সূর্য্যকিরণে বিদ্যোতিত, কখন বা চন্দ্রিকাভূষণে বিভূষিত হইতেছে। এ ঘটনা কি আকাশের স্বরূপে সন্নিবিষ্ট? তাহা নহে। বর্ণাদিবিহীন আকাশ এই মাত্র ঐরূপ ঐরূপ আকার ধারণ করিল; পরক্ষণেই আবার সে সকল রহিত হইয়া গেল। আকাশ সেই সেই আকারে দর্শকের সন্তোষ অসন্তোষ উভয়ই উৎপাদন করে এবং উভয়বহির্ভূতও করে। এই দৃষ্টান্ত সংসারে আনয়ন করুন, দেখিবেন, সংসার ঘোর মায়াময় অর্থাৎ ভ্রান্তিময়। সংসারের স্বরূপ আকাশেরই অনুরূপ। মহর্ষে! পরিদৃশ্যমান বিশ্ব কেবল আগমের ও অপায়ের (উৎপত্তির ও বিনাশের) বশীভূত সুতরাং আকাশস্বভাবের অনতিরিক্ত। ঋষিবর! ধীর হইলেও কোন্ পুরুষ সংসারের উক্তপ্রকার ক্ষণভঙ্গুরতায় ভয়ব্যাকুল না হয়?[২৭।৩০]

মুনিবর! আপদ ক্ষণকালের মধ্যেই হয় এবং সম্পদও ক্ষণকালের মধ্যে হয়। কেবল বিপদ সম্পদ নহে, জন্ম ও মৃত্যু এ উভয়ও ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে। অধিক কি বলিব, সংসারের সমস্তই ক্ষণিক[৩১]। ভগবন্! সংসারের প্রত্যেক পদার্থ পূর্ব্বে একরূপ থাকে, পরে (জন্ম-কালে) আর এক রূপ হয়। কতিপয় দিবস পরে আবার অন্যপ্রকার হয়। মনুষ্যও জন্মের পূর্ব্বে একরূপ থাকে, জন্মকালে অন্যরূপ হয়, আবার কতিপয় দিবস পরে অন্যবিধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ সংসারে সদা একরূপ ও সুস্থির, এরূপ কিছুই বা কোনও বস্তু নাই[৩২]। ঘট বস্ত্র হইতেছে এবং বস্ত্রও ঘট হইতেছে। * সংসারে এমন

* ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কার্পাস ক্ষেত্রে পতিত হইতেছে, ক্রমে মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা

কোন পদার্থ দৃষ্ট হয় না—যাহা বৈপরীত্য প্রাপ্ত না হয়[৩৩]। যদ্রূপ দিবা ও রাত্রি, উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধি হ্রাস ও বিনাশ পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইতেছে এবং সে সকল পুনঃ পুনঃ ক্রমপরিবর্ত্তিত হইতেছে; সেইরূপ, মনুষ্যও জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, বিনাশ ও পুনর্জ্জন্ম পাইতেছে ও সে সকল পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরাগমন করিতেছে[৩৪]। আরও দেখা যায় যে, বলবান্ দুর্ব্বল হস্তে বিনষ্ট হইতেছে, এক ব্যক্তিও শত শত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতেছে এবং সামান্য ব্যক্তিও উচ্চপদে অধিরূঢ় হইতেছে। অধিক কি বলিব, সমুদায় জগৎ পরিবর্ত্তন-শীল[৩৫]। সত্য সত্যই প্রাণিগণ নিরন্তর প্রাণাদির পরিস্পন্দে বায়ুপরি-স্পন্দিত জলতরঙ্গের ন্যায় আন্দোলিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে[৩৬]। অল্প দিনেই বাল্যের পরিবর্ত্তন হয়, আবার সেইরূপ অল্প দিনে যৌবনের বিনিময়ে জরা আগমন করে। হে মুনিবর! যখন এই শরীর এক-ভাবে থাকে না, তখন আর বাহ্য বিষয়ে কিরূপে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে[৩৭]। অন্তঃকরণ কখন আনন্দিত, কখন বিষণ্ণ, কখন বা সমভাবে অধিষ্ঠিত হয়। এইরূপ মনও সকল বিষয়ে নটের অনুকরণ করিয়া থাকে[৩৮]। বিধাতাও ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় বস্তু সকলকে একবার একরূপ, আরবার অন্যরূপ, পুনর্ব্বার অন্যরূপে সৃজন করেন। অসংখ্য রচনা প্রণালী সৃজন করিতে তাঁহার শ্রান্তি নাই এবং আল-স্যও নাই[৩৯]। অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে উপচিত, উৎ-পাদিত, ভক্ষিত, নিহত ও সৃষ্ট করিয়া দিবসের ও রাত্রের পরিবর্ত্ত-নের ন্যায় পুনঃ পুনঃ হর্ষে ও বিষাদে পরিবর্ত্তিত ও পরিযোজিত করিতেছেন[৪০]। হে ব্রহ্মন্! কি বিপদ, কি সম্পদ, সমুদায়ই পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, স্থিরভাবে বা একরূপে থাকে না[৪১]। সর্ব্বসংহারক কাল প্রোক্ত প্রকারে অবলীলাক্রমে সমুদায় জগৎ বিচলিত ও বিপৎপাতে অভিভূত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন[৪২]। এই সংসার অতি বিস্তৃত ও বহু শাখাপ্রশাখান্বিত বৃহৎ বৃক্ষের অনুরূপ ত্রিভুবনস্থ প্রাণি পরম্পরা ইহার ফল; সে সকল প্রতিদিনই সমবিষ

হইতে ক্রমে কার্পাস বৃক্ষ, তৎপরে তাহা হইতে কার্পাস ও বস্ত্র। এবং ক্রমে ঘটের বস্ত্র ভা প্রাপ্তি।

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিপাকে পক্ক হইতেছে; অনন্তর সময় পবনে আহৃত হইয়া নিপতিত হইতেছে৪৩। *

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* বিপাক=শুভাশুভ জ্ঞানকর্ম্মের পরিপাক—ফলাবস্থার আগমন। পতন=স্বর্গে, নরকে ও মধ্য লোকে জন্মগ্রহণ।

একোনত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কথিতপ্রকার দোষদর্শনরূপ দাবাগ্নি আমার চিত্তকে দগ্ধ প্রায় করিয়াছে, সেই কারণে আমার চিত্তে ভোগ লালসা প্রসর (স্থান) প্রাপ্ত হইতেছে না। মৃগতৃষ্ণিকা (সূর্য্যকিরণে জলভ্রম) মরুভূমিতেই স্ফুরিত হয়, সরোবরে নহে। (অভিপ্রায় এই যে, চিত্তে বিবেকমূল বৈরাগ্য আরূঢ় হইলে ভোগাভিলাষ থাকে না)[১]। বলিতে কি, এই সংসার আমার নিকট প্রতিদিন কটু, কটুতর ও কটুতম হইতেছে। নিম্ব (তিক্ত) যদ্রূপ কাল প্রকর্ষে অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিক তিক্ত হয়, তদ্রূপ, এই সংসারও যতই দিন যাইতেছে ততই আমার নিকট তিক্তপ্রায় হইতেছে[২]। মনুষ্যের অন্তঃকরণ করঞ্জফলের ন্যায় কর্কশ। সেই জন্যই তাহাতে অনবরত দুর্জ্জনতা পরিবর্দ্ধিত ও সৌজন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩]। দেখিতেছি, প্রতিদিন পার্থিব মর্য্যাদা (পৃথিবীর সুখ সৌভাগ্যাদি) শুষ্ক মাষশিম্বীর ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, অধিকন্তু তাহা কখন্ ও কি প্রকারে ভাঙ্গে তাহা লক্ষ্য হয় না। (মাষশিম্বী= মাষ কলাই নামক ডাইলের শিমী। এই শিমি বা শিম্বী পাকিয়া শুকাইলে চট্ চট্ শব্দে ফাটিতে থাকে)[৪]। হে মুনীশ্বর! রাজ্য ও ভোগ, উভয়ই চিন্তার আধার। সুতরাং উভয় (রাজ্য ও ভোগ) অপেক্ষা চিন্তাপরিহীন একান্তশীলতা (নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত থাকা) উৎকৃষ্ট[৫]। উদ্যান আমার প্রীতিপ্রদ নহে। স্ত্রীগণও আমার সুখের উপকরণ নহে, এবং অর্থতৃষ্ণাও আমার হর্ষোদ্রেকের কারণ নহে। আমি মনের সহিত উপশান্ত হইব, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা[৬]। হে পিতঃ! সংসারের সুখ যেরূপ অনিত্য, অর্থপিপাসা যেরূপ দুরুদ্বহ, অন্তঃকরণ যেরূপ চপল, তাহাতে শান্তিলাভের আশা দুরাশা। কিসে নিবৃত্তি লাভ করিব তাহাই ভাবিতেছি[৭]। অধিক কি বলিব, মরণেও আমার নিরানন্দ নাই এবং জীবনেও আমার প্রীতি নাই। যে অবস্থায় থাকিলে শোকতাপের অতীত হওয়া যায়, আমি সেই অবস্থাই অবলম্বন করিব। তাহা জীবিত কালে অথবা মরণের পর, যখন হয় হউক, সেজন্য ব্যগ্র

নহি[৮]। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, ভোগে প্রয়োজন নাই, অর্থে প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার চেষ্টাতেও প্রয়োজন নাই। ঐ সকল কেবল অহঙ্কারপ্রভব; পরন্তু তাহা আমার বিদ্রাবিত হইয়াছে[৯]। যাহারা জন্মরূপ চর্ম্মরজ্জুর ইন্দ্রিয়রূপ গ্রন্থিতে বাঁধা পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা বন্ধনবিমোচনার্থ যত্নবান্ হয় তাহারাই প্রকৃতপক্ষে উত্তম পুরুষ[১০]। যদ্রূপ হস্তী চরণপ্রহারে সুকোমল কমল নিষ্পেষিত করে, তদ্রূপ, মকরকেতু স্ত্রীজনসহায়ে ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ মথিত ও নিষ্পেষিত করিয়া থাকে[১১]। হে মুনীন্দ্র! আজি যদি নির্ম্মল বুদ্ধি সহকারে বিকৃত অন্তঃকরণ সুস্থির না করি, তবে, কাল্ তাহার অবসর কোথায়? প্রসিদ্ধ বিষ বিষ নহে; বিষয়বৈষম্যই শ্রেষ্ঠ বিষ। কারণ, প্রসিদ্ধ বিষ একবারমাত্র জন্ম হরণ করে; কিন্তু বিষয় বিষ বহুজন্ম বিনাশ করে[১২।১৩]। সুখ, দুঃখ, মিত্র, বান্ধব, জীবন, মরণ, এ সকল বন্ধনের হেতু হইলেও জ্ঞানিচিত্তের বন্ধনকারণ নহে। কারণ এই যে, জ্ঞানী ঐ সকলের বশ্য হন না[১৪]। হে ব্রহ্মন্! হে পূর্ব্বাপরতত্ত্ববিৎ! যাহার দ্বারা আমার শোক, ভয় ও আয়াস তিরোহিত হয়, যাহাতে আমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, এক্ষণে সত্বর তাহা আমাকে উপদেশ করুন[১৫]। অজ্ঞতা ভীমরূপা অরণ্যানীর সদৃশী। অরণ্যানী কণ্টকপরিব্যাপ্তা, অজ্ঞতাও দুঃখকণ্টকে পরিপূর্ণা। অরণ্যানী লতাজালে সমাচ্ছন্না, অজ্ঞতাও বাসনাজালে বেষ্টিতা। অরণ্যানী সমবিষম অর্থাৎ উচ্চনীচপ্রদেশ বিশিষ্টা, অজ্ঞতাও স্বর্গনরকভোগপ্রদা[১৬]। হে মুনিবর! বরং ক্রকচ সংঘর্ষ (করাতের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন) সহ্য করা যায়, তথাপি, সংসারব্যবহারসমুত্থিত দুর্ব্বহ আশার ও বিষয়ের প্রহার সহ্য করা যায় না[১৭]। এই ইষ্ট, এই অনিষ্ট, এই কর্ত্তব্য, এই অকর্ত্তব্য, আজ্ ইহা আছে, কাল তাহা নাই, এইরূপ ভ্রান্ত ব্যবহার আমার অন্তঃকরণকে বায়ুবেগবিতাড়িত রজোরাশির ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রচালিত ও কম্পিত করিতেছে[১৮]। সিংহ যেমন বাগুরা ছিন্ন করে, তেমনি, আমিও বিষয় বিরতির সহায়তার সংহাররূপ হার ছিন্ন করিব (ছিঁড়িয়া ফেলিব)। ভোগ তৃষ্ণা, তাহার তন্তু (সুতা), জীব সমূহ তাহার মুক্তা, চৈতন্যব্যাপ্তি তাহার স্বচ্ছতা এবং চিত্ত তাহার উজ্জ্বল মধ্যমণি। এ হার কৃতান্ত নামক কালের কণ্ঠভূষণ[১৯।২০]। হে তত্ত্ববিৎসমূহেরশ্রেষ্ঠ! আপনি

শীঘ্র আমার হৃদয়াটবীস্থ মিহিকা সদৃশ মনস্তিমির, সুখকর ও প্রধান বিজ্ঞান (উপদেশ) প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া অপসারিত করুন[২১]। হে মহাত্মন্! যেরূপ চন্দ্রোদয়ে নিশার অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, সাধু-সংসর্গে সমুদায় মনঃপীড়া বিদূরিত হইয়া থাকে। আয়ু বায়ুবিঘট্টিত অবভ্রপটল (মেঘবৃন্দ) বিনিঃসৃত জলকণার ন্যায় ভঙ্গুর, ভোগমেঘপরম্পরা-পরিশোভিনী সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল ও যৌবনসেবা জলপ্রবাহের ন্যায় অচিরস্থায়িনী। (কিছুদিন প্রবাহিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়)। এই সকল দেখিয়া, মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া, আমি শান্তিকেই হৃদয়রাজ্য অর্পণ করিয়াছি[২২।২৩]।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশত্তম সর্গ।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! জীব সকল সঙ্কটাবহ শত অনর্থে পরিপূর্ণ সংসাররূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত ও আত্মোদ্ধারে অসমর্থ আছে, ইহা দেখিয়া আমার মন চিন্তারূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়াছে[১]। আমার মন ভ্রান্ত হইতেছে, পদে পদে ভয় হইতেছে এবং এই শরীর জীর্ণ বৃক্ষের পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে[২]। যেমন অরণ্যাদি স্থানে দুর্ব্বল পতীর বালিকা পত্নী সর্ব্বদা শঙ্কিতা ও ভীতা হয়, তেমনি, শিশু স্থানীয় মদীয় মতি উৎকৃষ্ট সন্তোষ ও ধৈর্য্যরূপ মাতার ক্রোড় প্রাপ্ত না হওয়ায় পদে পদে শঙ্কিত ও ভীত হইতেছে[৩]। যেমন সারঙ্গগণ তুচ্ছ তৃণের লোভে তৃণাচ্ছাদিত গর্ত্তে নিপতিত হয়, তেমনি, আমার অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল বিষয়ের লোভে বিড়ম্বিত হইয়া কেবল দুঃখ পাইবার নিমিত্তই দুঃখের কূপে (সংসার নামক গর্ত্তে) নিপতিত হইতেছে[৪]। অবিবেকী পুরুষের চক্ষুরাদি, ইন্দ্রিয়, ক্লেশময় সংসারে চিরপরিচিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করে, সৎপদে অর্থাৎ পরমতত্ত্বে একবারও গমন করে না। সুতরাং তাহারা অন্ধকূপস্থিত জীব অপেক্ষাও বদ্ধ, আত্মোদ্ধারে অক্ষম, সুতরাং দুঃখী[৫]। চিন্তা জীবরূপ পতির কান্তা বা প্রণয়িণী। কান্তা পতির অধীনে ও পতির গৃহেই অবস্থিতি করে, অন্যত্র যাইতে পারে না, এবং পতিগৃহ পরিত্যাগ করিতেও পারে না; সেইরূপ, চিন্তাও জীবরূপ পতি পরিত্যাগ করিতে ও স্বেচ্ছামত বিষয়ে গমন করিতে পারিতেছে না[৬]। যদ্রূপ লতা সকল হিমপাতে পত্রপরিত্যাগিনী হয়, রস সংযোগে পুনর্ব্বার অভিনব পত্র ধারণ করে, সেইরূপ, জীবের ধীরতাও কখন বৈরাগ্যের উদয়ে বিষয়পরিত্যাগিনী ও রসের (রস=ব্রহ্মরস) আবেশে অদ্বিতীয় বস্তুবলম্বিনী হইতেছে এবং পুনর্ব্বার তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেছে[৭]। মহর্ষে! ঈদৃশ অন্তরালাবস্থা অত্যন্ত ক্লেশাবহ। আমি দেখিতেছি, এখন আমার সংসারস্থিতি একবার আত্মাকে অবলম্বন করিতেছে আবার তাহা পরিত্যাগ করিতেছে। (অভিপ্রায় এই যে, আত্মবিবেকের প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বার্দ্ধ প্রতিষ্ঠিত ও শেষার্দ্ধ অনভিব্যক্ত রহিয়াছে।

সেই কারণে আমি পূর্ণতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না)। সুতরাং এ অবস্থায় আমি উভয়ভ্রষ্ট অর্থাৎ সংশয়ান্বিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছি[৮]। যেরূপ শাখাপল্লবহীন দণ্ডায়মান মহীরুহ দর্শনে কখন কখন দৃষ্টিবিভ্রমপ্রযুক্ত বস্ত্বন্তর বলিয়া বোধ হয়, আত্মতত্ত্বের স্বরূপাবস্থা জানিতে না পারিয়া আমার মতিও সেইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়াছে[৯]। যেমন অমরগণ নিজ নিজ বিমান পরিত্যাগ করে না, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যেমন আপন আপন গোলক (আশ্রয়স্থান) পরিত্যাগ করে না, তেমনি, বিবিধ ভোগবাসনা বিস্তীর্ণা ভুবনবিহারী মদীয় চিত্তও চঞ্চলস্বভাব পরিত্যাগ করিতেছে না[১০]। হে সাধো! যে স্থান একমাত্র সত্যের আশ্রয়, দেহাদি উপাধি বিহীন, ও সর্ব্বপ্রকার অশান্তিশূন্য এবং যে স্থানে গমন করিলে জীব শোকমোহাদির বশবর্ত্তী হয় না, সেই পরমসুখজনক বিশ্রামস্থান কোথায় তাহা আমাকে বলুন[১১]। জনক রাজা প্রভৃতি অনেকানেক সাধুজনেরা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মযোগ সহকারে কি প্রকারে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা উপদেশ করুন[১২]। এই সংসারে কি প্রকারে অবস্থিতি করিলে সংসার পঙ্কে অর্থাৎ পুণ্য পাপে ও শোকে মোহে লিপ্ত হইতে না হয় তাহা আমাকে বলুন[১৩]। আপনারা কিরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া এই দোষাকর সংসারে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, মহানুভাব ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ও নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন, তাহাও আমাকে বলুন[১৪]। আমি দেখিতেছি, সাংসারিক বিষয় বিষধর সদৃশ। ভোগ তাহাদের ফণা, বিভব তাহাদের বিষ, এবং ক্ষণভঙ্গ আকার তাহাদের কৌটিল্য। ঈদৃশ ভোগ-ফণ বিষয়-ফণী কি প্রকারে মঙ্গলদায়ক হইতে পারে?[১৫] হে মহর্ষে! জীবের বুদ্ধিরূপ সরোবর মোহরূপ মাতঙ্গ কর্তৃক অনবরত আলোড়িত হইতেছে; আমি জানিতে চাহি, কি প্রকারে তাহার আবিলতা বিদূরিত হইবে? কি প্রকারেইবা বুদ্ধিসরোবর মলশূন্য হইবে?[১৬]। জনগণ সংসারব্যবহারে নিযুক্ত থাকিয়াও নলিনীদলগত সলিলের ন্যায় কিরূপে তাহাতে অসংলগ্ন থাকিবে, তাহাও আমাকে বলুন[১৭]। পরদুঃখকে আত্মদুঃখবৎ ও স্বীয় দুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এবং মন্মথকে স্পর্শ না করিয়া জনগণ কিরূপে উত্তমতা লাভ করিতে পারে, তাহাও উপদেশ করুন[১৮]। অজ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রের পারগামী মহাপুরুষের আচার ব্যবহার স্মরণ করতঃ কোন্ আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি আত্মবিড়ম্বনাজনিত দুঃখে

দুঃখিত না হয়?[১৯] এই অসমঞ্জসীভূত সংসারে কিরূপ কর্ম্ম করিলে শ্রেয়ঃসাধন হয়, কি প্রকারেই বা সমুচিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ইহাতে থাকিয়া কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[২০]। হে জগৎপ্রভো! সম্প্রতি আমাকে এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করুন—যাহাতে আমি অস্থির ধাতৃ-চেষ্টার (বিধির-বিধানের) পূর্ব্বাপর অবগত হইতে পারি[২১]। হে ব্রহ্মন্! যে প্রকারে আমার হৃদয়রূপ আকাশে অবস্থিত মনোরূপ চন্দ্রমা নির্ম্মলীকৃত হইতে পারে তাহা বর্ণন করুন[২২]। জগতের মধ্যে উপাদেয় কি, হেয় কি, এবং চঞ্চল অচলসদৃশ চিত্তকে কি প্রকারেই বা সুস্থির করিতে পারা যায়, তাহাও বলুন[২৩]। হে মুনিবর! কোন্ পবিত্রকারক মন্ত্রের দ্বারা অশেষ-যন্ত্রণাদায়িনী সংসারনাম্নী বিসূচিকা পীড়ার শান্তি হইতে পারে তাহাও আমাকে উপদেশ করুন[২৪]। মহর্ষে! আমি কি প্রকারে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুশীতল ও পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারি তাহা বলুন, আমি তাহা আহরণ করিব[২৫]। আপনারা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সাধু; সম্প্রতি যাহাতে আমি অন্তঃকরণের পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারি, যাহাতে আর শোক দুঃখে পতিত না হই, আমায় সেই সমস্ত বিষয়ের সদুপদেশ প্রদান করুন[২৬]। মহাত্মন্! যেরূপ অরণ্যমধ্যে কক্কুর সকল ক্ষুদ্রপ্রাণী দিগকে ক্লেশ প্রদান করে, সেইরূপ, সংসারের বিকল্পকল্পনা সকল আমার চিত্তকে বিশ্রান্তিসুখশূন্য করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে[২৭]।

ত্রিংশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশত্তম সর্গ।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! সংসারী জীবের জীবন বর্ষা মেঘের সদৃশ। (কখন আছে, কখন নাই)। ভাবিয়া দেখুন, এই কুৎসিত দেহ ও পরমায়ু উচ্চ বৃক্ষের চঞ্চল পত্রাগ্রস্থ লম্বমান জলকণার ন্যায় ভঙ্গুর এবং কলামাত্রাবশেষিত হিমাংশুর (কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির চন্দ্রের) ন্যায় দুর্লক্ষ্য। (অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না)[১]। অপিচ, উক্ত উভয় (দেহ ও পরমায়ু) শালীক্ষেত্রবিহারী শব্দায়মান ভেকের স্ফীত কণ্ঠত্বকের ন্যায় অচিরস্থায়ী ও সুহৃদ স্বজনগণের সম্মেলন বাগুরাকার্য্যকারী লতা। (বাগুরা=পশু বন্ধনের রজ্জু)[২]। জীবের যে বিষয়বাসনা—তাহাই প্রবল বর্ষাবায়ু, মোহ মেঘ, কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি তত্রস্থ তড়িৎ, লোভ তাহাতে নৃত্যকারী ময়ূর[৩]। জীবনরূপ বর্ষামেঘের উদয়ে লোভ ময়ূর নৃত্য করে ও সেই সময় শত শত অনর্থরূপ কুটজ বৃক্ষের কলহরূপ কলিকা প্রস্ফুটিত হয়[৪]। প্রাণিরূপ আখুর (ইন্দুরের) ভক্ষক অতিক্রূর কৃতান্ত মার্জ্জার (যমরূপ বিড়াল) অনবরত সঞ্চরণ করিতেছে ও কোন এক অতর্কিত স্থান হইতে কর্ম্মরূপ জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে[৫]।

মহর্ষে! এবম্বিধ সংসারসঙ্কটে নিপতিত ব্যক্তির উপায় কি? গতিই বা কি? কিরূপ চিন্তা ও কোন্ আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই অশুভ সংসারারণ্যে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে না হয় তাহা আমাকে বলুন[৬]। হে মহর্ষে! সুধীজনেরা অতিতুচ্ছ বস্তুকেও রমণীয় করিতে পারেন। কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, কি দেবলোকে, এমন পদার্থ কিছুই নাই যাহা সুধীজনের রমণীয় নহে[৭]। এই নিরন্তর ক্লেশদায়ক দগ্ধ সংসারের কিছুমাত্র স্বাদ বা রস নাই। তবে যে, কিছু সুস্বাদ ও সরস বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র মূঢ়তাই তাহার কারণ[৮]। বসন্তসমাগমে কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইলে বসুন্ধরা তাহার শুভ্রতায় ও রমণীয়তায় রমণীয় হয়। সেইরূপ, সর্ব্বদুঃখের মূলীভূত আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই পূর্ণকামতারূপ ক্ষীরোদার্ণবে অবগাহন করিতে পারা যায়। সুতরাং তখন এই অশেষ দোষাকর সংসার রমণীয় হয়। তাহার অন্যথা হইলে কদাচ ইহা রমণীয়

হয় না[৯]। হে মহর্ষে! আপনি বলুন অথবা আমায় উপদেশ করুন, কিরূপে বা কি উপায়ে কামকলঙ্কে কলঙ্কিত মদীয় মনশ্চন্দ্রমা নিষ্কলঙ্ক ও শোভাযুক্ত হইবে এবং কিরূপ ব্যবহার করিলেই বা তৎকলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া নির্ম্মলদ্যুতি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইবে[১০]। এই সংসার ফল-শূন্য নিবিড় অরণ্য। ইহাতে ঐহিক পারত্রিক কোনও ফলের প্রত্যাশা নাই। ঈদৃক সংসারারণ্যে কিরূপে মহাত্মাগণের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা আমাকে উপদেশ করুন[১১]। কি করিলে সংসারসমুদ্রবিহারী রাগ-দ্বেষাদি মহারোগ সকল ও দুঃখপ্রদ বিভূতি সকল জীব দিগকে বাধ্য করিতে না পারে তাহা আমাকে বলুন[১২]। হে ধীরশ্রেষ্ঠ! পারদ যেমন অনলে পতিত হইলেও দগ্ধ হয় না, তেমনি, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে জ্ঞানামৃত তৃপ্ত ধীর পুরুষ এই অগ্নিতুল্য দাহক সংসারে পতিত ও দগ্ধ না হন তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[১৩]। হে ঋষিবর! যেমন জলচর জন্তু জলাশয় ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে না; তেমনি, এই সংসারে বিনা ব্যবহারক্রিয়ায় কেহই অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না[১৪]। যদ্রূপ অগ্নির দাহিকা শক্তি রহিত হইলে তৎকালে তাহার শিখাও অদৃশ্যা হয়, সেইরূপ, রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত ও সুখদুঃখবর্জ্জিত হইতে পারিলে তখন সৎ ও অসৎ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার অভাব হইয়া থাকে[১৫]। বিষয়াবলম্বন (বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ) অবস্থাই মনের সত্তা (অস্তিত্ব), তাহার পরিক্ষয় (বিষয়ের সহিত মনের অসংযোগ) তাহার অসত্তা (অনস্তিত্ব বা না থাকা)। মনের অসক্ততা সম্পাদন করাই মহাযোগ এবং তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ। যাবৎ না আমার তত্ত্ব জ্ঞান হয় তাবৎ আপনি আমাকে সেই মহাযোগ উপদেশ করুন। উক্ত মহা-যোগ ব্যতীত মননশীল মনেব পরিক্ষয় সম্ভাবনা নাই[১৬]। যে যুক্তি অর্থাৎ যে যোগ অবলম্বন বা ব্যবহার করিলে আমি দুঃখের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব অথবা যে ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে আমি দুঃখভাগী হইব না, সেই উত্তম যোগ শীঘ্র উপদেশ করুন[১৭]। পূর্ব্বকালে কোনও মহাত্মা কোন সুচেতা কি প্রকার সদ্‌যুক্তি অবলম্বনে অনুপম শান্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, শীঘ্র তাহা বর্ণন করুন[১৮]। হে ভগবন্! যাহাতে আমার সমুদায় মোহ বিনষ্ট হয়, সমুদায় দুঃখ দূরীকৃত হয়, তাহা প্রদান করুন[১৯]। যদি তাদৃশী যুক্তি না থাকে অথবা থাকিলেও যদি আপনি

আমার নিকট তাহা প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চিত শান্তি লাভে বঞ্চিত হইব। কারণ, সে উপায় আমি স্বয়ং উদ্ধার বা, আহরণ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে আমি অহঙ্কারপরিহারপূর্ব্বক সর্ব্ব-প্রকারচেষ্টাশূন্য হইয়াছি এবং উৎকণ্ঠাবশতঃ আমি সময়ে পান ভোজন, বসনভূষণপরিধান ও স্নানাদি করি না[২০।২২]। মুনিবর! আমি কি সম্পদ্, কি বিপদ, কি বিষয়কার্য্য, কিছুতেই অবস্থিতি করি না। একমাত্র দেহ-ত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি[২৩]। আমি নির্ম্মল, নিঃশঙ্ক, নিশ্চেষ্ট, নষ্টমৎ-সর ও মৌনী হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি[২৪]। অতঃ-পর আমি নিশ্বাস প্রশ্বাস ও বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অন-র্থের আশ্রয় এই দেহ নামক সন্নিবেশ (অবয়ব বা মূর্ত্তি) পরিত্যাগ করিব[২৫]। হে মহর্ষে! আমি এই দেহের নহি এবং এ দেহও আমার নহে। যে কিছু দেহের বহির্বর্ত্তী তাহাও আমার নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি তৈলহীন দীপের ন্যায় প্রশান্তভাব অবলম্বন করিতে উদ্যুক্ত হই-য়াছি এবং এই দেহ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব অনবরত সেই চিন্তায় কালযাপন করিতেছি[২৬]।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! যেরূপ মহামেঘোদয়ে ময়ূর কেকারব করিয়া অবশেষে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, সেইরূপ, নির্ম্মল শশধর সদৃশ মনোহরমূর্ত্তি বিশুদ্ধচেতা রামচন্দ্র বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ সমক্ষে কথিত প্রকার বাক্য বিন্যাস করিয়া অবশেষে মৌনাবলম্বন করিলেন[২৭]।

একত্রিংশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশত্তম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, রাজীবলোচন রাম সভামধ্যে মোহনিবৃত্তিকর ঐ সমস্ত কথা কহিলে তত্রস্থ জনগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল এবং তৎকালে তাঁহাদের শরীরের রোম সমুদায় যেন রামবাক্য শ্রবণ করিবার অভিলাষে বস্ত্রভেদ করিয়া উৎসৃত হইয়াছিল১।২। কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত তাঁহাদের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সমুদায় সংসারবাসনা অস্তমিত হইয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে যেন অমৃতসাগরের তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়াছিলেন৩।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ, জয়ন্ত ও ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ, মহারাজ দশরথ ও তৎসদৃশ অন্যান্য ভূপালবর্গ, সামন্তবর্গ ও অন্যান্য রাজকুমারগণ, পিঞ্জরস্থিত পক্ষিগণ, ক্রীড়ামৃগ সকল, স্ব স্ব-প্রকোষ্ঠের বাতায়নপ্রদেশে উপবিষ্টা সর্ব্বাভরণবিভূষিতা কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী, উদ্যানস্থিত লতা সকল, আকাশবিহারী সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস ও পুলহ প্রভৃতি মুনিপুঙ্গব, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেব, দেবেশ্বর, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ, সকলেই চিত্রার্পিতপ্রায় নিস্পন্দভাবে রামচন্দ্রের সেই সমস্ত শ্রবণযোগ্য মহোদার বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়াছিলেন৪।১১।

রঘুবংশরূপ আকাশের পরমসুন্দর শশাঙ্ক রাজীবলোচন রাম পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্‌বিন্যাস সমাপ্ত করিয়া মৌনী হইলে, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সাধুবাদ প্রদান ও আকাশে সিদ্ধবিদ্যাধরাদিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন১২।১৩। দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃষ্ট পুষ্পসমূহের মধ্যে পারিজাত নামক পুষ্প নিতান্ত সুন্দর। তাহার কান্তি দেবাঙ্গনাগণের মৃদুমধুর হাস্যকান্তির অনুরূপ। সেই সকল পুষ্প তৎকালে বায়ুপ্রেরিত নক্ষত্রমালার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভ্রমরমিথুন কর্ণশীতলকারী গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছিল এবং তাহার সৌরভ্য তত্রত্য জনগণকে উন্মত্তপ্রায় করিয়াছিল। স্বর্গপরিচ্যুত সেই সকল কুসুম বিদ্যুদুদ্দীপ্ত গর্জ্জনহীন মেঘকণার, মুক্তাহারের, তুষার কণার, ক্ষীরসাগরের লহরীস্থ চন্দ্রপ্রতিবিম্বের, অথবা ক্ষীরপিণ্ডের ন্যায় নিতান্ত

নির্ম্মল, অম্লান ও শুভ্রবর্ণ। তদ্ভিন্ন ভ্রমরকূজিত সুখস্পর্শসমীরণসঞ্চালিতদল কমল, কেতকী, কুমুদ, কুন্দ ও অচলজাত কুবলয় সকল প্রচ্যুত হইয়া তত্রত্য ভূতল নিতান্ত পরিশোভিত করিয়াছিল। রাজবাটীর প্রাঙ্গণ ভূমি তাদৃশ নানাপুষ্পবর্ষণে পরিপূর্ণ হইল। এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার পুরবাসী নরনারীগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া আকাশপথে নয়ন স্থাপন করতঃ অবলোকন করিতে লাগিল[১৪।২০]। পূর্ব্বে আর কখন এরূপ বিস্ময়কর পুষ্পবৃষ্টি হয় নাই এবং এরূপ প্রণালীর পুষ্পবর্ষণ কস্মিন্ কালে কেহ অবলোকন করিয়াছে, এরূপ মনে করিতে পারিল না[২১]। দেবগণ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক আকাশ হইতে অদৃশ্যভাবে এক মুহূর্ত্তের চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত বর্ণিত প্রকারের পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল[২২]।

অনন্তর কুসুমবর্ষণ নিবৃত্ত হইলে সভাগত সমস্ত লোক বিমানচারী সিদ্ধগণের এইরূপ বাক্যালাপ শুনিতে পাইল[২৩]। "আমরা সেই কল্পারম্ভ কাল হইতে সিদ্ধসেনা মধ্যে আকাশের সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছি কিন্তু রঘুকুলচন্দ্র রাম বীতরাগহেতু যেরূপ যেরূপ কথা বলিলেন, এরূপ শ্রুতিরসায়ন মনোহর কথা আর কখন এবং কোনও স্থানে শ্রবণ করি নাই[২৪।২৫] আমরা আজ্ রামমুখবিনির্গত মহাহ্লাদকর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বকৃত পুণ্যের সার্থকতা সম্পাদন করিলাম। রঘুনন্দন রামচন্দ্রের শান্তিগুণবিশিষ্ট অমৃততুল্য বাক্য সমুদায় শ্রবণগোচর করিয়া আজ্ আমরা উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম[২৬।২৭]।"

দ্বাত্রিংশত্তম সর্গ সমাপ্ত।
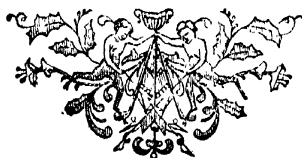
ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সিদ্ধগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষিগণ রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্রের প্রশ্ন সমুদায়ের কিরূপ সদুত্তর প্রদান করেন তাহা শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য[১]। মহর্ষি নারদ, ব্যাস ও পুলহ প্রভৃতি মুনিপুঙ্গবগণ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ শীঘ্রই এই সভায় তত্ত্বকথা শ্রবণার্থ আগমন করুন এবং চল—আমরাও ঐ সর্ব্বসম্পত্তিপূর্ণ কনকদ্যোতী (সমুজ্জ্বল) পবিত্র দাশরথি সভায় গমন করি[২।৩]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহারাজ! সিদ্ধগণ ও দেবর্ষিগণ পরস্পর ঐরূপ বলাবলি করিয়া, যে সভায় রামচন্দ্রাদি বিরাজ করিতেছেন সেই মহতী সভায় সমাগত হইলেন[৪]। তাঁহারা দেখিলেন, সভার অগ্রভাগে বীণাবাদন-নিরত মুনীশ্বর নারদ ও জলধরশ্যাম ব্যাস উপবিষ্ট আছেন। উভয়ের অন্তরালে ও পশ্চাদ্ভাগে ভৃগু, অঙ্গিরা ও পুলস্ত্য প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। রাজা দশরথের এই মহতী সভা ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণে মণ্ডিত; চ্যবন উদ্দালক উশীর ও শরলোমাদি মুনিবৃন্দে বিভূষিত[৫।৬]। জনসম্বাধ বিধায় (বহুলোকের আগমনে স্থানের অভাব হওয়ায়) ইঁহাদের অজিনাসন অপ্রশস্তভাবে বিস্তৃত এবং তাঁহারা সংশ্লিষ্ট ভাবে উপবিষ্ট। সকলেরই হস্তে অক্ষমালা ও সম্মুখে কমণ্ডলু[৭]। যদ্রূপ আকাশে তারকা-শ্রেণী, তদ্রূপ, এই সভায় ঋষিবৃন্দের শ্রেণী। ইঁহাদের মুখমণ্ডলে ব্রহ্ম-তেজ বিরাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাঁহাদের শ্বেতরক্ত মুখমণ্ডল সূর্য্য-শ্রেণীর অনুকারী হইয়াছে[৮]। ঋষিবৃন্দের গাত্রবর্ণ বিভিন্ন; তদনুসারে সেই সভা বিচিত্র রত্নরাজীর অনুকারী হইয়াছে। যদ্রূপ মুক্তাশ্রেণী পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করে, সেইরূপ, এই সভাস্থ ঋষিবৃন্দও পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন[৯]। দেখিলেই বোধ হয়, যেন শত শত সূর্য্যমণ্ডলের একত্র সমাবেশ হইয়াছে অথবা শত শত পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া জ্যোৎস্নারাশি বর্ষণ করিতেছে। এই নয়নমনোহারিণী সভা দীর্ঘকাল চেষ্টার মহৎ ফল[১০]। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সভায় নক্ষত্রমালামণ্ডিত নবজলধরের ন্যায় ব্যাসদেব বিরাজ করিতেছেন এবং

তারকাপরিবেষ্টিত হিমাংশুর ন্যায় নারদ মহর্ষিও অবস্থান করিতেছেন। অপরভাগে দেবগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় পুলস্ত্য মুনি এবং ত্রিদশগণ বেষ্টিত আদিত্যের ন্যায় অঙ্গিরা মুনি অনির্ব্বাচ্য শোভা বিস্তার করতঃ এই সভায় উপবিষ্ট আছেন[১১।১২]। স্বর্গবাসী সিদ্ধগণ, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ করিলে, বর্ণিতপ্রকারের দাশরথী সভা তাঁহাদের সম্মানার্থ উত্থিত হইল[১৩]। এই সময়ে সমাগত বিমানবাসী ও সভাস্থিত মর্ত্ত্যবাসী মিশ্রিত হইয়া অদ্ভুত শোভা বিস্তৃত করিল এবং তাঁহাদের অঙ্গ-কান্তিতে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইল[১৪]। তাঁহাদের মধ্যে কাহার হস্তে বেণুদণ্ড, কাহার হস্তে লীলাপদ্ম, (শোভার্থ পরিগৃহীত পদ্মপুষ্প), কাহার শিখাগ্রে দূর্ব্বাঙ্কুর এবং কাহার বা মস্তককেশে মণিরত্ন পরিশোভিত রহিয়াছে[১৫]। কেহ স্ফটিকমালা, কেহ রুদ্রাক্ষমালা এবং কেহ বা হস্তে বলয়ীকৃত করিয়া মল্লিকামালা ধারণ করিয়াছেন। কেহ পিঙ্গলবর্ণজটাজুটমণ্ডিত;[১৬] কেহ বা ক্ষীরধবলকেশে পরিশোভিত। কোন ঋষি চীর বসন, কোন মুনি বল্কল বসন, কেহ বা কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। কাহার কটিতটে চঞ্চল মেখলা, কাহার বা মুক্তামালা লম্বিত রহিয়াছে[১৭]। বিমানচর সিদ্ধগণ ও দেবগণ এবম্প্রকারে সভা প্রবেশ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র তাঁহাদের ক্রমানুসারে পূজা করিলেন। অর্ঘ্য, পাদ্য, বিনয়বাক্য ও সাদর সম্ভাষণ প্রভৃতি যথাযোগ্য উপচারে সম্মানিত করিলেন[১৮]। অনন্তর তাঁহারাও বশিষ্ঠকে ও বিশ্বামিত্রকে আদর পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, বিনয়বাক্য প্রভৃতি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করিলেন[১৯]। রাজা দশরথ সমাগত দেবগণকে, দেবর্ষিগণকে ও সিদ্ধগণকে সর্ব্বপ্রকার উপচারে সমাদর পূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং কুশলপ্রশ্নাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে সমাদৃত করিলেন[২০]। ভূতলবিহারী ও ব্যোমবিহারী মহাত্মগণ উক্তপ্রকার সম্ভাষণাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সম্মানিত করিয়া যথাযথ আসনে উপবিষ্ট হইলেন[২১]। অনন্তর সাধুবাদ ও পুষ্পবর্ষণ দ্বারা পুরোবর্ত্তী প্রণত রামচন্দ্রের অর্চ্চনা অনুষ্ঠিত হইল[২২]। প্রথমতঃ রাজলক্ষ্মীবিভূষিত কমললোচন রাম সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন, অনন্তর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, দেবর্ষি নারদ, মুনিপুঙ্গব ব্যাস, মরীচি, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, শরলোমা, বাৎস্যায়ন, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, উদ্দালক, ঋচীক, শর্য্যাতি ও চ্যবন প্রভৃতি বেদ-

বেদাঙ্গপারগ জ্ঞাতজ্ঞেয় মহাত্মা মহর্ষিগণ সেই সভার অধিনায়ক স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন[২৩।২৭]। অনন্তর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সহ নারদাদি ঋষি-গণ বিনয়নম্র রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন[২৮]—আহা! কুমার রামচন্দ্র কি মনোহর, কল্যাণকর, বৈরাগ্যগর্ভ ও শান্তপ্রসাদগুণ-বিশিষ্ঠ বাক্য বলিয়াছেন![২৯] রামচন্দ্রের বিচারনিষ্পন্নার্থব্যঞ্জক, জ্ঞানগর্ভ, আর্য্যজনোচিত, সুস্পষ্ট, উদার অর্থাৎ ভাবগম্ভীর, হৃদয়ানন্দকর, নির্দ্দোষ, স্পষ্টাক্ষর, হিতজনক ও সন্তোষজনক বাক্য কোন্ ব্যক্তির বিস্ময় উৎপাদন না করিবে?[৩০।৩১] শত শত ব্যক্তির মধ্যে দৈবাৎ কোন কোন ব্যক্তি এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্তোন্নতিকারক ও বাঞ্ছিতার্থবোধনে সমর্থ বাক্য বলিতে সমর্থ হয়[৩২]। বস্তুতঃই রামসদৃশ সূক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি এ জগতে আর নাই। হে কুমার রাম! তোমা ব্যতীত অন্য কাহার বিবেকফলশালিনী প্রজ্ঞা বিকসিত হইতে দেখা যায় না। রামচন্দ্রের হৃদয়ে যেরূপ প্রজ্ঞারূপিনী দীপশিখা জাজ্বল্যমানা, এরূপ প্রজ্ঞাদীপ অন্য কোন পুরুষের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে তিনিও অপ্রাকৃত পুরুষ বলিয়া গণনীয় হন[৩৩।৩৪]। এই সংসারে অসংখ্য রক্তমাংসময় ও অস্থিময় যন্ত্র (মানব দেহ) জন্মিয়াছে পরন্তু সে সকলে যথার্থ সচেতনতার অভাব দেখা যায়। অর্থাৎ তাহারা সচেতন হইয়াও প্রকৃতপক্ষে অচেতন, অজ্ঞ, বা জড়-তুল্য অবোধ। তাহারা কেবল বৃথা শব্দ স্পর্শাদি বিষয় উপভোগ করিয়া বিনষ্ট হয়[৩৫]। যাহারা এই সংসারে সদসদ্বিবেচনাশূন্য ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, যাহারা কেবল জন্ম, মরণ ও জরা প্রভৃতি দুঃখের অনুগামী হইয়া কাল যাপন করে, তত্ত্ববিচার করে না, তাহারা মানব হইয়াও পশু[৩৬]। অরিমর্দ্দন রাম যেরূপ পূর্ব্বাপরবিচারপরায়ণ ও সকলের অভিষ্টফলপ্রদ, এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না[৩৭]। যেমন সহকার তরু সর্ব্বত্র সুলভ নহে, তেমনি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যরসবিশিষ্ট সুফলপ্রদ সৌম্যদর্শন লোকও সুলভ নহে[৩৮]। রাম এই বাল্যাবস্থাতেই সংসারযাত্রার ফল সম্যক্ প্রকারে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[৩৯]। ফলপত্রপুষ্পশালী সুখারোহ ও সুদৃশ্য বৃক্ষ অনেক দেশে অনেক প্রকার দেখা যায় সত্য; পরন্তু চন্দনবৃক্ষ অন্য কুত্রাপি জন্মিতে দেখা যায় না[৪০]। অনেক ফল-পল্লবাদিযুক্ত বৃক্ষ আছে (প্রত্যেক বনে) বটে; কিন্তু অপূর্ব্ব চমৎকার লবঙ্গ সর্ব্বত্র সুলভ নহে[৪১]। যেমন শারদীয় শশী হইতে সুশীতল জ্যোৎস্না

ও সুবৃক্ষ হইতে সৌন্দর্য্যগুণবিশিষ্ট মঞ্জরী ও সুপুষ্প হইতে পরিমল-স্রোত পাওয়া যায়, তেমনি, এই রাম হইতে আমরা চিত্তচমৎকারকারিণী বাণী পাইতেছি[৪২]। অহে দ্বিজেন্দ্রগণ! এই অশেষ দোষাকর সংসারে সার পদার্থ অতি দুর্লভ। এই সংসারে যে সমস্ত ধীসম্পন্ন যশোনিধি ব্যক্তি সার পদার্থের নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করেন তাঁহারাই ধন্য ও তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই পৃথিবীতে রামচন্দ্রের সদৃশ বিবেকশালী উদারস্বভাব পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয়, পরেও আর কেহ হইবে না। হে মহর্ষিগণ! যদি আমরা রামচন্দ্রের লোক চমৎকার জনক এই প্রশ্ন সমুদায়ের অভিলষিত উত্তর প্রদান করিতে না পারি তাহা হইলে জানিলাম, আমরা সকলেই নির্ব্বোধ[৪৩।৪৬]।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

———*———

বৈরাগ্যপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, সভাসদগণ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে পুরোবর্ত্তী রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন[১]। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাঘব! তোমার কিছুই জানিতে অবশেষ নাই। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা তুমি স্বীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা অবগত হইয়াছ[২]। তোমার চিত্ত স্বচ্ছমুকুরতুল্য নির্ম্মল। মুকুর যেমন অল্প পরিমার্জ্জন অপেক্ষা করে, তেমনি, তোমার স্বচ্ছদর্পণসম বুদ্ধিও মার্জ্জন মাত্র অপেক্ষিণী হইয়া আছে। (ভাবার্থ এই যে, তুমি যে অভিজ্ঞ হইয়াও প্রশ্ন করিতেছ তাহা কেবল বুদ্ধির মার্জ্জনা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য নহে। বস্তুতঃ প্রমাণ ও গুরূপদেশ ব্যতীত বিশ্বাস দৃঢ় হয় না)[৩]। আমি বুঝিয়াছি, তোমার মতি ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের সদৃশী। তোমার বুদ্ধি অন্তরে অন্তরে সমুদায় জ্ঞাতব্য জানিয়াছে; কেবল বাহিরে বিশ্রান্তি মাত্র (পরিতোষরূপা শান্তি) অপেক্ষা করিতেছে[৪]।

রাম কহিলেন, ভগবন্! ব্যাসপুত্র শুকদেব তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত অগ্রে শান্তিসুখ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই এবং কেনইবা তিনি গুরূপদেশের অনন্তর শান্তিসুখ লাভ করিয়াছিলেন?[৫]

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাম! ব্যাসপুত্র শুকদেবের বৃত্তান্ত তব বৃত্তান্তের অনুরূপ। যে ক্রমে তাঁহার মোক্ষ হইয়াছিল সে ক্রম ও বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর[৬]। এই যে অঞ্জনশৈলসন্নিভ ভাস্করসদৃশ দ্যুতিমান্ মহাপুরুষ তোমার পিতার পার্শ্বদেশে সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট

আছেন, ইহার নাম ব্যাস[৭]। ইহার শুক নামে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র হইয়াছিল; তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তির ন্যায় (মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুর ন্যায়) ছিলেন[৮]। মহামনা শুক মনে মনে লোকযাত্রার বিষয় সর্ব্বদাই বিচার (পর্য্যালোচনা) করিতেন, তাহাতে তাঁহার তোমার ন্যায় বিবেক জ্ঞান উদিত হইয়াছিল[৯]। অতিমনস্বী শুক নিজ বুদ্ধি বলে দীর্ঘকাল আত্মা কি অনাত্মা কি তাহা বিচার করিয়া যাহা সত্য অর্থাৎ আত্মা তাহা পরমার্থরূপে বিদিত হইয়া ছিলেন[১০]। তিনি নিজ উৎপ্রেক্ষিত-জ্ঞানে পরম বস্তু পাইলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্রান্তি লাভ (শান্তি বা মোক্ষ) হইল না। "ইহাই বস্তু" এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আরোহণ না করায় পরমাত্মতত্ত্বে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান দূরে অবস্থিত রহিল[১১]। এই পর্য্যন্ত লাভ হইল যে, যেমন চাতক ধারাধর-ধারা ভিন্ন অন্য জলে বিরত থাকে, ভোগ বিমুখ হয়, তেমনি, তিনিও এই সকল ক্ষণভঙ্গুর ভোগে বিরত ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া থাকিলেন[১২]। একদা এই নির্ম্মল চিত্ত শুক সুমেরু পর্ব্বতের নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন[১৩]। পিতঃ! কি প্রকারে এই সংসারাড়ম্বর উৎপন্ন হইয়াছে? * এবং কোন্ সময়ে ইহা উপশম প্রাপ্ত হইবে? ইহার পরিমাণ কি ও ইহা কাহার? † (এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন)[১৪]। অনন্তর সেই মহর্ষি আত্মজ কর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সমুদায় বক্তব্য যথাযথ রূপে বলিলেন[১৫]; কিন্তু শুক পিতার সেই সকল বাক্য পর্য্যাপ্ত মনে করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, আমি স্বীয় বুদ্ধি বলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি; পিতা তদপেক্ষা কিছু বিশেষ বলিলেন না অথবা বলিতে পারিলেন না[১৬]। পরে ভগবান্ ব্যাস পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পুত্র! আমি সম্যক্ প্রকারে তত্ত্ব অবগত নহি[১৭]। এই পৃথিবীতে জনক নামে এক প্রসিদ্ধ মহীপতি আছেন, তিনি সমস্ত বেদ্য বিদিত আছেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

---

* আড়ম্বর=পরবঞ্চনার্থ কৃত্রিম চেষ্টা বিশেষ। জীব সংসারের নিকট আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকায় সংসারকে আড়ম্বর বলা হইয়াছে।

† কাহার? এই প্রশ্নের বিবরণ এই যে, দেহের সংসার? কি ইন্দ্রিয়ের সংসার? কি প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সংসার? কি আত্মার সংসার? অথবা মিলিত সমুদায়ের সংসার?

করিলে সমুদায় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবে[১৮]। পিতা ব্যাস এই কথা কহিলে পুত্র শুক সুমেরু হইতে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং যে স্থানে জনকপালিতা বিদেহনগরী, সেই স্থানে গমন করিলেন[১৯]। শুক বিদেহপুরী মিথিলা প্রাপ্ত হইলে দৌবারিক গণ মহারাজা জনক'কে এই বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিল। "মহারাজ! ব্যাসপুত্র শুক দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন।" অনন্তর মহারাজ জনক শুক দেবের জ্ঞান পরিক্ষার্থ প্রথমতঃ অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক "থাকুক" এই মাত্র বলিয়া সাত দিন মৌন থাকিলেন, কোন কিছু বলিয়া পাঠাইলেন না[২০]। এ দিকে শুক উন্মনা হইয়া সেই স্থানে সাত দিন সাত রাত্র অতিবাহিত করিলেন। সপ্তাহ অতীত হইলে পর মহারাজ জনক তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। প্রবেশ করাইলেন বটে; কিন্তু আরও সাত দিবস অদৃশ্য থাকিলেন। শুক পুনঃ পুনঃ "রাজা কোথায?" এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও কেহই সে কথার প্রত্যুত্তর দিল না। এদিকে শুকদেব জনকের দর্শন না পাইয়া দিন দিন অধিক দুর্ম্মনায়মান হইতে লাগিলেন। সেই রাজ-অন্তঃপুরমধ্যে বিবিধ বিলাসশালিনী রূপলাবণ্যবতী কামিনী গণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা তাঁহার সপর্য্যা (সেবা) হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেমন মৃদুসমীরণ বদ্ধমূল অচল সঞ্চালিত করিতে পারে না, তেমনি, সেই সমস্ত ভোগসুখ মহাযোগী শুকদেবের মন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না[২১।২৫]। সেই সপ্তাহ কাল তিনি ধ্যানী মৌনী আত্মনিষ্ঠ ও স্বস্থ অর্থাৎ বিকার পরিহীন সুতরাং অচঞ্চল ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশপ্রসন্নবদনে অতিবাহিত করিলেন[২৬]। মহারাজ জনক এবম্প্রকার পরীক্ষার দ্বারা প্রমুদিতাত্মা শুকদেবের স্বভাব সর্ব্বতোভাবে বিদিত হইলেন, অনন্তর তাঁহাকে স্বসমীপে আনয়ন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন[২৭]। প্রণামান্তে স্বাগত প্রশ্ন, অনন্তর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জনক কহিলেন, হে শুক! তুমি এই জগতের সমুদায় কার্য্য নিঃশেষিতরূপে অবগত হইয়াছ এবং সকল মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি তাহা আমায় বল। তোমার আগমন শুভ হউক[২৮]।

শুকদেব বলিলেন, গুরো! এই সংসার আড়ম্বর কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপেই বা ইহার শান্তি হয়, তাহা আমাকে

শীঘ্র বলুন[২৯]। (আমি বিজ্ঞাত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।)

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাম! জনক ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, ইতি পূর্ব্বে ব্যাস যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে জনকও অবিকল সেইরূপ বলিলেন[৩০]।

শুনিবা শুকদেব বলিলেন, আমি বিবেকের (তত্ত্ববিচারের) দ্বারা আপনা আপনি এই সমস্ত বিদিত হইয়াছি এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও আমাকে, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা বা যে তত্ত্ব বলিলেন, এ তত্ত্ব শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়[৩১।৩২]। আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, এই দগ্ধ সংসার কেবল মাত্র স্বকীয় কল্পনায় সমুত্থিত হইয়াছে এবং কল্পনার ক্ষয় হইলে ইহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা নিতান্ত নিঃসার[৩৩]। হে মহাবাহো! আমি বিবেক প্রভব উৎপ্রেক্ষায় অর্থাৎ বিচার দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছি তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ইহা তথ্যভূত কি না তাহা আপনি আমাকে শীঘ্র বলুন। যদিও বিচারপ্রভব উক্ত তথ্য সত্য; তথাপি উহা যাহাতে অচল হয়, স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সম্প্রতি আপনি তাহাই করুন। আমার চিত্ত সংশয়াক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ ইহা আত্মতত্ত্ব কি ইহা আত্মতত্ত্ব এবম্প্রকারে দোদুল্যমান হইতেছে ও তজ্জনিত ভ্রান্তি আমাকে অবসন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার পরিত্রাতা। আমার বিশ্বাস এই যে, আমি আপনার নিকটেই বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিব[৩৪]।

জনক বলিলেন, হে মননশীল! তুমি স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হইয়াছ ও গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহাই অবধারিত। অতঃপর আর কোন অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় নাই। হে শুক! অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় এক মাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। সেই একাদ্বয় পরমাত্মা স্বীয় সঙ্কল্পের বশ্য হইয়া সংসারী ও জীবভাবে বদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইনি যখন নিঃসঙ্কল্প হইবেন তখন ইনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন[৩৫]। তুমি অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় সুব্যক্ত রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছ, ঐশ্বর্য্য ভোগে ও দৃশ্য বস্তুতে তোমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সুতরাং তুমি মহাত্মা[৩৬।৩৭]। হে শিশুমহাবাব! ভোগ এক প্রকার রোগ বিশেষ এবং তাহা অতিশয়িত দীর্ঘ। যখন তুমি এই বাল্যকালেই তাহাতে বিরত হইয়াছ, তখন

তোমাকে মহাবীর বৈ আর কি বলিতে পারি? তুমি যাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র, তোমার সেই জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিলাম, এক্ষণে অন্য কি শুনিতে ইচ্ছুক তাহা বল[৩৮]। তোমার পিতা ব্যাস সমুদায় জ্ঞানের আকর। তুমি যদ্রূপ পূর্ণজ্ঞানী হইয়াছ, তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও এরূপ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই[৩৯]। আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের ও ব্যাসের শিষ্য এবং তুমি তাঁহার (ব্যাসের) পুত্র ও শিষ্য। বিশেষতঃ তোমার ভোগবাসনা যার পর নাই তনুতা প্রাপ্ত অর্থাৎ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে নিমিত্ত তুমি আমা অপেক্ষা অত্যধিক শ্রেষ্ঠ[৪০]। হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছ। তোমার চিত্ত এক্ষণে পূর্ণ। তুমি আর দৃশ্য বস্তুতে নিমগ্ন নহ; সুতরাং তুমি মুক্ত হইয়াছ। এক্ষণে সংশয় পরিত্যাগ কর[৪১]।

অনন্তর শুকদেব মহাত্মা জনকের নিকট এইরূপ এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া ছিন্নসংশয় হইলেন। তখন তিনি নিতান্ত নির্ম্মল পরমাত্মায় চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৪২]। অনন্তর শোক, ভয়, আয়াস ও সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাপরিশূন্য ও ছিন্নসংশয় হইয়া সমাধিসিদ্ধির নিমিত্ত অনিন্দিত সুমেরু শৈলে গমন করিলেন[৪৩]। অনন্তর তত্রত্য সিদ্ধাশ্রমে গমন করতঃ গিরিকল্পসমাধিযোগে (যে যোগে পাহাড়ের ন্যায় নিস্পন্দ হওয়া যায় সেই যোগে) দশ সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিয়া তৈলহীন দীপের ন্যায় অল্পে অল্পে পরমাত্মাতে নির্ব্বাপিত হইলেন অর্থাৎ একীভূত হইলেন।

হে রামচন্দ্র! যেমন সলিলকণা বিলীন হইয়া যায়, তাহার ন্যায় শুকদেবও উক্তপ্রকারে সকল কলঙ্ক (অবিবেক ও অবিবেকের কার্য্য দৃশ্য দর্শন) পরিহার পূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরাৎপর পরমাত্মার পরম পবিত্র পদে একীভূত হইয়াছিলেন[৪৪]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।
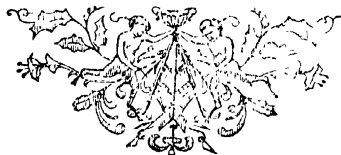
দ্বিতীয় সর্গ।

---*---

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যেমন সেই ব্যাসপুত্র শুক দেবের মাত্র মনোমালিন্য মার্জ্জনের প্রয়োজন ছিল এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার জনক রাজার নিকট উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল, তেমনি, তোমারও মাত্র মনোমল দূরীকরণ প্রয়োজনীয় ও তদর্থ উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক[১]। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া সমাগত মুনিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে লাগিলেন। ওহে মুনীশ্বরগণ! রামচন্দ্র জ্ঞেয় বিষয় সমস্ত উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এই রাম নিতান্ত সদ্বুদ্ধিশালী। যেমন রোগ ভোগে কাহারও রুচি (ইচ্ছা) হয় না, তেমনি, সদ্বুদ্ধিশালী রামের বিষয় ভোগে অরুচি দৃষ্ট হইতেছে[২]। যাহাদের চিত্ত পরম জ্ঞেয় ব্রহ্ম জানিয়াছে ও বুঝিয়াছে, বিষয় ভোগে রুচি না হওয়াই তাহাদের বাহ্যিক লক্ষণ। বস্তুতঃই তত্ত্বজ্ঞান হইলে তখন তাহার বিষয় ভোগে প্রবৃত্তি থাকে না[৩]। থাকিলে তদ্‌ভোগবাসনার দ্বারা সংসারে দৃঢ় বদ্ধ হইতে হয় পরন্তু ভোগবাসনা ক্ষীণ হইলে সংসারবন্ধন শিথিল হইয়া যায়[৪]। অনন্তর রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন। অহে রামচন্দ্র! পণ্ডিতেরা বিষয়বাসনাকে বন্ধন এবং বিষয়বাসনার বিনাশকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য দিগের মধ্যে আত্মবিষয়ক আপাত (পরোক্ষ) জ্ঞান প্রায়ই হইতে দেখা যায়; কিন্তু বৈরাগ্যপ্রভব তাহার (আত্মতত্ত্বের) সাক্ষাৎকার কাহার কাহার অতি কষ্টে হইয়া থাকে[৫।৬]। যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে আত্মদর্শী হয় সেই ব্যক্তিই যথার্থ আত্মজ্ঞ, যথার্থ জ্ঞাতজ্ঞেয় (জ্ঞাতব্য জ্ঞানে কৃতার্থ), এবং পণ্ডিত। ভোগ সকল তাদৃশ মহাপুরুষকে কদাচ আকর্ষণ করিতে পারে না[৭]। (যাহারা আপাতদর্শী তাহারা কদাচ পরবৈরাগ্য লাভে সমর্থ হয় না)। যাহাদের ঐশ্বর্য্য, যশঃ, পুণ্য, ঐশ্বর্য্যলাভ ও কল্যাণপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে কোনপ্রকার অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য নাই, অথচ ভোগবিমুখ; ইহসংসারে তাদৃশ মহাপুরুষেরাই জীবন্মুক্ত নামে প্রখ্যাত[৮]।

যেমন মরুভূমিতে লতার উৎপত্তি হয় না, তেমনি, যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় তাবৎ বিষয়বৈরাগ্যও জন্মে না[৯]। হে মুনিগণ! আমি সেই জন্যই বলিতেছি যে, আমাদের এই রঘুচূড়ামণি রাম পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; সেই কারণে পরম রমণীয় ভোগ্য বস্তু সকল ইঁহার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে না[১০]। অহে মুনিগণ! রাম অন্তরে যাহা জানিয়াছেন তাহা যথার্থ. অর্থাৎ অসংশয়িত আত্মতত্ত্ব হইলেও পরোপকার কারণে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সদ্‌গুরুর মুখে তাহা পুনঃ শ্রবণ করিবেন এবং তাহাতেই ইঁহার চিত্তবিশ্রান্তি হইবে[১১]।*রামের বুদ্ধি শরৎকালের শোভার ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মল হইয়াছে, কেবল মাত্র কেবলীভাব অর্থাৎ অদ্বয়চিন্মাত্রাবশেষ হওয়া অবরুদ্ধ আছে[১২]। তদর্থ অর্থাৎ মহাত্মা রামচন্দ্রের চিত্তবিশ্রান্তির নিমিত্ত রঘুকুলগুরু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী কালত্রয়দর্শী নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীমান্ বশিষ্ঠদেব যুক্তিসহকারে ইঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করুন[১৩।১৪]। হে ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার বিরোধ উপস্থিত হইলে আমাদিগের বৈরশান্তির নিমিত্ত ও ধীমান্ মুনিগণের পরম মঙ্গলার্থ বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ নিষধ ভূধরের (নিষধ নামে এক পর্ব্বত আছে) প্রস্থদেশে ভগবান্ কমলযোনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সে সকল কি তোমার স্মরণ হয়?[১৫।১৬] সেই সময়ে ভগবান্ কমলযোনি যে সকল শ্রেয়ঃসাধন উৎকৃষ্ট জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে যে জ্ঞান যুক্তিযুক্ত, যে জ্ঞানে জীবের সাংসারিক বাসনা বিনষ্ট হয়, যেমন প্রভাকরের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় তেমনি যে জ্ঞানের উদয়ে আত্মবিষয়ক অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট হয়, সেই যুক্তিযুক্ত জ্ঞান আপনার এই শিষ্য রামচন্দ্রকে উপদেশ করুন, তৎশ্রবণে ইনিও বিশ্রান্ত হউন। অর্থাৎ মোক্ষনামক পরমশান্তি প্রাপ্ত হউন[১৭।১৮]। রামকে উপদেশ করায় আপনার অল্প-

---

* অভিপ্রায় এই যে, রাম পরমজ্ঞানী হইলেও লোকহিতার্থে গুরূপদেশের প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার মনোভাব এই যে, এই উপলক্ষ্যে অন্যান্য অধিকারী পুরুষেরাও উপদেশ শুনিয়া আমার ন্যায় চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করুক। অথবা তিনি পরমতত্ত্ব কি তাহা মনে মনে বুঝিয়াও দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে অতত্ত্বজ্ঞের ন্যায় অসুখী আছেন, তাই তিনি বিশ্বাস আনয়নার্থ উপদেশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। উপদেশের প্রভাবে অবিশ্বাস দূরীভূত হইবে, অনন্তর শান্তিলাভ করিবেন।

মাত্রও কদর্থনা নাই অর্থাৎ বহু ক্লেশ হইবেক না। * যেমন নির্ম্মল মুকুরে রক্তাদি বর্ণ অনায়াসে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ, গতকল্মষ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিলে সে উপদেশ ইঁহার চিত্তে সহজে প্রতিরঞ্জিত হইবে। রামকে উপদেশ করা আপনার বহ্বায়াসসাধ্য হইবে না[১৯]। হে ব্রহ্মন্! সাধুদিগের তাহাই জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রার্থবোধ এবং তাহাই প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য, যাহা বিরক্ত সৎশিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান করা যায়[২০]। বিষয়বৈরাগ্যবিহীন অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কেবল কুক্কুর-চর্ম্মস্থিত দুগ্ধের ন্যায় অপবিত্রতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, অন্য কিছু হয় না[২১]। হে প্রভো! বীতরাগী, ভয়ক্রোধবিবর্জ্জিত অভিমানশূন্য ও পাপরহিত ভবাদৃশ ব্যক্তিরা যাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন তাহাদিগের অল্প-মাত্রও বুদ্ধিমালিন্য থাকে না[২২]।

বাল্মীকি কহিলেন, গাধিতনয় বিশ্বামিত্র এই কথা কহিলে, ব্যাস ও নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তদীয় বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথের পার্শ্ববর্ত্তী, ব্রহ্মার পুত্র ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ মহাতেজা মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন[২৩।২৪]। বলিলেন, হে মুনে! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা আমি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিব। কোন্ সমর্থ ব্যক্তি সাধুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারে?[২৫] হে সাধো! যদ্রূপ সমুজ্জ্বল দীপালোক দ্বারা রাত্রিকালীন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ, আমি জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা মহারাজ দশরথের পুত্রদিগের সমুদয় মনোমালিন্য দূরীভূত করিব[২৬]। পূর্ব্বে নিষধপর্ব্বতসানুতে ভগবান্ পদ্মযোনি সংসারশান্তির নিমিত্ত আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমার অন্তঃকরণে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে[২৭]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহারাজ! † রঘুবংশগুরু মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ কথা বলিয়া মহোৎসাহ সহকারে লোকবৃন্দের অজ্ঞতাশান্তির নিমিত্ত পরম পদ মোক্ষলাভের নিদানভূত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন[২৮]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

---

* বৃথা বহুক্লেশজনক কার্য্য করিতে হইলে তাহাকে কদর্থনা বলে।

† ইহা অরিষ্টনেমির সম্বোধন। প্রথমে বাল্মীকি মুনি অরিষ্টনেমি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পর পর বশিষ্ঠ রাম সংবাদাত্মক সন্দর্ভ বলিয়া আসিতেছেন।

তৃতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবান্ কমলযোনি সৃষ্টির আদিতে লোক সমুদায়ের দুঃখশান্তির নিমিত্ত যে জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট সেই জ্ঞানশাস্ত্র কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১]।

রাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে মোক্ষশাস্ত্র বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরন্তু তাহা আমি পরে শ্রবণ করিব, সম্প্রতি আমার যে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে অগ্রে তাহা বিদূরিত করুন[২]। হে মুনে! ভগবান্ শুকদেবের পিতা ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগুরু ও মহাত্মা। তিনি বিদেহমুক্ত হইলেন না কিন্তু তাঁহার পুত্র শুক মুক্ত হইলেন। ইহার কারণ কি তাহা আমায় অগ্রে বলুন[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। পরম সূর্য্যের প্রকাশের মধ্যে যে সকল ত্রিজগৎ রূপ ত্রসরেণু প্রবাহক্রমে সমুৎপন্ন হইতেছে ও তাহাতে বিলীন হইতেছে, সেই সমস্ত ত্রসরেণুর সংখ্যা অর্থাৎ ইয়ত্তা নাই[৪]। * এই বিদ্যমান কালেও যে কত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহাই বা কে গণনা করিয়া বলিতে পারে?[৫] ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী কালে সেই পরমাত্ম-সমুদ্রে যে সকল জগৎসৃষ্টিরূপ তরঙ্গ উঠিবে, তাহার কথা পর্য্যন্ত বলিতে কেহ সাহসী হয় না[৬]।

রাম কহিলেন, মহর্ষে! যে সকল জগৎ সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে ও হইবেক, তাহার সংখ্যা করিতে যে কাহার শক্তি নাই আমি তাহা বিদিত আছি। সে সকল কথা দূরে থাকুক, এক্ষণে বর্ত্তমান অনন্ত সৃষ্টির

---

* সূর্য্য প্রকাশরূপী ও জগতের প্রকাশক। যিনি তাদৃশ সূর্য্যের প্রকাশক তিনি পরম সূর্য্য। ইঁহারই নাম পরমাত্মা। পূর্ব্বে এই পরমাত্মায় অসংখ্য অনন্ত জগৎ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক সৃষ্টিকালে পরিমিত ত্রিজগৎ ছাড়া অপরিমিত ত্রিজগৎ কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে। সুতরাং এই পরিমিত ত্রিজগৎ যে ভাবে একটী ত্রসরেণু। এক এক জগৎ এক একটী পরমাণু—তাহার সমাহারে ত্রসরেণু। সুতরাং কোথায় কত ব্যাস ও কোথায় কত শুক আছে, ছিল বা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বিষয় কিরূপে অবগত হইতে পারা যায় তাহার উপায় উপদেশ করুন্[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রধান প্রাণীর মধ্যে যখন যে প্রাণী যে প্রদেশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, সে প্রাণী সেই প্রদেশে তখনই ব্রহ্মাণ্ডত্রয় (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল,) দেখিতে পায়[৮]। যাহার অন্য নাম চিত্তশরীর ও সূক্ষ্মশরীর, সেই আতিবাহিক (জীব মরণের অব্যবহিত পরে যে শরীরে অবস্থান করে সেই শরীর আতিবাহিক) শরীরে বুদ্ধ্যুপলক্ষিত আকাশে অর্থাৎ (হৃদয়াকাশে) বিভ্রান্তি বশতঃ বাসনাময় সূক্ষ্ম জগত্রয় অনুভব করে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ক্রমে সেই সেই বাসনাময় শরীর প্রাপ্ত হয়। বাস্তবপক্ষে, ব্যোমাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা নামক চিদাকাশ জন্মাদিবিকার বিবর্জ্জিত[৯]। কোটী কোটী প্রাণী ঐ প্রকার মৃত্যু অনুভব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবদ্দশায় যে সকল জগৎ দর্শন করে অর্থাৎ দৃশ্য দেখে; তন্মধ্যে, যে জগতে বা যে দৃশ্যে যাহার আশা বা বাসনা (সংস্কার) বদ্ধমূলা হয়, মৃত্যু সময়ে তাহাদের হৃদয়াকাশে সেই দৃশ্যই উদিত অর্থাৎ স্ফুরিত হয় ও মরণান্তর সে সেই দৃশ্য অর্থাৎ সেই জগৎ প্রাপ্ত হয়। ফলিতার্থ—সেই সমুদায় জগৎ বাসনা বিশেষের বিলাস ব্যতীত—অন্য কিছু নহে[১০]। যে কিছু জগৎ, যে কিছু দৃশ্য, সমস্তই সংকল্পনির্ম্মিত। যেমন মনোরাজ্য, যেমন ইন্দ্রজাল, যেমন কথার অর্থের প্রতিভাস, যেমন বায়ুরোগীর ভূভ্রমণ ভ্রম, যেমন বালবিভীষিকার্থ প্রস্তুত পিশাচ, যেমন আকাশে মুক্তাবলী, যেমন নৌকারোহীর দৃষ্টিতে তীরতরুর প্রচলন, যেমন স্বপ্নসন্দর্শন, যেমন স্মৃতিজাত খপুষ্প,—জগদ্দর্শন বা সংসারদর্শন ঠিক্ সেইরূপ। মৃত্যুপ্রাপ্ত ও জন্মপ্রাপ্ত জীব আপনার অন্তর মধ্যেই ঐরূপ অবভাসময় জগৎ সংসার দর্শন বা অনুভব করে, অন্য কোথাও গমন করিয়া দেখে না[১১।১৩]। ইহ শরীরে যে জগৎ দেখে, মৃত্যুর পর তাহাই পুনঃ তাহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় এবং জন্মের পরেও আবার তাহাই অনুভব করে। জগৎ অলীক হইলেও মরণোত্তর জীবগণ অতিপরিচয়ের প্রভাবে তাহার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও পরকালের নিয়মে স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাহা চৈতন্যাকাশে প্রকাশমান হইতে থাকে। ইহাকেই ইহলোক ও পরলোক বলে[১৪]। জীব জন্ম গ্রহণ

অবধি মরণ পর্য্যন্ত যে সচেষ্ট থাকে, তাহাই তাহার ইহলোক এবং মরণ বা মরণোত্তর যে পুনর্জ্জন্ম (অন্যদেহপ্রাপ্তি) হয়, সংক্ষেপতঃ, তাঁহাই তাহার পরলোক[১৫]।

এই সংসারে জীবগণ গৃহীত স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিলেও তন্মধ্যে যে বাসনাময় অন্য দেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাও সংসারের অন্তর্গত। সংসারী জীব তাহারই অনুবলে দেহাবসানে পুনরায় দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এই স্থূল দেহের ন্যায় অন্য দুই দেহও কদলীত্বকের অনুরূপে পরম পুরুষকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে[১৬]। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত, জগৎ ও জগতের ক্রম, (সৃষ্টির ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বাপর ঘটনা বা কারণ-কার্য্য-ভাব) সমস্তই অলীক। তথাপি ইহাতে জীবের জগদ্‌ভ্রম বিদ্যমান আছে[১৭]। অনাদি অবিদ্যা তাহার মূল। অনাদি অবিদ্যা সৃষ্টিরূপচঞ্চলতরঙ্গশালিনী সুদীর্ঘা নদীর অনুরূপা। হে রাম! অতিবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রস্থানীয় পরমাত্মার সৃষ্টিরূপ উত্তাল তরঙ্গ পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে[১৮।১৯]। সেই সমস্ত তরঙ্গের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন ও কতকগুলি নূতন। তন্মধ্যে কতকগুলি মনে ও গুণে সর্ব্বতোভাবে সমান, কতকগুলি অর্দ্ধসমান* এবং কতকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট[২০]। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এই মহর্ষি বেদব্যাস সৃষ্টিতরঙ্গের দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ, ইহা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি। সেই সেই তরঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ তরঙ্গ কুল, আচার, জীবন, চেষ্টা, আয়ুঃ, সর্ব্বাংশে সমান এবং অন্য দশ তরঙ্গও জ্ঞানাদি বিষয়ে সমান। অবশিষ্ট তরঙ্গ কুলবিলক্ষণ অর্থাৎ বংশে ভিন্ন। * এখনও সেইরূপ ও অন্যরূপ অন্যান্য ব্যাস, বাল্মীকি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষি জন্মিতে অবশেষ আছে[২১।২৩]। মনুষ্য, দেবতা ও দেবর্ষি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। ইহার পূর্ব্বে ইঁহারা যেরূপ আকারসম্পন্ন ছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ আছেন এবং পরেও ইহা অপেক্ষা পৃথক্ পৃথক্ আকারে (দেহে) জন্মগ্রহণ করিবেন[২৪]। হে রাম! এই

* তাৎপর্য্য এইযে, আমরা যে কল্পের জীব, এ কল্পের (সৃষ্টির) প্রারম্ভাবধি রামের সময় পর্য্যন্ত অনেকবার অনেক ব্যাস জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩১শের পর ৩২শ স্থানের ব্যাস ইনি। সকল ব্যাস দ্বৈপায়ন ও ভারতাদি গ্রন্থের কর্ত্তা নহেন। সেই কারণে বলা হইয়াছে, কেহ কেহ বংশে ও কার্য্যে সমান, কেহ কেহ অর্দ্ধ সমান ইত্যাদি। ভারতাদিগ্রন্থকর্ত্তা দ্বৈপায়ন ব্যাস প্রতি দ্বাপরে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্ব মন্বন্তরের সন্ধি সমেত বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভাবধি ৩২শ দ্বাপর অতীত হওয়ায় ৩২শ বার ব্যাসাবতার হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইঁহার ক্রমিক দশ অবতার আমার প্রত্যক্ষ ও অন্যান্য অবতার স্মৃতিগম্য আছে।

যে ব্রহ্মকল্পীয় ত্রেতা যুগ, এ যুগ পূর্ব্বে অনেক বার হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যেতেও হইবে। যেমন এই যুগে তুমি রামরূপ ধারণ করিয়াছ; এইরূপ পূর্ব্বেও কত বার রামরূপ ধারণ করিয়াছিলে, এবং পরেও যে কত-বার রামরূপে অবতীর্ণ হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও কত বার বশিষ্ঠমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণেও বশিষ্ঠরূপে বিদ্যমান আছি, এবং পরেও যে কত বার বশিষ্ঠরূপে অবতীর্ণ হইব, তাহারইবা নিশ্চয় কি[২৫]। আমি এই দীর্ঘদর্শী অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাসের পর পর দশ অবতার দর্শন করিলাম (দশবার জন্মিতে দেখিলাম)[২৬]। রামচন্দ্র! আমি যে কতবার ব্যাস বাল্মীকির সহিত একত্রিত হইয়াছি ও কত বার পৃথক্ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে[২৭]। আমরা কখন সদৃশ কখন বা বিসদৃশ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরাই আরও কতবার বিভিন্না-কারে ও সমান অভিপ্রায়ে জন্মগ্রহণ করিব। কখন বিজ্ঞ হইয়া জন্মিয়াছি কখন বা অবিজ্ঞ হইয়া জন্মিয়াছি। এই ব্যাস ইহ জগতে আরও আট বার জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মহাভারত নামক ইতিহাস প্রচার, বেদবিভাগ, কুলপ্রথাপালন, ব্রহ্মত্বথ্যাপন (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিস্তার) করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিবেন[২৮।৩০]। এখনও ইনি শোক, ভয় ও সর্ব্বপ্রকার কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্ত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ও মনোজয়ী হইয়া আছেন। সুতরাং ইনি এখনও জীবন্মুক্ত[৩১]। অহে রাম! জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের বিত্ত, বন্ধু, বয়স, কর্ম্ম, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও চেষ্টা, এ সকল কখন বা সমান থাকে, কখন বা অসমান থাকে। তাঁহারা কখন শত শত বার জন্মগ্রহণ করিতেছেন; কখন বা বহুকল্পেও একবার জন্মগ্রহণ করেন না।

এই যে ভূতপরম্পরা অর্থাৎ প্রাণিপ্রবাহ, ইহা বা এ সংসার মায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই জন্য ইহা অনাদি ও অনন্ত[৩২।৩৩]। জীবগণ ঈদৃশ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। এ মায়ার অন্ত বা বিরাম নাই। যেরূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গপরম্পরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, এই জীবপ্রবাহও বর্ণিতপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। কেবল তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষেরাই প্রশান্তচিত্তে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা পরিহার পূর্ব্বক পরমা শান্তি অবলম্বনে ও অনাবরণে অবস্থান করেন[৩৪।৩৫]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

হে সৌম্য! জল ও তরঙ্গ প্রথম দর্শনে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তু কল্পে সমান অর্থাৎ ভিন্ন নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মুনিদিগের সদেহ মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি আপাত দর্শনে বিভিন্ন বোধের গোচর হইলেও মুক্তিকল্পে সমান জানিবে[১]।

দেহ থাক্ আর নাই থাক, মুক্তির সহিত তাহার (দেহের) সম্পর্ক নাই। মুক্তি দেহঘটিত নহে। বন্ধন ও মুক্তি, বিষয়ের (জ্ঞেয় জ্ঞানের) দ্বারা ব্যবস্থিত হয়। যে ব্যক্তি ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান তাহাকে কিরূপে বন্ধন করিবে? আত্মা অসঙ্গ উদাসীন, ইহা জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না[২]। সম্মুখে এই যে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাস, ইনি জীবন্মুক্ত। আমরা ইঁহাকে কল্পনায় সদেহের ন্যায় দেখিতেছি; কিন্তু ইঁহার অন্তরাশয় নির্ব্বিঘ্ন—ভেদবিবর্জ্জিত। অর্থাৎ ইনি দেখিতে সদেহ হইলেও অন্তরে বিদেহ। ইঁহার অন্তর দেহাভিমানশূন্য[৩]। প্রত্যেক জ্ঞানীই ইঁহার ন্যায় অজ্ঞান বিনাশের পর বোধরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। যাঁহারা বোধরূপী, তাঁহাদের আবার প্রভেদ কি? দেহ থাকা না থাকা প্রভেদের কারণ নহে, বোধ থাকা না থাকাই প্রভেদের কারণ। যেমন জলে ও তরঙ্গে প্রভেদ নাই, তেমনি, মোক্ষ হইলে দেহে ও অদেহে প্রভেদ নাই[৪]। মোক্ষ একরূপ, সুতরাং জীবন্মুক্তির সহিত বিদেহ মুক্তির অল্পমাত্রও প্রভেদ নাই। বায়ু প্রবাহিত হউক বা না হউক, যাহা বায়ু তাহা বায়ুই, অন্য কিছু নহে[৫]। যাহা মুক্তি, তাহা পরমার্থ দৃষ্টিতে সদেহ-অদেহ-ঘটিত নহে। ভেদবর্জ্জিত একীভাবই মুক্তি নামের নামী, তাহা আমাদের ও এই ব্যাসের হইয়াছে। ফলিতার্থ—দ্বৈতত্যাগ পূর্ব্বক অদ্বয়াত্মসাক্ষাৎকার হইলে তখন তাহার দেহ থাকা না থাকা সমান হয়[৬]। অতএব, তুমি এক্ষণে সংশয় পরিত্যাগ করিয়া মৎকর্ত্তৃক উপদিশ্যমান পূর্ব্বপ্রস্তাবিত অজ্ঞানীর অজ্ঞাননাশন শ্রবণরঞ্জন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল শ্রবণ কর[৭]।

হে রঘুনন্দন! এই সংসারে সম্যকরূপে পুরুষকার প্রয়োগ করিতে

পারিলে, সকলেই সকল লাভ করিতে পারে[৮]। শাস্ত্রবিহিত পরিস্পন্দের অর্থাৎ কর্ম্মের প্রধান ফল চিত্তশুদ্ধি। তাহা লাভ করার পর হৃদয়াকাশে যে চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল নিবিড়ানন্দ (নিশ্চল নিবিড় নির্ব্বিকার ভেদ পরিশূন্য পরম সুখ) উদিত হয়, তাহাও পুরুষকারের প্রভাব। তাহা পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছুতে লব্ধ হয় না[৯]। যে পুরুষকারে গমন ভোজনাদি কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অথচ প্রত্যক্ষ হয় না, যে স্থলে কার্য্যসিদ্ধির বা ফল লাভের মূল কারণ পুরুষকার অপ্রত্যক্ষ থাকে, বুঝিতে পারা যায় না, সেই স্থলে, সেই পুরুষকারকেই মূঢ়লোকেরা দৈব বলে। বস্তুতঃ দৈব নামে স্বতন্ত্র পদার্থ নাই[১০]। সাধুগণের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া কায়মনোবাক্যে যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সৎকার্য্যই সফল এবং তাহাই প্রকৃত পৌরুষ বা পুরুষকার। তদ্ভিন্ন কার্য্য উন্মত্তচেষ্টার ন্যায় বিফল ও পুরুষকার বলিয়া গণ্য নহে[১১]। যে, যে বিষয়ের অভিলাষ করে, সে তাহা পাইবার জন্য শাস্ত্রোক্ত ক্রমে যত্নও করে। উচিত নিয়মে চেষ্টা করিলে ফলপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাব অর্থাৎ নিশ্চয়তা আছে। যদি বিঘ্ন বশতঃ সম্পূর্ণ ফল না হয়, তবে, অন্ততঃ অর্দ্ধফলভাগী হইতেও দেখা যায়[১২]। কোন জীব পৌরুষ নামক প্রযত্নের দ্বারা ইন্দ্রত্ব পদ উপার্জ্জন ও ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছে[১৩]। * কোন চিদুল্লাস † প্রাণী পুরুষকারনামা প্রযত্নের দ্বারা কমলাসনের পদ (ব্রহ্মত্ব) অধিকার করিয়াছে[১৪]। এবং কেহ বা শ্রেষ্ঠতম পুরুষকারের দ্বারা গরুড়ধ্বজের (বিষ্ণুর) পদ পুরুষোত্তমত্ব লাভ করিয়া সুখী হইয়াছে। অন্য এক জীব স্বীয় পুরুষকারে চন্দ্রার্দ্ধচূড়াধারী শিবের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[১৫।১৬]।

রাম! তুমি ইহা বিদিত হও যে, পুরুষকার দুই প্রকার। প্রাক্তন ও ঐহিক। তন্মধ্যে ইহজন্মকৃত প্রবল পুরুষকার প্রাক্তন পুরুষকারকে অভিভূত করিতে সমর্থ[১৭]। অধিক কি বলিব, অত্যন্ত যত্নশীল, দৃঢ়াভ্যাসতৎপর ও উৎসাহসমন্বিত পুরুষ ইহজন্মকৃত পুরুষকার দ্বারা সুমেরু

---

* জন্মান্তরীয় তপস্যার ফলে এই জীবলোকস্থ জীবই কল্পান্তরে ইন্দ্র হয়; সুতরাং ইন্দ্রত্ব পদ তপস্যা নামক পুরুষকারের ফল।

† চিদুল্লাস = চৈতন্যের উৎকর্ষে উৎকৃষ্ট। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে চৈতন্যের উৎকর্ষ। ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ সর্ব্বাধিক উৎকৃষ্ট; সেইজন্য তদাধারে চৈতন্যও অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত। ব্রহ্মাও পূর্ব্বকল্পে সামান্য জীব ছিলেন, তপোবলে বর্ত্তমান কল্পে ব্রহ্মা হইয়াছেন।

পর্ব্বত প্রভৃতিকেও বিদীর্ণ করিতে পারে; * প্রাক্তন পুরুষকারের ত কথাই নাই[১৮]। যে পুরুষকার শাস্ত্রানুসারে অর্জ্জন ও প্রয়োগ করা যায়, তাহাই পুরুষকার এবং তাহাই সফল হয়। অন্যথা অশাস্ত্রীয় পুরুষকারের সুফল দূরে থাকুক, অবিকন্তু তাহাতে অনর্থফলভাগী হইতে হয়[১৯]। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কোন পুরুষ শাস্ত্রীয় প্রযত্ন শিথিল করিয়া স্বাভাবিক রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী হয়, হইয়া আপনাকে এরূপ দুর্দ্দশায় পাতিত করে যে, স্বীয় হস্তাদি অঙ্গের উপরেও তাহার আধিপত্য রহিত হয় এবং এক বিন্দু জলও অঙ্গুল্যগ্রে উত্তোলন ও পান করিতে সমর্থ হয় না। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পুরুষ শাস্ত্রীয় নিয়ম দৃঢ়তর রূপে পরিপালন করিয়া অবশেষে সসাগরা সদ্বীপা ও সশৈলা বসুন্ধরার আধিপত্যলাভকেও কিছুমাত্র আয়াস সাধ্য বলিয়া বোধ করে না। কাহার বা এক বিন্দু জলও দুর্লভ এবং কাহার বা সমুদয় পৃথিবীও দুর্লভা নহে। এ সকল পুরুষকার বিশেষের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২০]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

* অগস্ত্য ঋষির সমুদ্রপান প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। সে সকল ক্ষমতা তপস্তানামক পুরুষকার দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে।

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন প্রভা (সূর্য্যকিরণ) নীল পীতাদি বর্ণভেদের কারণ, তেমনি, পুরুষের পুরুষার্থসাধনের প্রতি শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তিই প্রথম কারণ[১]। যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বকীয় অভিলাষ অনুসারে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, অধিকন্তু তাহা তাহার উন্মত্তচেষ্টিতের ন্যায় মোহের ও অনর্থের কারণ হইয়া উঠে[২]। যে, যে বিষয়ের অভিলাষী হইয়া যে প্রকার যত্ন করে, সে, সেই প্রকার ফলই প্রাপ্ত হয় তাহার অন্যথা হয় না। সুতরাং আপন আপন কর্ম্মই উপযুক্ত কালে দৈব হইয়া দাঁড়ায়; তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার দৈব নাই। ভাবার্থ এই যে, ফলদানোন্মুখ প্রাক্তন কর্ম্মই অজ্ঞ লোকের নিকট দৈব-নামে বিদিত[৩]।

পৌরুষ বা পুরুষকার দুই প্রকার। শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়। শাস্ত্রোক্ত পৌরুষ শ্রেয়োলাভের ও অশাস্ত্রীয় পৌরুষ অনর্থলাভের কারণ হইয়া থাকে[৪]। (অতএব, জ্ঞান-কর্ম্ম-উপাসনা নামক শাস্ত্রীয় পৌরুষ অবলম্বন করা বুদ্ধিজীবী নরের অবশ্য কর্ত্তব্য)। এমন মনে করা উচিত নহে যে, মনুষ্য কেবল প্রাক্তন পুরুষকারেরই অনুবর্ত্তী। অভিজ্ঞ লোক মাত্রেই জানেন, ও দেখিতে পান, যে, এই শরীরে প্রাক্তন ও ঐহিক উভয়বিধ পুরুষকারই নিরন্তর মেষদ্বয়ের ন্যায় উদ্যমসহকারে সম-বিষম-ভাবে যুদ্ধ করিতেছে। এই যুদ্ধে, যে অর্থাৎ যে পুরুষকার অধিকতর বলবান্ হয়, সেই পুরুষকারই জয় লাভ করে, এবং যে হীনবল হয় সে অভিভূত হয়[৫]। সেই জন্যই বলিলাম, মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক নিরালস্য হইয়া শাস্ত্রোক্ত পুরুষকারই অবলম্বন করিবেন। যে কার্য্য কল্য করিতে হইবে, অদ্যই তাহা সম্পন্ন করিব, 'এইরূপ উদ্যোগ বা উৎসাহ সহকারে উদ্যত চিত্তে কার্য্য করিলে অবশ্যই সে বিষয়ে জয়লাভ করা যায়[৬]। সম-বিষম-ভাবে উক্ত উভয় পুরুষকারই মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিবে, পরন্তু তন্মধ্যে যে দুর্ব্বল হইবে সে-ই পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই[৭]। অপিচ,

শাস্ত্রোক্ত নিয়মে কর্ম্মকারী শাস্ত্রোক্ত ফল পায় এবং বিরুদ্ধকর্ম্মকারী তাহার বিপরীত ফলই পায়। যে স্থলে শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষকার আশ্রয় করিলেও অনর্থাগম দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সে পুরুষকার প্রাগ্‌ভবীয় বলবৎ অনর্থের দ্বারা (অসৎ পুরুষকারের দ্বারা) নিরুদ্ধ বা দুর্ব্বল হইয়া আছে[৮]। তাদৃশ স্থলে হতাশ্বাস না হইয়া, পুনঃ পুনঃ প্রবলতর পুরুষকার অবলম্বন করতঃ দন্তে দন্ত বিচূর্ণিত করার ন্যায় ঐহিক শুভ উৎপাদনের দ্বারা প্রাক্তন অশুভ চূর্ণিত করিবেক[৯]। রামচন্দ্র! দুষ্পবৃত্তির উদয় দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোধগম্য করিতে হইবেক যে, অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে ও নিযুক্ত করিতেছে। অমনি সেই মুহূর্ত্তেই ঐহিক পুরুষকারের বল বাড়াইয়া তদ্দারা তাহাকে পরাহত করা অর্থাৎ দূরীকরণ করা কর্ত্তব্য। প্রাগ্‌ভবীয় পুরুষকার ঐহিক পুরুষকার অপেক্ষা বলবান নহে। যাবৎ না অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ উপশম প্রাপ্ত হয়, তাবৎ প্রযত্ন সহকারে সুপৌরুষের প্রতি সতত যত্ন রাখা বিধেয়[১০।১১]। যেরূপ পূর্ব্বদিবসীয় অজীর্ণাদি দোষ এতদ্দিবসীয় লঙ্ঘনাদির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, ঐহিক পৌরুষ দ্বারাও প্রাক্তন পৌরুষ (দৈব দোষ) নষ্ট হইতে পারে[১২]। অতএব, নিত্য উদ্যোগশালিতা অবলম্বনে ঐহিক পুরুষকার (ঐহিক পুরুষকার=এতজ্জন্মকৃত পুণ্য কর্ম্ম।) দ্বারা পূর্ব্বজন্মকৃত কুপুরুষকারকে অর্থাৎ সেই সেই দুরদৃষ্টকে অধঃকৃত করতঃ আপনাতে সংসারতারক সম্পদ সম্পাদনার্থ যত্ন করিবে। (সংসারতারক সম্পদ=শমদমাদি সাধন)[১৩]। হে রামচন্দ্র! উদ্যোগবিহীন পুরুষ গর্দ্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। উদ্যোগবিহীন হইয়া, গর্দ্দভতুল্য না হইয়া, শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভার্থে উদ্যোগ করা নিতান্ত বিধেয়[১৪]। সিংহ যেমন শক্র কর্ত্তৃক পিঞ্জররুদ্ধ হইয়াও স্বীয় উদ্যোগবলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, অথবা ভগবান্ বিষ্ণু যেমন আসুরী মায়ায় (শম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধ কালে) অবরুদ্ধ হইয়াও স্বীয় তেজে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি, আমরাও পৌরুষবলে অনায়াসে এই সংসারকুহর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি[১৫]। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে আপনার দেহের নশ্বরত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত কার্য্য করিতে হয়। (পশুভাব অর্থাৎ উদ্যোগবিমুখ গর্দ্দভের ভাব বা অবস্থা) পুরুষো-

চিত কার্য্য কি? পুরুষোচিত কার্য্য সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রাদি অবলম্বন[১৬]। এই যে বয়স্ অর্থাৎ যৌবন, ইহা দ্রবপিচ্ছিল (শ্লেষ্মাদিপরিপূর্ণ ও রক্তাদি দ্রব পদার্থে পরিব্যাপ্ত) ও কিঞ্চিৎ কাল স্ত্রীসম্ভোগ ও অন্নপানাদির দ্বারা পরিপালিত। আপাততঃ ইহা সুখকর কোমল বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে; পরন্তু তাহা (সে সুখ) কীটের ব্রণাস্বাদনের ন্যায় নিতান্ত বৃথা ও নিস্ফল[১৭]। তথাপি ইহার গুণ এই যে, ইহার দ্বারা শুভ পৌরুষ অর্জ্জন করা যায়। শুভ পৌরুষ অর্জ্জন করিতে পারিলে শীঘ্রই শুভ ফল পাওয়া যায় এবং অশুভ পৌরুষ উপার্জ্জন করিলে অশুভ ফল উৎপাদন করা হয়। অতএব, ইহাতে দ্বিবিধ পুরুষকার ব্যতীত দৈব নামে কোন পৃথক্ পদার্থ নাই[১৮]। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণলভ্য উপরি উক্ত তত্ত্ব (দৈবতত্ত্ব) পরিত্যাগ করিয়া অনুমানের আশ্রয় লয়, অর্থাৎ পাছে দৈব আমার বিঘ্নাচরণ করে, এইরূপ অনুমানের তাড়নায় পুরুষকার প্রয়োগে ভীত হয়, সে ব্যক্তি, ভ্রম বশতঃ স্বীয় ভুজদ্বয়কে সর্প বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না[১৯]। "অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে মূঢ় স্বীয় পুরুষকারের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করে, করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্যোগ থাকে, লক্ষ্মী সেই অদৃষ্টবাদী পুরুষের নিশ্চিন্ততা দেখিয়া তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিতা হন[২০]। অতএব, পুরুষ প্রথমতঃ পুরুষকার অবলম্বনে বিবেকাশ্রয় করিবেন, পরে পরমার্থ প্রতিপাদক অধ্যাত্মশাস্ত্রের আশ্রয় লইবেন। অনন্তর মোক্ষ মহারত্ন অন্বেষণ করিবেন। রত্ন, বিনা উৎকট যত্নে ও পরিশ্রমে লব্ধ হইবার নহে[২১।২৩]। যেমন ঘট ও পট পরিমিত বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থিত, তেমনি, পুরুষার্থও অর্থাৎ পুরুষকারও পরিমিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থিত। অর্থাৎ তাহার অবধি বা সীমা তত্ত্বসাক্ষাৎকার[২৪]। (যাবৎ না আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় তাবৎ পুরুষকার প্রয়োগ করা অতীব কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে পুরুষকার নিবৃত্ত বা সমাপ্ত হয়; সুতরাং পুরুষকার অসীম নহে; সসীম।) পুরুষার্থ বা পুরুষকার নিয়মিতরূপে সৎশাস্ত্রের আলোচনা, সৎসংসর্গ ও সদাচারপরায়ণতার দ্বারা ফলপ্রদ হয়। তাহাই পুরুষার্থের স্বভাব। তাহার অন্যথাচরণ করিলে তদ্দ্বারা মহান্ অনর্থের আগমন হইয়া থাকে[২৫]। পৌরুষের স্বরূপ বা স্বভাব এইযে, কখন কোন লোক উচিতরূপ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন নাই[২৬]।

অনেক মহাপুরুষ প্রথমে দৈবদুর্ব্বিপাক বা দুর্দ্দৈব বশতঃ দারিদ্র্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ও অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে পুরুষকার দ্বারা মহেন্দ্রতুল্য হইয়াছেন[২৭]। বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, সৎসংসর্গে বাস, সদ্‌গুরুসেবা ও সদ্‌গুণাদি অবলম্বন পূর্ব্বক পৌরুষ-প্রযত্ন স্থায়ী করিতে পারিলেই তদ্দ্বারা অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়[২৮]। যাহা বলিলাম, গল্প কথা নহে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং গুরুপরম্পরা শ্রুত হইয়াছি। অপিচ, অনুভবও করিয়াছি। যাহারা মনে করে, সেই, সেই ফল দৈবাৎ হইয়াছে ও দৈবাৎ এরূপ হয়, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ বা কুবুদ্ধিশালী। এই কুবুদ্ধিশালী লোকেরা আত্মঘাতীর ন্যায় পাপী ও বৃথা বিনষ্ট হয়[২৯]। যদিও পুরুষকারের ঐরূপ সামর্থ্য আছে, তথাপি, আলস্য তাহার পরিপন্থী (শত্রু বা বাধাদায়ক)। মানুষ যদি আলস্য না করে, তাহা হইলে জগৎ কি এত অনর্থসঙ্কুল হয়? পুরুষকারে আলস্যপরিহীন হইলে, সকল ব্যক্তিই পণ্ডিত, ধনী, মানী ও জ্ঞানী হইতে পারে। আলস্যের দ্বারাই এই সসাগরা সদ্বীপা ধরণী নর-পশুতে ও নির্ধন জীবে পরিপূর্ণা হইয়াছে[৩০]। অতএব, বাল্যকাল হইতেই আলস্যপরিহীন হইয়া সৎসঙ্গাদিনিষ্ঠ হওয়া উচিত। যদিও বাল্যে না হয়, তবে, অন্ততঃ যৌবন প্রারম্ভ হইতে পারে। আদর, নৈরন্তর্য্য ও প্রযত্নাদি সহকারে সাধুসঙ্গ, পদার্থতত্ত্বানুসন্ধান, আপনার ও জগতের গুণদোষ বিচার, এই সকল বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়[৩১]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে রাজন্ অরিষ্টনেমি! ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া সভাস্থ লোক পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রজনী অতিবাহিতা ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার তাঁহারা সভাস্থানে আগমন করিলেন এবং স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন[৩২]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! পুরুষের প্রাগুক্তপ্রকার জন্মান্তরীণ কর্ম্মকেই দৈব বলা যায়, তদ্ভিন্ন দৈব নাই। অতএব, দৈষ্টিকতা পরিত্যাগ করিয়া সাধুসমাগম ও সৎশাস্ত্র পর্য্যালোচনাদি শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। পুরুষকারই জীবকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া থাকে[১]। যেমন যেমন যত্নাধিক্য হইবে তেমনি তেমনি তাহা ফল প্রদান করিবে। সেই ফলদানসামর্থ্যবিশিষ্ট যত্নোৎকর্ষাদি পুরুষকারের ও দৈবের নামান্তর মাত্র[২]। যেমন দুঃখের সময় দুঃখ হয়, হইলে লোক সকল "আঃ কি কষ্ট!" এইরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ, প্রাক্তন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই "হা অদৃষ্ট!" এইরূপ বলিয়াও থাকে। এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তাহারা দুঃখরূপে পরিণত প্রাক্তন কর্ম্মকেই দৈব বলিয়াছে[৩]। কর্ম্ম ভিন্ন দৈব নামে আকারবিশিষ্ট কোন বস্তু নাই। অতএব, বলবান্ পুরুষ..যেমন অনায়াসে বালককে পরাজয় করিতে পারে, সেইরূপ, বলবান্ ঐহিক পুরুষকারও দৈবকে পরাভূত করিতে পারিবে[৪]। যদ্রূপ অদ্যতনীয় প্রায়শ্চিত্তাদি সদাচার পূর্ব্বতন অসদাচারের খণ্ডন করিয়া জীবকে পবিত্র করে, তদ্রূপ, বর্ত্তমান পুরুষকারও প্রাক্তন অশুভ পুরুষকারকে বিনষ্ট করিয়া শুভফল উৎপাদন করিয়া থাকে[৫]। যে সকল লোক লোভের বা সুখের বশ্য হইয়া প্রাক্তন অশুভ বিনাশে উদাসীন থাকে, উপস্থিত সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না, না পারিয়া অলস হয়, তাহারাই প্রকৃত দীন, প্রকৃত মূঢ় ও প্রকৃত দৈব-পরায়ণ[৬]। যখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পুরুষকার দ্বারা বিনষ্ট হয় তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, দৈব অপেক্ষা ঐহিক পুরুষকার অত্যধিক বলবান্[৭]। একবৃন্তস্থিত ফলদ্বয়ের মধ্যে একটী ফলকে রসশূন্য ও শুষ্ক হইতে দেখা যায়। সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, রস ভোক্তার প্রাক্তন কর্ম্মই সেই ফলরস বিঘাতের জন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল[৮]। যেহেতু দেখা যায়, জগতের প্রসিদ্ধ ও সিদ্ধ পদার্থও ক্ষয়কারকের প্রযত্নে ক্ষয় হইয়া থাকে, সেই হেতু নিশ্চয় হয় যে, প্রযত্নের বল বড়ই প্রবল[৯]। প্রাক্তন ও ঐহিক

দুই পুরুষকার মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করে বটে; বল প্রকাশ করে বটে, পরন্তু যে বলবান্ তাহারই জয় হইতে দেখা যায়[১০]।

রাজবংশের অভাব হইলে অমাত্যগণ কর্ত্তৃক মঙ্গলহস্তী প্রেরিত হইয়া যদি কোন ভিক্ষুক পুত্রকে আনয়ন করিয়া রাজাসনে বসায়, তাহা হইলে সেস্থলে ভিক্ষুক পুত্রের পূর্ব্বসুকৃতি থাকিলেও অমাত্যগণের পুরুষকারকেও তাহার অন্যতর কারণ বলা যাইতে পারে[১১]। * পুরুষগণ যেমন পৌরুষ-প্রকাশ দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া তাহা দন্তের দ্বারা নিষ্পিষ্ট করে, সেইরূপ, পৌরুষবলে বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষকে নিষ্পিষ্ট করিয়া থাকে[১২]। পৌরুষবিহীন লঘুচেতা লোকেরাই যত্নশালী বলিষ্ঠ লোকের ভোগ্য হয়। তাহারা তাহাদিগকে ইচ্ছানুসারে লোষ্ট্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ও যে সে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে[১৩]। অশক্ত অক্ষম লোকেরা শক্ত সক্ষম লোকের পৌরুষকে অর্থাৎ সেই সেই পুরুষকারকে বা দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষমতাকে নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ "দৈব" বা "অদৃষ্ট" বলিয়া অবধারণ করে[১৪]। পূর্ব্বোক্ত শক্ত সমর্থ পুরুষ অপেক্ষা অধিক শক্ত সমর্থ অন্যপুরুষও আছে, তাহারা আবার তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। অতএব, বিদ্যমান প্রাণীর মধ্যে ঐ প্রকারের পুরুষকারই দৃষ্ট হয় অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বুঝা উচিত, তদতিরিক্ত দৈব নাই। ফলিতার্থ—শক্তিশালী ব্যক্তিগণের পৌরুষকে নিরুদ্যম ব্যক্তিরা দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে[১৫]। শাস্ত্র, অমাত্য, হস্তী ও পুরবাসী প্রজা, ইহাদের যে ঐক্য, স্বাভাবিকী একতা, তাহাই সেই ভিক্ষুক পুত্রের রাজ্যের কর্ত্রী ও ধারয়িত্রী[১৬]। মঙ্গল হস্তী যে কখন কখন ভিক্ষুককেও রাজা করে; তাহার কারণ—তাহারই বলবৎ প্রাক্তন পৌরুষ[১৭]। কখন ঐহিক কর্ম্ম প্রবল হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে কখন বা প্রাক্তন কর্ম্ম প্রবল হইয়া ঐহিক পুরুষকারকে অভিভূত করে। সেই কারণেই বলি, সর্ব্বদা পৌরুষ বা অভিলষিত বিষয়ে যত্নাতিশয় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে পুরুষ যত্ন প্রকাশে অনলস, সেই পুরুষই জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়[১৮]।

* অমাত্যগণের চেষ্টা ও হস্তি প্রেরণাদি বিষয়ে উদ্যোগ না থাকিলে ভিক্ষুকপুত্র রাজা হইতে পারিত না। সুতরাং অমাত্যগণের পুরুষকার অর্থাৎ যত্ন ও উদ্যোগ ভিক্ষুক পুত্রের রাজ্য লাভের সহকারী কারণ, এবং ভিক্ষুকপুত্রের বলবৎ সুকৃত মুখ্য কারণ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পুরুষকার এমনি জিনিশ যে তাহা এক জনকে রাজা করিতে পারে।

যুবা যেমন বালককে অনায়াসে জয় করিতে পারে, তেমনি, বলবত্তর যত্নও দৈবকে জয় করিতে পারে। পূর্ব্বতন ও অদ্যতন দুএর মধ্যে অদ্যতনের বলবত্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ[১৯]। কৃষক এক বৎসর যত্ন করিয়া শস্য প্রস্তুত করে, কিন্তু মেঘাভিমানী পুরুষের প্রবল পৌরুষে তাহা এক দিনেই বিনষ্ট হইয়া যায়[২০]। অতএব, কৃষকের দৃষ্টান্তে, ক্রমোপার্জ্জিত অর্থ বিনষ্ট হইলে তাহাতে খেদ করা উচিত নহে। যখন তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আর তাহা পরিদেবনার বিষয় নহে[২১]। যাহা আমরা করিতে পারি না, যাহা আমাদের শক্তিবহির্ভূত, সাধ্যাতীত, তাহার জন্য দুঃখ করিতে হইলে মৃত্যুকে মারিতে পারিলাম না বলিয়া আমাদের প্রত্যহই দুঃখ ও রোদন করা উচিত[২২]। এ বিষয়ে অধিক কি বলিব, যে, যে বিষয়ে অধিক যত্নবান্ হয়, সে, সেই বিষয়ে জয় লাভ করিতে পারে। জগতের সমুদায় পদার্থই দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য অনুসারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়[২৩]। * অহে রাম! আমি সেই কারণেই বলিতেছি, পুরুষ সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধির নির্ম্মলতা সাধন পূর্ব্বক সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হউক[২৪]। পুরুষরূপ অরণ্যে পুরুষার্থরূপ-ফলের প্রাক্তন ও ঐহিক এই দুইটি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে যেটীর অধিক পরিচর্য্যা করিবে, অধিক যত্ন করিবে, সেইটীই পরিবর্দ্ধিত হইবে[২৫]। যে ব্যক্তি ঐহিক শুভ কর্ম্মের দ্বারা অতি তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পারে না, রামচন্দ্র! সে নিতান্ত অজ্ঞ ও পশুতুল্য। এই পশুতুল্য অজ্ঞ লোক আপনিই আপনার সুখ দুঃখের অনীশ্বর। অর্থাৎ ঈদৃশ লোক নিতান্তই আপনার দুঃখ পরিহারে ও সুখোৎপাদনে নিশ্চেষ্ট[২৬]। যে মনুষ্য, মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে, এই বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সেই মনুষ্য প্রকৃত পশু। অর্থাৎ পশুতুল্য পরাধীন[২৭]। কিন্তু যে উদারস্বভাব যত্নশীল সদাচাররত ও উদ্যমশীল, সেই মানব, সিংহ যেমন স্বীয় উদ্যমে পিঞ্জর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, সেইরূপ, এই জগন্মোহ হইতে অনায়াসে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে[২৮]। যে পুরুষ পুরুষকারের প্রভাব প্রত্যক্ষ

---

* যে দেশে যে কালে যে ক্রিয়ায় ও যে দ্রব্যে বিফলপ্রযত্ন হওয়া যায় সে দেশ সে কাল সে ক্রিয়া ও সে দ্রব্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তরাদি অবলম্বন কর্ত্তব্য। তাহারই নাম যত্নাধিক্য। বিশ্বামিত্র মুনি পূর্ব্বদিকে তপস্যার বিঘ্ন দেখিয়া উত্তরপ্রদেশে গিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

করিয়াও "দৈব আমাদিগকে সকল কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে, আমরা দৈব-বলেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করি" এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরুৎসাহ থাকে, সেই অধম পুরুষ দূরে পরিত্যাজ্য[২৯]। শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যবহার আমাদিগের নিকট আসিতেছে ও যাইতেছে। তত্তাবতে নিজ বুদ্ধি পরিচালন না করিয়া শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য[৩০]। যাহারা শাস্ত্রমর্য্যদা উল্লঙ্ঘন না করিয়া প্রযত্নতৎপর ও ব্যবহারশীল হয়, তাহাদের সমুদায় অভিলষিত স্বতঃই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। রত্ন রত্নাকরে স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তাহার অন্যথা হয় না[৩১]। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিহিত সুখদুঃখনিবৃত্তিজনক অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি যত্ন প্রকাশ করাকেই পুরুষকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৩২]। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য অগ্রে সৎশাস্ত্র আলোচনা ও সৎসঙ্গ অবলম্বন দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া লন, পরে তদ্দ্বারা সমুদয় দোষ নিরাকৃত করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিয়া থাকেন[৩৩]। হে মহাবাহু রাম! পণ্ডিতেরা অবগত আছেন যে, অজ্ঞানকৃত বৈষম্যনিবৃত্তির দ্বারা যে অপরিসীম আনন্দ লাভ হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই পরমার্থ এবং যদ্দ্বারা তাদৃশ পরমার্থ লাভ করা যায় তাহাই যথার্থ সৎশাস্ত্র। সেই সৎশাস্ত্র সাধুগণের অবশ্য-সেব্য[৩৪]। জীবগণ দেবলোক হইতে ইহলোকে আগমন করিয়া দেবলোক-ভুক্তাবশিষ্ট সুকৃতের ফল ভোগ করে, লোক সকল তাহাকেই দৈব শব্দে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং দৈব, প্রাক্তন পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৫]। মূর্খেরা যে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত দৈবকে নিন্দা করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে নিন্দা করা যায় না। যাহারা পুরুষকারকে অমান্য করিয়া কেবল দৈবকে মান্য করে, আমাদের মতে তাহারাই নিন্দনীয় এবং তাহারাই অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়[৩৬]। ইহা অবধারিত জানিবে যে, মনুষ্যজীব স্বীয় পুরুষকারের দ্বারাই লোকদ্বয়ের (ইহলোকের ও পরলোকের) হিত উৎপাদন করিয়া থাকে। পুরুষ যে পূর্ব্বে দেবলোক পাইয়াছিল, তাহাও তদীয় পুরুষকারের ফল। সেজন্যও বুঝা উচিত যে, যেমন পূর্ব্বদিবসীয় দুষ্ক্রিয়া এতদ্দিবসীয় সৎক্রিয়ায় (প্রায়শ্চিত্তে) বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, ঐহিক সৎক্রিয়াও পৌর্ব্বকালিক দুষ্ক্রিয়ার অবসাদ করিতে পারে[৩৭]।

অহে মহাবাহু রাম! যে পুরুষ স্বীয় পৌরুষে সৎকার্য্যে রত হয়, সে

পুরুষ সেই সেই ঐহিক কর্ম্মের দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্ম জয় করিয়া অবশেষে তাহার ফল করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু মূঢ়েরা সেই প্রত্যক্ষ ফল পরিত্যাগ করিয়া দৈবরূপ মোহে নিমগ্ন হয়[৩৮]। অতএব হে রাঘব! তুমি কারণ কার্য্য-পরিশূন্য অর্থাৎ প্রয়োজনরহিত ও অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা দৈব পরিত্যাগ করিয়া আপন শুভাশয়জনক পুরুষকারের আশ্রয় লও[৩৯]। বেদাদি শাস্ত্র ও সদাচার দ্বারা বিস্তৃত ও তত্ত্বদ্দেশবিনির্দ্দিষ্ট সদনুষ্ঠান ও নিয়মাদির দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, হৃদয়ে তাহার প্রস্ফুরণ হইলে প্রথমতঃ তৎসাধনেচ্ছা, তৎপরে তল্লাভের মানস, তৎপরে তদনুযায়িনী শারীর চেষ্টা (অনুষ্ঠান নির্ব্বাহক অঙ্গ পরিচালনা, যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহা) উৎপন্ন হয়। সাধুগণ এইরূপ চেষ্টাকেই পৌরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[৪০]। যত্নতৎপর হইয়া স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা ঐরূপ পুরুষার্থের ফল বোধগম্য করাই পুরুষত্ব এবং বিচার সহকারে সৎশাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুসঙ্গ অবলম্বন ও পণ্ডিতজনের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎশাস্ত্র অনুশীলনাদির দ্বারাই পুরুষকার সফল হইতে দেখা যায় এবং তাহারই দ্বারা পরমার্থলাভে সমর্থ হওয়া যায়[৪১]। দৈব ও পৌরুষের উক্তরূপ বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সরল ও সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিরা স্বীয় পুরুষকার দ্বারা অনায়াসে দৈবকে জয় করিতে পারেন। পুরুষকারের ঐরূপ প্রভাব বিদিত হইয়া শমদমাদিসাধনপটু ও তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী হইবার জন্য সাধুসঙ্গ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়[৪২]।

জীবগণ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক পৌরুষকেই অর্থ-সিদ্ধির উপায় বিবেচনা করিয়া সাধুসেবারূপ মহৌষধ সেবন পূর্ব্বক জন্মমরণপ্রবন্ধরূপ মহারোগের শান্তি করুক[৪৩]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! নর অল্পমনঃকষ্টবিশিষ্ট নির্ব্ব্যাধি দেহ লাভ করিয়া এরূপ চিত্তসমাধান করুক, যেন আর তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে না হয়[১]। * যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই বাঞ্ছিত লাভ করিতে সমর্থ[২]। যাহারা পুরুষকারে যত্ন প্রকাশ না করিয়া কেবল মাত্র দৈবাবলম্বী হয় তাহারা আপনার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমস্তই নষ্ট করে, করিয়া আত্মঘাত পাপে লিপ্ত হয়[৩]। পুরুষার্থ লাভের উপায় স্ফূর্ত্তি হওয়ার নাম. সম্বিৎস্পন্দ (তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাস)। পরে সাধনেচ্ছা বলবতী হওয়ার নাম মনঃস্পন্দ (দৃঢ় সংকল্প), তৎপরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রচলন হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়স্পন্দ। (কার্য্যপ্রবৃত্তি বা অনুষ্ঠান রত হওয়া) এতন্নিতয় পূর্ব্বোক্ত পুরুষকারের রূপ এবং এতদ্বিধ পুরুষকার হইতেই সংকল্পিত ফল 'উদয় প্রাপ্ত হয়[৪]। যেমন যেমন সম্বেদন (জ্ঞান বা বিষয় স্ফূর্ত্তি) হয়, মনঃও তেমনি তেমনি স্পন্দিত হয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও তদনুবর্ত্তী হইয়া সেই সেই কার্য্য করে। অনন্তর সে সকলের ফলও তদনুরূপ এবং তাহার ভোগও তদনুবর্ত্তী[৫]। বাল্যকালাবধি যত্নপূর্ব্বক যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করা যায়, সময়ে সেই বিষয়েরই ফল হইতে দেখা যায়। দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহ জন্মে পৌরুষই প্রত্যক্ষ সুতরাং শ্রেষ্ঠ[৬]।

মহাত্মা বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগণের গুরু হইয়াছেন এবং শুক্রাচার্য্যও দৈত্যদিগের আচার্য্য পদ লাভ করিয়াছেন[৭]। হে সাধু রামচন্দ্র! এ পর্য্যন্ত কত শত দীন দরিদ্র দুঃখী লোক পুরুষকার নামক প্রযত্নে (চেষ্টায়) ইন্দ্রতুল্য হইয়াছে এবং নীচ মনুষ্যেরাও নরোত্তম হইয়াছে[৮]। আবার নহুষ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা বিপুল বিভবের অধি-

---

* সমাধি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে যে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহারই মাহাত্ম্যে দেহনির্ব্ব্যাধি ও মনোবিকারের হ্রাস হইয়া থাকে। পরন্তু মন দেহাভিমান ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লেশ যুক্ত থাকে। সে ক্লেশ সমূলে উন্মূলিত হয় না। সেইজন্য "অল্পমনঃ কষ্ট" এইরূপ বলা হইয়াছে।

পতি হইয়াও স্বীয় পৌরুষ দোষে উৎকৃষ্ট পদ হইতে পরিভ্রষ্ট ও নরক-গামী হইয়াছিলেন[৯]। এই সংসারে অনেক শত বিভবশালী পুরুষ নিজ পৌরুষ দোষে দরিদ্র হইয়াছেন এবং অনেক শত দরিদ্রও উত্তম বিভবশালী হইয়াছেন[১০]।

অহে রাম! শাস্ত্রানুশীলন, গুরূপদেশ এবং স্বকীয় পরিশ্রম, এই তিনের দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। কিন্তু দৈবের দ্বারা কোথাও কিছু সিদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই[১১]। চিত্ত যদি অশুভমগ্ন হয়, তবে তাহাকে সেই সেই অশুভ হইতে বল পূর্ব্বক শুভ পথে নিয়োগ করিবেক। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিবেক। ঐরূপ করাই যথার্থ পুরুষকার এবং তাহাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য[১২]। বৎস! যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা অপায়বর্জ্জিত যাহা পরম সত্য, প্রযত্ন সহকারে তাহারই আহরণ কর, এইরূপ উপদেশ গুরুজন কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে[১৩]। বৎস রাম! আমি, যেরূপ যত্ন করিব, শীঘ্রই আমি সেইরূপ ফলই পাইব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি পৌরুষ প্রকাশের অনুরূপ ফল পাইয়াছি। দৈব হইতে আমার কিছুমাত্র লাভ হয় নাই[১৪]। পৌরুষ হইতেই পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে ও পৌরুষপ্রভাবেই বুদ্ধির পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে দেখা-গিয়াছে। দৈব কেবল দুঃখনিপতিত দুর্ব্বলচিত্ত দিগের আশ্বাসন কথা; অন্য কিছু নহে (দুঃখিত লোকদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য বা সান্ত্বনা করিবার জন্যই লোক সকল দৈব দৈব করিয়া থাকে)[১৫]। মানবগণ প্রত্যহই পুরুষকারের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতেছে। লোক যে ইচ্ছা মত দেশান্তরগমনাদি ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা পুরুষকারের প্রত্যক্ষ ফল[১৬]। যে ভোজন করে, সেই তৃপ্ত হয়। যে ভোজন না করে, সে তৃপ্ত হয় না। যে যায়, সে-ই গন্তব্য পায়। যে যায় না, সে পায় না। যে বক্তা, সে-ই বলে, এবং যে অবক্তা, সে বলে না। সুতরাং পুরুষকারই সফল[১৭]। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা স্বীয় পৌরুষের বলে অনায়াসে দুস্তর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু দৈবের ভরসায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে কদাচ সঙ্কটত্রাণ হয় না[১৮]। যে, যে পরিমাণে যত্ন করে, সে সেই পরিমাণে তাহার ফলভাগী হয়। পরন্তু নিশ্চেষ্ট (চুপ করিয়া) থাকিয়া যে কেহ কখন কোন কিছু পাইয়াছে, তাহা দৃষ্ট হয় না। নিশ্চেষ্ট থাকায় অল্পমাত্রও ফলোদয় হয় না[১৯]। বৎস রাম! শুভ পুরুষ-

কারের শুভ ফল ও অশুভ পুরুষকারের অশুভ ফল হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে[২০]। মনীষিগণ (মনীষিগণ=মননশীল বা মুনিগণ) দেশ ও কাল অনুসারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া কেহবা শীঘ্র কেহবা কিছু বিলম্বে যে ফল লাভ করেন, অজ্ঞ লোকেরা তাহাকেই দৈব বলে[২১]। কি ইহলোকে কি পরলোকে দৈবের প্রত্যক্ষতা কুত্রাপি নাই। স্বর্গলোকে যে স্বকৃত পুরুষকারের (কর্ম্মের) ফল ভোগ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈব আখ্যা প্রদান করেন[২২]। পুরুষ ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং জীর্ণও হইতেছে। তাহাতে যেমন জরা, যৌবন ও বাল্য, দৃষ্টিগোচর হয়, দৈব সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না[২৩]। অর্থপ্রাপক কার্য্য যে প্রযত্নে উত্তম্ভিত থাকে, যে উদ্যমে কার্য্যসাধক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পুরুষকার বলেন এবং তাদৃশ পুরুষকার দ্বারা ইহ-পরলোকে সমুদায় অভীষ্টই সিদ্ধ করিতে পারা যায়[২৪]। এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থান গ্রহণ, হস্তে দ্রব্য ধারণ, অঙ্গের পরিচালন, সমস্তই পুরুষকারের ফল; দৈবের নহে[২৫]। যদ্দ্বারা অনর্থাগম হয়, সেরূপ কার্য্যের প্রতি যে প্রযত্ন, সে প্রযত্ন পুরুষকার নহে। তাহা উন্মত্তচেষ্টা এবং তাহার দ্বারা কিছুমাত্র সুফল লাভ হয় না[২৬]। স্পন্দন বা পরিচলন-ঘটিত শারীরিক মানসিক ক্রিয়া যে আপন স্বার্থসাধন করে, অর্থাৎ বিশেষে বিশেষ ফল উৎপাদন করে, তাহা তাহার স্বভাব। পরন্তু বুদ্ধিমান্ নর সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা স্বীয় বুদ্ধি পরিমার্জ্জন করিয়া ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল উন্নত করিয়া থাকেন। যাহা আলোচনা করিলে, অজ্ঞানকৃত বৈষম্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অপরিসীম সুখ লাভ করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সৎশাস্ত্র বলেন এবং সাধুগণ প্রযত্ন সহকারে তাহারই সেবা করিয়া থাকেন[২৭।২৮]।

যেমন সরোবর ও সরোজ যথাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি, মতিমান্ লোক দিগেরও সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অভ্যাস থাকায় যোগ্য সময়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে[২৯]। বাল্যকাল হইতে নিরালস্য হইয়া যত্নসহকারে সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গাদি অভ্যাস করিলে অনায়াসে হিতকর স্বার্থসাধন হইতে পারে[৩০]। পরাৎপর ভগবান্ বিষ্ণু একমাত্র পুরুষকার দ্বারা দৈত্য দিগকে জয় করিয়াছিলেন, এবং এই অসীম জগৎ-

কার্য্য সংস্থাপন ও এই অনন্ত বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন[৩১]।

হে রঘুনাথ! তুমি চিরকাল এই পুরুষকারের প্রতি এরূপ যত্ন করিবে যে তরুতলগামী হইলে তত্রত্য সরীসৃপগণও যেন তোমাকে দংশন করিতে না পারে[৩২]। *

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

---

* সে পুরুষকার এক প্রকার যোগ এবং তাহা অহিংসা জয় হইতে উৎপন্ন হয়। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে এই যোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মুদ্রিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের ১০৮ পৃষ্ঠায় "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" সূত্র আছে, তাহার ব্যাখ্যা অবলোকন করুন।

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দৈব যে কি, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অথচ অজ্ঞ লোক দৈব দৈব করিয়া তটস্থের ন্যায় সশঙ্কিত হয়। * দৈবের কোন আকৃতি নাই, কর্ম্ম নাই, স্পন্দ নাই, পরাক্রমও নাই। তাহা কেবল মিথ্যা জ্ঞানের ন্যায় রূঢ়। অর্থাৎ কেবল মাত্র লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ[১]। বস্তুতঃ লোক সকল কর্ম্ম করিয়া ফল প্রাপ্ত হইলে পর, এই প্রকারে এই কার্য্য করিলে এই ফল হয়, এই যে পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান ও তদ্ঘটিত স্বকর্ম্মফলপ্রাপ্তিবিষয়ক বাক্য, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈব বলেন। তদ্ভিন্ন দৈব নাই। কিন্তু মূঢ়বুদ্ধি লোক অজ্ঞতানিবন্ধন দৈবতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, স্বতন্ত্র দৈব আছে বলিয়া বোধ করে। পরন্তু সে বোধ ভ্রান্তিগৃহীত রজ্জুসর্পের সমান[২।৩]। যেমন পূর্ব্ব দিনের দুক্রিয়া বিদ্যমান দিবসীয় শাস্ত্রীয় সৎকার্য্যে আবৃত হইয়া যায়, ঢাকিয়া যায়, তেমনি, প্রাক্তন কর্ম্মও ঐহিক পুরুষকারে অভিভূত হইবেই হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া তুমি যত্ন সহকারে সৎকার্য্যে রত হইবে[৪]। যে দুর্ম্মতি নর, মূঢ় দিগের অনুমান সিদ্ধ দৈবের বশীভূত হয়, সে দুর্ম্মতির "দৈব হয়-ত আমাকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিবেন" এইরূপ ভাবিয়া অগ্নিপ্রবেশ করা কর্ত্তব্য[৫]। দৈব যদি কর্ত্তাই হয়, তাহা হইলে পুরুষকারের (পুরুষীয় চেষ্টার) প্রয়োজন কি? দৈব তাহাদের স্নান, দান, ভোজন, মন্ত্রোচ্চারণ, সমস্তই করুক, সে নিশ্চেষ্ট থাকুক। কিন্তু কাহাকেও নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখা যায় না[৬]। শাস্ত্রই বা কেন? উপদেশ গ্রহণই বা কেন? দৈব তাহাদিগের জ্ঞান সঞ্চার করিবে, তাহারা নিরুদ্বেগে মূক হইয়া থাকুক[৭]। ইহলোকে এমন কি কেহ দেখিয়াছে যে, মৃত শরীর ব্যতীত জীবৎশরীর স্পন্দহীন হইয়া আছে? এ পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চেষ্ট জীবৎশরীর দেখেন নাই। যেহেতু দেখেন নাই, সেইহেতু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, চেষ্টাই জীবের ফলদাতা এবং দৈব কাহার কিছু করে না[৮]। দৈবের কোন

* ভিতরে কি, মূলে কি, তাহা দেখেনা, না দেখিয়া একে আর ভাবে ও একে আর বলে।

মূর্ত্তি নাই। সে যে মূর্ত্তিবিশেষ্টের সাহায্য করিবে, তাহা করিবে না। এ পর্য্যন্ত কোনও নর মিথ্যা পদার্থের সাহায্যকারিতা দৃষ্ট করেন নাই। সুতরাং দৈব কথাটাই বৃথা বা অর্থশূন্য[৯]। প্রণিধান সহকারে অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, কার্য্যের কারণ সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও হস্তপদাদি সঞ্চালন ব্যতিরেকে কার্য্য সমাধা হয় না। আরও দেখ, পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও বিনা অধ্যয়নে বিদ্বান্‌ ও লেখনী বিদ্যমান থাকিলেও হস্তের ব্যাপার ব্যতিরেকে লিপিকার্য্য সম্পন্ন হয় না। কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কি কেহ কখন কোনও কিছু করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে নাই[১০]। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, এ সকল যেমন অদৃশ্য হইলেও অনুভূতির গোচর হয়, দৈব সেরূপ অনুভূতির গোচর হয় না। কি গোপাল (রাখাল=যাহারা গরু চরায়) কি প্রাজ্ঞ কেহই দৈবকে বোধগম্য করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, দৈব নিতান্ত অসৎ অর্থাৎ নাই[১১]। যদি কল্পনার দ্বারাই দৈবের কর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে পুরুষকারের অপরাধ কি? পুরুষকারকেই কর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করিলে হানি কি?[১২] যেমন অমূর্ত্ত আকাশ মূর্ত্ত শরীরে অলিপ্ত, তেমনি, অমূর্ত্ত দৈবও অলিপ্ত জানিবে। মূর্ত্ত পদার্থ মাত্রেই পরস্পর সংলগ্ন থাকে ও তাহা দৃষ্ট হয়। অমূর্ত্ত কোন কিছুতে সংলগ্ন থাকে না, এবং দৃষ্টও হয় না। এ অনুসারেও অমূর্ত্ত দৈব কল্পিত বাক্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৩]। দৈবই যদি জগত্রয়স্থ জীবগণের নিয়োগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে জীবগণ "দৈবই সমুদায় করিবে" এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকুক এবং নিরন্তর শয়ন করিয়া থাকুক[১৪]। "আমি দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি" এ কথা কেবল মনকে আশ্বস্ত রাখিবার জন্য; তদ্ভিন্ন উহার অন্য কোন অর্থ নাই[১৫]। যাহারা যাহারা মূঢ়কল্পিত দৈবের একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে তাহারা তাহারাই বঞ্চিত হইয়াছে ও বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রাজ্ঞ লোকেরা পুরুষকারের প্রতি নির্ভর করিয়া উত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[১৬]। হে রামচন্দ্র! যাহারা শূর, বিক্রমশালী, যাহারা প্রজ্ঞাশালী, যাহারা পণ্ডিত, তাহাদের মধ্যে কে কবে দৈবের প্রতীক্ষা করিয়াছে?[১৭] যাঁহারা কাল গণনা করেন, ভাগ্য গণনা করেন, অর্থাৎ যাঁহারা গণক ও দৈবজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ,

তাঁহারা যাঁহাকে গণনার দ্বারা চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, মস্তক ছেদন করিলেও যদি তিনি চিরজীবী থাকেন, তাহা হইলে বলিব ও মানিব যে, দৈব পরম সৎ ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ। দৈবজ্ঞগণ বলিলেন বটে, এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে, কিন্তু সে যদি অধ্যয়ন না করিয়া পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই মানিব ও বিশ্বাস করিব, দৈব আছে ও দৈব সমধিক শক্তিমান্[১৮।১৯]। রাঘব! ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত মহর্ষি বিশ্বামিত্র দৈবচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পৌরুষ বলে ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন এবং আমরাও পৌরুষ প্রভাবে মহর্ষিত্ব ও আকাশগামিত্বাদি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি[২০।২১]। এইরূপ, দানবেরাও দৈবচিন্তাকে দূরীভূত করিয়া পুরুষকারের দ্বারা লোকত্রয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং দেবতারাও পুনঃ পৌরুষ বলে সেই সকল দানব দিগকে পরাভূত করিয়া সে সকল আত্মসাৎ করিয়াছিলেন[২২।২৩]। রাম! করণ্ডক (চুপড়ি) যে সলিল ধারণ করে, দৈব তাহার কারণ নহে। একমাত্র পুরুষকারই তাহার কারণ। পুরুষেরাই তাহা প্রস্তুত করে এবং মোম প্রভৃতির দ্বারা ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া তাহাকে জলধারণ যোগ্য করে[২৪]। পোষ্যবর্গের ভরণ, ধনোপার্জ্জন, পরপীড়ন প্রভৃতি কোনও বিষয়ে দৈবের ক্ষমতা নাই। রঘুপতে! তুমি মনঃকল্পিত দৈবকে উপেক্ষা করিয়া পরমশ্রেয়োজনক পুরুষকার অবলম্বন কর, করিলে অভিলষিত লাভে সমর্থ হইবে[২৫]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; এ নিমিত্ত আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি দৈব নিরর্থকই হয়, তবে লোকে দৈব দৈব করে কেন? লোকে যাহাকে দৈব বলে তাহা কি প্রকার?[১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! শ্রবণ কর। একমাত্র পুরুষকারই সমুদায় কার্য্যের কারণ এবং তাহারই প্রভাবে জীবগণ সর্ব্বপ্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৈব কোন কিছুর দাতা নহে, ভোক্তা নহে, কর্ত্তাও নহে। বিজ্ঞগণ দৈবকে ফলদাতা বলেন না এবং তাহা দেখাও যায় না। জ্ঞানিগণ দৈবের আদর করেন না এবং তাঁহারা জানেন, দৈব এক প্রকার কল্পনা, অন্য কিছু নহে[২।৩]। ফলপ্রদ পুরুষকারের সুপ্রয়োগে ও কুপ্রয়োগে যে শুভাশুভ ফলের উৎপত্তি হয়, অজ্ঞ লোকেরা তাহাকেই দৈব বলে[৪]। ইষ্টই হউক, আর অনিষ্টই হউক, সমস্তই পুরুষকারপ্রাপিত ও পুরুষকারপরিহাপিত (প্রাপিত=পাওয়া। পরিহাপিত=না পাওয়া); পরন্তু লোক সকল বুদ্ধি মোহবশতঃ উক্ত উভয় স্থলেই দৈবপ্রাপিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। (প্রথম ইষ্ট লাভ, পরে অনিষ্ট প্রাপ্তি অথবা প্রথম অনিষ্টাগম, পরে ইষ্ট প্রাপ্তি। এরূপ হইলেও লোকে সে ঘটনাকে দৈবমূলক বলে। বস্তুতঃ তাহাও দৈবমূলক নহে। তাহা পুরুষকারের অপরাধ অনপরাধ মূলক)[৫]। পুরুষকার প্রয়োগে যে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা প্রসূত হয় এবং অভাবনীয় ঘটনা বিঘটিত হয়, লোক মধ্যে তাহাই দৈব নামে প্রখ্যাত[৬]। হে রাঘব! দৈব আকাশরূপী। সেজন্য তাহা কোনও লোকের কোনও কিছু করে না[৭]। পুরুষকার সিদ্ধ হইলে যে শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহাকে প্রাক্তন ফলভোগ বলিয়া জানে এবং তাহাই তাহাদের দৈব[৮]। আমিও বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি যে, ঐরূপ স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগকেই লোকে দৈব বলিয়া মান্য করে[৯]। যাহা ইষ্ট অনিষ্ট ফল লাভের পুরুষকারাত্মক অদৃশ্যকারণ, "দৈব" শব্দ তাহারই বাচক। সুতরাং "দৈব" কথাটী আশ্বাসন বাক্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১০]।

রাম বলিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। আপনি এইমাত্র বলিলেন, প্রাক্তন কর্ম্মই দৈব; সুতরাং তাহা আছে। আবার বলিলেন, তাহা নাই। তাহা মিথ্যা বা বিভ্রমমাত্র। এরূপ বলিবার কারণ কি, অভিপ্রায় কি, তাহা আমাকে বলুন[১১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি যথার্থই সাধু। যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি সবিস্তরে বলি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে, দৈব যে নাই, তাহা তুমি নিশ্চয়রূপে জানিতে বা বুঝিতে পারিবে[১২]। মনুষ্যের মনোমধ্যে যখন যেরূপ বাসনা সমুদিত হয়, মানুষ তখনই তাহারই অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। মনোভাব এক প্রকার, কর্ম্ম করে অন্য প্রকার, এরূপ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যের অন্তঃস্থ বাসনাই বাহিরে কর্ম্মরূপে পরিণত হয়[১৩।১৪]। যে গ্রাম গমনে ইচ্ছুক সে গ্রামে গমন করে এবং নগর গমনে ইচ্ছুক সে নগরে গমন করে। অধিক কি বলিব, যে যেরূপ বাসনাবিশিষ্ট সে সেইরূপ চেষ্টা করে, পরে তদনুরূপ ফলও পায়[১৫]। এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, বাসনা কি? কেনই বা বাসনার আবেশ হয়? অপিচ, কেনই বা বিনা বাসনায় কার্য্য প্রবৃত্তি হয় না? এই বিষয়টী এইরূপে দিব্যজ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে যে, পূর্ব্ব দেহে অত্যন্ত মনোবেগের সহিত যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই সমস্তের দুর্লক্ষ্য সংস্কারই এতদ্দেহে বাসনা ও দৈব নামে প্রখ্যাত হইয়াছে[১৬]। কর্ম্মকর্ত্তার সমুদায় কর্ম্মই উক্ত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার সেই সকল কর্ম্ম উপচিত (পরিপুষ্ট) হইয়া অবসানে বাসনাবশেষিত অর্থাৎ বাসনায় পরিণত হয়। এই বাসনা স্বীয় আধার মনের সহিত অভিন্ন সুতরাং তন্নিকটস্থ পুরুষের (আত্মার) সহিতও অভিন্ন। এখন বিবেচনা কর, ভাবিয়া দেখ, লোকে যাহাকে দৈব বলে, তাহা কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, একথা সত্য কি না। মন পূর্ব্বোপার্জ্জিত সংস্কারীভূত কর্ম্মের (যে সকল কর্ম্ম সংস্কার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার) আধার; সেজন্য তাহা মন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অপিচ, যে মন, সে-ই পুরুষ, সুতরাং পুরুষ ও পুরুষকার (কর্ম্ম), এই দুই ব্যতীত অন্য দৈব নাই[১৭।১৮]। জীবগণের তাদৃশ মন (বাসনাবিশিষ্ট মন) সেই সেই বাঞ্ছ বিষয়ে (যে যে বিষয়ে বাসনা জন্মে সেই সেই বিষয় বাঞ্ছ) প্রধাবিত হয়, অনন্তর তৎপ্রাপ্তির

অন্য যত্ন করে, অঙ্গ পরিচালনাদি করে, পরে আবার সেই সেই ফল পায়। সুতরাং জীব কর্ম্মের দ্বারাই ফল পায়, তদ্বিষয়ে মিথ্যা দৈবের কর্তৃত্ব নাই[১৯]। সাধুগণ দুর্নিরূপ্য (কষ্টে যাহার স্বরূপ বুঝিতে হয় তাদৃশ) মনের চিন্ত, বাসনা, কর্ম্ম, দৈব, এই কয়েকটী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন[২০]। পুরুষগণ দৃঢ় ভাবনার প্রেরণায় প্রযত্ন সহকারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেইরূপ ফলই পাইয়া থাকেন। হে রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক। জীবগণ কথিত প্রকারেই কেবল মাত্র পুরুকার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ফল লাভ করিয়া থাকে, এবং তাহাতে অন্য কোন প্রকার পদার্থের কর্তৃত্ব বিদ্যমান নাই[২১।২২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! আমার প্রাক্তন বাসনাজাল আমাকে যে ভাবে নিযুক্ত করিতেছে, নিয়োগ করিতেছে, আমাকে সেই ভাবেই নিয়োজিত থাকিতে হইবে। তজ্জন্য বৃথা দুঃখ করার ফল নাই?[২৩]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি প্রযত্ন সহকারে পুরুষকার অবলম্বন কর। করিলে পরম শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই[২৪]। রঘুনাথ! জীবের বাসনা দুই প্রকার। শুভ ও অশুভ। তাহাও দুই প্রকার। এক প্রকারকে প্রাক্তন বলে, অন্য প্রকারকে অদ্যতন বলে[২৫]। যাহা এতজ্জন্মকৃত তাহা অদ্যতন নামে প্রসিদ্ধ। তুমি ইহজন্মকৃত বিশুদ্ধ শুভদায়িনী বাসনা উৎপাদনের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ শুভ ফল লাভ করিতে পারিবে[২৬]। যদি কোন প্রাক্তন অশুভ ভাব (বাসনা) তোমাকে মহাসঙ্কটে নিপাতিত করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় করিবে[২৭]। রাম! তুমি প্রাজ্ঞ ও কেবল চৈতন্য। এই জড়াত্মক দেহ তুমি নহ। যদি তোমা ভিন্ন অন্য কোন চেতন থাকে, তাহা হইলে সে চেতনা কাহার?[২৮] যদি অন্য কোন চেতন তোমাকে চেতিত করিতেছে বল, তাহা হইলে তাহার চেতয়িতা কে? তাহাও বলা আবশ্যক হইবে। তাহারও চেতয়িতা অন্য চেতন, এরূপ বলিলে তদুপরি আমরা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিব যে, সে চেতয়িতার চেতয়িতা কে? দেখিবে, ঐরূপ ক্রমপরম্পরা অনবস্থা দোষগ্রস্থ; সুতরাং ঐরূপ ক্রমপ্রশ্ন পরিত্যাজ্য। সিদ্ধান্ত—তুমিই চেতন, অন্য চেতন নাই[২৯]। রাঘব! জীবের বাসনা একপ্রকার শ্রোতস্বিনীর অনুরূপা। তাহা সৎ অসৎ উভয় পথেই প্রবাহিতা হইতেছে। পরন্তু তুমি তাহাকে ‘পুরুষ-

কার দ্বারা সৎপথে প্রবাহিতা করাও[৩০]। হে রঘুবীর! যখনই দেখিবে, বাসনা নদী অশুভ পথে যাইবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই তাহাকে পুরুষকার দ্বারা বলপূর্ব্বক শুভ পথে ফিরাইয়া আনিবে। অশুভ পথ হইতে ফিরাইতে পারিলেই সে আপনা হইতে শুভ পথে প্রবাহিতা হইবে। প্রত্যেক পুরুষেরই চিত্ত শিশুর সমান। যে দিকে ফিরাইবে সেই দিকেই ফিরিবে। সহজে না ফেরে ত বলপূর্ব্বক ফিরাইবে[৩১।৩২]। যেমন বালককে হঠাৎ অবরুদ্ধ করা সঙ্গত নহে, তেমনি, চিত্ত বালককেও সহসা রুদ্ধ করা ন্যায্য নহে। তাহাকে ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, সান্ত্ববাদ ও পুরুষকার প্রয়োগে সৎপথগামী করিবে। যদিও তুমি পূর্ব্ব দেহে শুভ ও অশুভ বাসনা অধিক সঞ্চয় করিয়া থাক, তথাপি তাহা লক্ষ্য করিবে না, না করিয়া বর্ত্তমানে যাহাতে শুভ বাসনা নিবিড় ও প্রবল হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। (যোগাভ্যাসাদির দ্বারা সমুদায় বাসনা জয় করিয়া শুভ বাসনা প্রবল করিবার চেষ্টা করিবে)[৩৩।৩৪]। হে শত্রু-নাশন রাম! বাসনাভ্যাস বিফল হইবার নহে। মনে কর, পূর্ব্বে যে বাসনা উৎপাদন করিয়াছিলে এখন তাহা প্রবল বেগে দেখা দিতেছে। সেইরূপ, শুভ বাসনা বিষয়ক ঐহিক অভ্যাসের ফলও অচিরাৎ দেখিতে পাইবে[৩৫]। বিষাদ কি? বিষাদ কর্ত্তব্য নহে। এখনও অভ্যাস করিলে নিবিড় শুভ বাসনা উৎপাদিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমুদায় দুর্ব্বাসনা অভিভূত হইতে পারে। হে অনঘ! হে নিষ্পাপ রাম! তোমার শুভ হউক, তুমি শুভ বাসনা আকর্ষণ কর[৩৬]। যদি এমন সন্দেহ হয় যে, আমার পূর্ব্বকৃত দুর্ব্বাসনা বলবতী আছে; তথাপি, তজ্জন্য বিষণ্ণ হওয়া উচিত নহে। এখনও অভ্যাস ও যত্ন করিলে তাহা আর বৃদ্ধি পাইবে না; অধিকন্তু তাহা অল্পে অল্পে ক্ষীণা হইয়া আসিবে[৩৭]। সন্দেহ থাকিলেও শুভ বাসনা উৎপাদনার্থ যত্নবান্ হইবে এবং শুভ বাসনা প্রবৃদ্ধ করিয়া অশুভ বাসনা দূরীভূত করিবে[৩৮]। যে, যে বিষয় উত্তমরূপে অভ্যস্ত করে সে তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। এ নিয়ম বা এ তথ্য এই জীবলোকে বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই অবগত আছেন[৩৯]।

হে রঘুনাথ! তুমি শুভবাসনাসম্ভূত পরম সুখ সংসাধনার্থ (পাইবার জন্য) ইন্দ্রিয়গণকে জয় কর, যৎপরোনাস্তি পুরুষকার আশ্রয় কর, ও

উৎকৃষ্ট উদ্যম অবলম্বন কর। যাবৎ না তোমার মন পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, তাবৎ তুমি গুরুশুশ্রূষা, সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অভ্যাসে তৎপর থাকিও[৪০।৪১]। যখন দেখিবে, রাগদ্বেষাদি চিত্তমল পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, আত্মবস্তু বিখ্যাত (জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত) হইয়াছে, তখন তুমি বিগত-মনোজ্বর অর্থাৎ উদ্বেগশূন্য হইয়া শুভ বাসনা পরিত্যাগ করিবে[৪২]। হে সৌম্য! যাহা যৎপরোনাস্তি সুন্দর, প্রিয়, আর্য্যজনসেবিত ও বিশুদ্ধ, তুমি শুভবাসনাসমুদ্ভূত বুদ্ধির দ্বারা তাহারই অনুসরণ কর এবং তাহারই দ্বারা শোকবর্জ্জিত পরম পদ প্রাপ্ত হও। আগে মদুক্ত জ্ঞান পথ জয় কর, পরে তুমি শুভবাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ অবলম্বন করিও[৪৩]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! ব্রহ্মতত্ত্ব স্বপ্রকাশ ও তাহা সচ্চিদানন্দরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাঁহার সেই অব্যভিচারিণী সত্তা সমুদায় পদার্থে অবভাসমানা। সেই সত্তা ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধীয় উল্লেখে নিয়তি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকে যাহাকে ভবিতব্য বলে, তাহারই অন্য নাম নিয়তি। এই নিয়তিই কারণের কারণত্ব এবং কার্য্যেরও কার্য্যত্ব[১]। * অতএব, তুমি শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত পুরুষকার আশ্রয় কর। যাবৎ না মুক্তি হয় তাবৎ তুমি নিত্য বান্ধব চিত্তকে সুস্থির কর, করিয়া আমি যাহা বলি তাহা সাবধানে শ্রবণ কর[২]। নিতান্ত নিপতনশীল ইন্দ্রিয় সকল মনোরথে আরোহণ করিয়া প্রবল বেগে নিরন্তর ধাবমান হইতেছে। † প্রথম প্রযত্নে তুমি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সংযত কর[৩]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় পুরুষার্থফলপ্রদায়িনী মোক্ষোপায়ময়ী বেদ সার-সংহিতা কীর্ত্তন করি, তুমি তাহা স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর[৪]। ইহা শ্রবণ করিলে তুমি সুখ দুঃখ দূরীভূত করিয়া পরলোকে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে। উদারবুদ্ধি লোক পুনর্জ্জন্মনিবারণের নিমিত্ত এই পরম সংহিতা শ্রবণ করতঃ সংসারবাসনা দূরীকৃত করিয়া সম্পূর্ণ শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন[৫]। সেই কারণেই বলিতেছি, তুমিও বেদের পূর্ব্বাপর বাক্য সকল (পূর্ব্ব বাক্য কর্ম্মকাণ্ডীয় কথা। অপর বাক্য উপাসনাকাণ্ডীয় শ্রুতি। সে সকলের

---

* অস্তি অর্থাৎ আছে, এই ভাব সত্তা নামে প্রথিত। ইহাকে ভূতকাল ঘটিত করিয়া বুঝাইতে হইলে "ছিল" এবং ভবিষ্যৎ কাল ঘটিত করিয়া বলিতে হইলে "হইবে" এইরূপ বলিতে হয়। যাহা ভবিষ্যৎকালপ্রথিত সত্তা তাহারই নিয়তি ও ভবিতব্য এই দুই নাম প্রসিদ্ধ; পরন্তু কারণত্ব ও কার্য্যত্ব এই দুই নামও তৎপর্য্যবসায়ী। পূর্ব্বকাল উল্লেখিনী সত্তা কারণ এবং বর্ত্তমানাদি উল্লেখনী সত্তা কার্য্য। ফল কথা—সমস্ত সত্যই ব্রহ্মসত্তার অধীন। তদতিরিক্ত সত্তা নাই। সুতরাং যাহা নিয়তি বা ভবিতব্য, তাহাও তোমার অধীন।

† প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আপন আপন বিষয়ে তৃষ্ণাপূর্ব্বক প্রধাবিত হয়, হইয়া জীবকে ঐহিক সুখে ও স্বর্গাদি সুখে পাতিত বা নিমজ্জিত করে। সেইজন্য, মুক্তি লাভের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে মনোরথারূঢ় না হয় তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ করা বা সেইরূপ প্রযত্ন বেদান্তাদি শাস্ত্রে শম দমাদি নামে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য্য অনুসন্ধান কর)। বিচার কর এবং চিত্তকে সমরসী অর্থাৎ অদ্বয়ব্রহ্মরত করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধান কর[৬]। বিবেকিগণ যে মোক্ষকথা শ্রবণ করিয়া সকল দুঃখ হইতে শান্তি লাভ করেন, আমি তোমাকে সেই মোক্ষকথা বলিতেছি, তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সর্ব্বদুঃখবিনাশকারিণী ও বুদ্ধিসমাশ্বাস-দায়িনী মোক্ষকথা বলিয়াছিলেন[৭।৯]।

রামচন্দ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু কি কারণে এই তত্ত্বজ্ঞানকথা কহিয়াছিলেন এবং আপনিই বা কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। সমুদায় মায়িক পদার্থের (জগতের) আধার সর্ব্বগামী, সর্ব্বান্তর্গামী, অবিনশ্বর, চিদাকাশরূপী, একাদ্বয় আত্মা আছেন। তিনিই বিদ্যমান জীবনিবহে আত্মা-আখ্যায় প্রদীপের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন[১১]। সেই আত্মা কি স্থির কি অস্থির (কি স্থাবর কি জঙ্গম) সর্ব্বত্রই সমান অর্থাৎ বিকারশূন্য, একরূপ একরস। এই চিন্ময় বা চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে সাগর হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর অর্থাৎ সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল[১২]। এই বিরাট পুরুষের হৃদ্পদ্ম হইতে, মতান্তরে নাভিপদ্ম হইতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) জন্ম হয়। কনকাচল সুমেরু সেই পদ্মের কর্ণিকা, দিক্ সকল তাহার দল এবং গ্রহ নক্ষত্র তারকাদি তাহার কেশর[১৩]। হে রঘুবীর! বেদবেদাঙ্গবিৎ ও দেবমুনিপূজিত বিষ্ণুর হৃদ্কমলোৎপন্ন সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা মনের মনোরথ সৃজনের ন্যায় এই সমুদায় ভূত সৃজন করিয়াছেন[১৪]। এই জম্বুদ্বীপ তদীয় সৃষ্টির এক পার্শ্বস্থ এবং জম্বুদ্বীপের এক কোণে এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ। তিনিই এই ভারতবর্ষে আধি ব্যাধি জরা পরিপ্লুত প্রাণীসমূহ সৃজন করিয়াছেন[১৫]। অনন্তর তিনি দেখিলেন, স্বসৃষ্ট জীবসমূহের মন ভাবে ও অভাবে অর্থাৎ লাভে ও অলাভে বিষণ্ণ, নানা প্রকার উৎপাতে প্রপীড়িত, তাহারা জন্মমরণগ্রস্ত, অল্পায়ু, ভোগবাসনাজনিত ব্যসনে (বৃথা চেষ্টায়) সমাসক্ত ও তজ্জনিত দুঃখে অতীব কাতর[১৬]।

অনন্তর প্রাণিনিকরের তাদৃশ দুর্দ্দশা ও কাতরতা দেখিয়া, পিতা যেরূপ পুত্রের দুঃখ দর্শনে কাতর হন, সেইরূপ, তিনিও জনসঙ্ঘের

দুঃখ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত, কাতর ও করুণাপরবশ হইলেন[১৭]। অনন্তর ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই অজ্ঞান উপায়বিহীন দুঃখপরিপ্লুত সন্তানগণের দুঃখমোচনের উপায় কি?[১৮]

ক্ষণকাল ঐরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া ভগবান্ বিধাতা লোকসকলের হিতার্থে তাহাদের দুঃখবিমোচনার্থ তপস্যা, ধর্ম্ম (যজ্ঞ যাগ), দান, সত্য ও তীর্থ, এই কয়েকটীর সৃষ্টি করিলেন[১৯]। তৎপরে সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, কেবল ঐ কএকটীর দ্বারা স্বসৃষ্ট জীবের সম্পূর্ণরূপে দুঃখবিমোচন হইবার সম্ভাবনা নাই[২০]। জীব যাহাতে নির্ব্বাণ-নামধেয় পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে, যাহা পাইলে আর জন্ম মরণ ভোগ হইবে না, তাহা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত অন্য উপায়ের লভ্য নহে[২১]। একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সংসারদুঃখসন্তপ্ত জীবের উদ্ধারের উপায়। আত্মতত্ত্বজ্ঞান যেরূপ উপায়, তপোদান তীর্থ প্রভৃতি সেরূপ উপায় নহে[২২]। অতএব, এই সকল নষ্টচেতন মন্দাত্মা জনগণের সমুদায় দুঃখের বিমোচনার্থ বা সংসারক্লেশের নিবারণার্থ শীঘ্রই আমি এক অভিনব দৃঢ় উপায় প্রকট করিব[২৩]। ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অবশেষে আমাকে সৃষ্টি করিলেন[২৪]। হে অনঘ! যেমন এক জলতরঙ্গ হইতে অন্য জলতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তেমনি, আমিও তদীয় অনির্ব্বচনীয় মায়ার প্রভাবে উৎপন্ন হইলাম এবং সেই মুহূর্ত্তেই পিতার সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমিও পিতার ন্যায় কমণ্ডলু ও অক্ষমালা ধারণ ও মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক কমণ্ডলুকর অক্ষমালাধারী ও মৃগচর্ম্মপরিধায়ী পিতার চরণপ্রান্তে গমন করিয়া অবনত শিরে তদীয় চরণে অভিবাদন করিলাম[২৫।২৬]। তিনিও মৎকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া আমাকে পুত্র! আগমন কর, এইরূপ সস্নেহ ও সাদর বাক্যে আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় হস্তে মদীয় হস্ত ধারণ করিয়া স্বকীয় সত্যাখ্য * পদ্মের উত্তর দলে শুভ্রমেঘে শীতাংশুর ন্যায় আমাকে উপবেশন করাইলেন[২৭]। অনন্তর মৃগচর্ম্মপরিধায়ী পিতা মৃগচর্ম্মপরিধায়ী আমাকে রাজহংস যেমন সারস পক্ষীকে সম্বোধন সহকারে কোন কিছু বলে, তেমনি বলিতে লাগিলেন[২৮]। বলিলেন, পুত্র! শশধর যেরূপ

* সত্যাখ্য দল। ব্রহ্মা যে পদ্মে উপবিষ্ট ছিলেন সেই পদ্মের প্রধান দল (পাবড়ি) সত্য নামে প্রসিদ্ধ।

শশলাঞ্ছন দ্বারা কলঙ্কিত, সেইরূপ, তোমার চিত্তচন্দ্রও অজ্ঞানতার দ্বারা কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত কলঙ্কিত হউক[২৯]।

আমি পিতা কর্তৃক ঐরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই আত্মবিস্মৃত হইলাম অর্থাৎ যাহা আমার পূর্ব্বরূপ, প্রকৃতরূপ, তাহা ভুলিয়া গেলাম। সুতরাং সংসারভ্রান্তি আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল[৩০]। * তদবধি আমি বর্ণিতপ্রকারে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ও তন্নিবন্ধন ক্ষীণবল জনগণের ন্যায় দুঃখশোকে সমাক্রান্ত হইয়া দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলাম[৩১]। ভাবিতে লাগিলাম, এই কঠোরতর সংসারযন্ত্রণা কোথা হইতে ও কি প্রকারে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল! আমি নিরন্তর ঐরূপ চিন্তা করি ও সর্ব্বদা মৌন হইয়াই থাকি, পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল থাকিল না[৩২]। পিতা আমাকে সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া এক দিন বলিলেন, পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত দুঃখিত হইতেছ? দুঃখশান্তির উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা কর, † করিলে তোমার সমুদায় দুঃখ দূরীভূত হইবে, তখন তুমি অতুল সুখের পাত্র হইবে[৩৩]।

রামচন্দ্র! অনন্তর আমি তদীয় পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতাকে সংসাররূপ মহাব্যাধির ঔষধ জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, নাথ! জীবের ঈদৃশ দুঃসহ সংসার যন্ত্রণা কোথা হইতে আগত হইয়াছে, এবং কি প্রকারেই বা তাহার শান্তি হইতে পারে, তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন[৩৪।৩৫]।

অনন্তর পিতা কমলযোনি মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পরমপাবন মহৎ জ্ঞান বহুপ্রকার করিয়া আমাকে বলিলেন, অনন্তর আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভে পিতা অপেক্ষাও অধিক নির্ম্মল বোধরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম[৩৬]। অনন্তর আমার উপদেষ্টা ও জগৎকর্ত্তা পিতা আমাকে বিদিতবেদ্য দেখিয়া বলিলেন, পুত্র! আমি তোমারই মঙ্গলার্থ তোমাকে শাপ প্রদান দ্বারা অজ্ঞানগ্রস্ত করিয়া জিজ্ঞাসু করিয়াছিলাম। তোমাকে কথিত প্রকারে

* ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আত্মভ্রান্তি হইলে সংসার দর্শন ও আত্মভ্রান্তি বিদূরিত হইলে সংসার ত্যাগ নামক মোক্ষ হইয়া থাকে। অপিচ, উপদেশ সকল অজ্ঞানীর জন্য, জ্ঞানীর জন্য নহে।

† জিজ্ঞাসু না হইলে তাহাকে উপদেশ দিতে নাই। দিলে উপদেশ ব্যর্থ হয়। যে জিজ্ঞাসু, সেই শিষ্যই উপদেশের পাত্র বা অধিকারী। এই তথ্য প্রচারার্থ "জিজ্ঞাসা কর" এই অংশ কথিত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু করিবার অভিপ্রায় এই যে, তুমি জিজ্ঞাসু হইলে সমুদায় লোক তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু হইবে ও জ্ঞানসার উপদেশ নিচয় শুনিবার অধিকারী হইবে। এখন তুমি শাপ মুক্ত হইয়াছ ও বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। মালিন্যপ্রাপ্ত কনক যেমন মালিন্য পরিহারে যে কনক সেই কনকই হয়, তেমনি, তুমিও অজ্ঞানমালিন্য পরিহারে আমার ন্যায় একাত্মমাত্র হইয়াছ[৩৭।৩৯]। হে সাধো! এখন তুমি লোকহিতার্থে মহীপৃষ্ঠস্থ ভারতবর্ষে গমন কর[৪০]। পুত্র! ভারতবর্ষস্থ জনগণ স্বকুশল কামনায় ক্রিয়াকাণ্ডপর হইয়া আছে। তাহারা ক্রমেই বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য লাভ করিতেছে। তুমি সেই সকল অধিকারী জীব দিগকে ক্রিয়াকাণ্ডক্রমে, ক্রমশালী আত্মজ্ঞান * উপদেশ করিবে[৪১]। যাহারা সংসারবিরক্ত, মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচারপরায়ণ, তাহারাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। অতএব, তাহাদিগকেই তুমি আনন্দবিধায়ক পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর[৪২]।

রামচন্দ্র! আমি সেই ভগবান্ কমলযোনি পিতৃদেবের আজ্ঞায় তদবধি জ্ঞানোপদেশ প্রদানার্থ উপস্থিত আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকিব। এই সংসারে যত কাল উপদেশ যোগ্য লোক থাকিবে তত কালই আমাকে থাকিতে হইবে[৪৩]।

রামচন্দ্র! এই পৃথিবীতে আমার নিজের কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই; পরন্তু প্রোক্তকারণে থাকিতে হইয়াছে। যদিও প্রোক্তকারণে আমি পৃ[illegible] আছি সত্য; পরন্তু মন অতিক্রম করিয়া আছি। যদ্রূপ [illegible] বুদ্ধি বিষয়াভিমান শূন্যা হইয়া থাকে, সেইরূপ, আমিও নি[illegible] চিন্তায় উপস্থিত কার্য্যের অনুগামী হই। অজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে আমার কর্ম্ম প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ আমি কিছুই করিতেছি না। ঈশ্বরাজ্ঞা প্রতিপালন জন্য আমি প্রশান্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে অনাসক্তচিত্তে কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। ফলতঃ আমি কিছুই করি না। কারণ—আমি নিষ্কাম[৪৪]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

---

* সাধন বল না থাকিলে শত উপদেশ শুনিলেও আত্মজ্ঞান জন্মে না। সেই কারণে [illegible] হইল, ক্রমশালী। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ক্রমানুসারেই উৎপন্ন হয়। আগে ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত থাকিয়া বুদ্ধিদোষ মার্জ্জন করিতে হয়, পরে উপদেশ শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইতে হয়।

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবান্ কমলোদ্ভবের চেষ্টা, আমার জন্ম-বৃত্তান্ত ও যে প্রকারে পৃথিবীতে জ্ঞানের অবতরণ হইয়াছে, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিলাম; তুমিও শ্রবণ করিলে। হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র! আজ যে তোমার সেই ব্রহ্মপ্রোক্ত পরম জ্ঞান শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠা হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা তোমার মহাসুকৃতের ফল। বিশেষ সুকৃত (পুণ্য) না থাকিলে এরূপ জ্ঞানশ্রবণস্পৃহা হয় না[২]।

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, ব্রহ্মন্! লোকসৃষ্টির পরে লোকপিতামহ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার বুদ্ধি বা মতি কি নিমিত্ত জ্ঞানাবতরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিল? তাহা আমাকে পুনর্ব্বার বলুন[৩]।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন। সেই ক্রিয়াশক্তিপ্রচুর মদীয় পিতা ব্রহ্মা স্বভাবের বশে অর্থাৎ প্রাক্তন জ্ঞান কর্ম্মের প্রভাবে স্বয়ম্ভূরূপে সমুদ্রে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় পরব্রহ্মেই সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন[৪]। তিনি ভুবন ও ভুবনবাসী জীব সৃষ্টি করার পর দেখিলেন, স্বসৃষ্ট জীব নিবহ আত্ম-জ্ঞানাভাবে আতুর অর্থাৎ জন্ম জরা মরণ ও নরকগতি প্রভৃতিতে নিতান্ত কাতর। এমন কি, সেই পরাৎপর পুরুষ তাহাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়বর্ত্তিনী সুগতি ও দুর্গতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন[৫]। দেখিলেন, ক্রিয়াক্রমের অর্থাৎ স্বর্গ অপবর্গের উপায় অনুষ্ঠানের যোগ্য কাল সত্যাদি যুগ ক্ষয় হইলে লোক সমূহের মোহ বৃদ্ধি হইবে ও তজ্জনিত নরকপাত অনিবার্য্য হইবে। এই পর্য্যালোচনার পর তিনি যার পর নাই করুণাযুক্ত হইলেন[৬]। অনন্তর সেই প্রভু আমাকে সৃজন ও বার বার উপদেশ করিয়া জ্ঞানযুক্ত করিলেন। পরে অজ্ঞানগ্রস্ত জীবগণের অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত আমাকে এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন[৭]। আমি যেমন লোকের অজ্ঞান নিবারণার্থ তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, এইরূপ, সনৎকুমার ও নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণকেও তিনি জনগণের মোহশান্তির নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন[৮]। আমরা সকলেই কর্ম্মের ও উপাসনাদির ক্রম নিয়ম ও প্রণালী উপদেশ করিয়া মোহরোগাক্রান্ত

জনগণের উদ্ধারার্থ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি[৯]। ইতিপূর্ব্বে সত্য-যুগ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ ক্রিয়াক্রম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মসমূহ ও রাগ লোভাদির দ্বারা কলুষিত নহে, এরূপ অন্যান্য বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ অল্পে অল্পে ক্ষয় প্রাপ্ত অর্থাৎ লুপ্ত প্রায় হওয়ায় ভগবৎপ্রেরিত সেই সেই মহর্ষিরা সে সকলের পুনঃপ্রবর্ত্তনার্থ ও ধর্ম্মমর্য্যাদাস্থাপনার্থ পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ রাজা কল্পনা (স্থাপনা) করেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের শাসনাধীন প্রজার ধর্ম্মনিয়ম সংস্থাপনার্থ অনেকানেক বেদমূলক ধর্ম্মসংহিতাও প্রচার করেন[১০।১১]। এইরূপ ক্রমেই এই পৃথিবীতে ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তির উপায়ীভূত সেই সেই ঋষি কর্ত্তৃক উচিতরূপে প্রণীত নানা প্রকার স্মৃতিশাস্ত্র ও শ্রৌতকর্ম্মের শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে[১২]। হে রামচন্দ্র! অনিবার্য্য কালচক্রের পরিবর্ত্তনে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ লুপ্তপ্রায় হইলে লোক সকল ভোগাভিলাষে ও ভোগনির্ব্বাহক ধনাদি উপার্জ্জনে ব্যগ্র হওয়ায় রাজগণের মধ্যে ধনাদির নিমিত্ত নানাপ্রকার বাদ বিসম্বাদ ও তন্নিবন্ধন শক্রতা হইতে লাগিল। এই সময় প্রজাবর্গের মধ্যেও নানাপ্রকার রাজপীড়া ঘটিতে লাগিল[১৩।১৪]। অপিচ, এই দুর্ঘটনার সময় ভূপালগণ বিনা যুদ্ধে পৃথিবী পরিপালনে সমর্থ হন নাই। সুতরাং প্রজাগণের সহিত তাঁহারা সকলেই দৈন্যদশাগ্রস্ত ও অধিকতর দুখাভিভূত হইয়াছিলেন[১৫]। এ দিকে আমরাও তাহাদের সেই সেই অজ্ঞতানিবন্ধন সংসার দুঃখের অবসানার্থ ও জ্ঞাননিয়ম প্রচারার্থ অশেষবিধ জ্ঞান-শাস্ত্র প্রকটন করিলাম[১৬]। হে রাঘব! অধ্যাত্মবিদ্যা পূর্ব্বে রাজাদিগের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া রাজবিদ্যা নামে প্রথিত হইয়াছে[১৭]। রাজবিদ্যা রাজাদিগের গোপনীয় বস্তু। পূর্ব্বে রাজারা উক্ত রাজগুহ্য অত্যুত্তম অধ্যাত্মবিজ্ঞান জ্ঞাত হইয়া সংসার দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন[১৮]। রাম! সেই সকল অতুলকীর্ত্তি রাজন্যগণ এক্ষণে নাই। অনেক দিন হইল, তাঁহারা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তৎপরে তুমি এই পৃথিবীতে মহারাজ দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ[১৯]। হে শক্রতাপন! তোমারও চিত্তনির্ম্মল হইয়াছে এবং তাহাতেই তোমার পরম পবিত্র অহেতুক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে[২০]। হে সাধু রাম! পৃথিবীতে প্রায় সকলেরই কারণ বশতঃ রাজস বৈরাগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার আত্মার ও অনাত্মার বিচার জনিত অর্থাৎ বিবেকমূলক,

সাধুগণের চমৎকারজনক, উত্তম ও অনিমিত্তজ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। সুতরাং তোমার এ বৈরাগ্য সাত্ত্বিক[২১।২২]। বিরস বীভৎস বস্তু দেখিলে কাহার না তদ্বস্তুতে বিরাগ জন্মে? তাদৃশ বিষয়ে অনেকেরই বৈরাগ্য জন্মে বটে; কিন্তু সাধুদিগের বৈরাগ্য বিবেক হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাঁহাদের বৈরাগ্যই উত্তম[২৩]। যাহাদের বিনা নিমিত্তে অর্থাৎ কেবল মাত্র দুই একটী দুঃখ ও বিদ্বেষ বশতঃ বৈরাগ্যোদয় না হয়, কেবলমাত্র সত্ত্বগুণ-পরিণামজ আত্মানাত্মবিবেক বশতঃ সংসার বৈরাগ্য জন্মে, এ জগতে তাঁহারাই যথার্থ বিবেকী, তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই প্রাজ্ঞ এবং তাহাদেরই অন্তঃকরণ যথার্থ নির্ম্মল[২৪]। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে যিনি বিবেক বশতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিষয়বিরক্ত হন, তিনিই উৎকৃষ্টহারপরিশোভী যুবরাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হন[২৫]। যাঁহারা স্বীয় বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সংসাররচনা বিচার করিয়া তৎপ্রভাবে পবিত্র ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই মহাপুরুষ[২৬]। রাঘব! কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ্য-প্রপঞ্চ, * সমুদায় বিশ্ব আত্মবিবেক দ্বারা বিচার করিয়া ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা বিবেচনা করা উচিত ও বলপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা বিধেয়[২৭]। মরণ, ব্যাধিবিপ্লব, বিপদ, দৈন্য, জরা, এ সকল দেখিলে অর্থাৎ নিপুণ হইয়া পর্য্যালোচনা করিলে কোন ব্যক্তি না বিরক্ত হয়? তাহাকেই বৈরাগ্য বলা যায়—যাহা স্বতঃ ও স্ববিবেক বশতঃ উৎপন্ন হয়[২৮]। তুমি অকৃত্রিম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, মহত্ত্ব লাভ করিয়াছ, সেই কারণে তুমি বীজবপনের ফালকৃষ্ট † উত্তম কোমল ক্ষেত্রের ন্যায় জ্ঞানসার তত্ত্বজ্ঞান-রূপ বীজবপনের উৎকৃষ্ট আধার অর্থাৎ পাত্র[২৯]। পরমেশ্বরের প্রসাদে তোমার ন্যায় ব্যক্তির শুভা বুদ্ধি (সুবুদ্ধি) বৈরাগ্যেরই অনুগামিনী হইয়া থাকে[৩০]। বহুকাল ব্যাপিয়া যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পরিপালন ও তীর্থসেবা প্রভৃতি করিয়া তদ্দ্বারা জন্মজন্মান্তরীণ দুষ্কৃতি ক্ষয় করিতে পারিলে তখন তাহারা পরমার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও সকলের বৈরাগ্যোদয় হয় না। কাকতালীয় ন্যায়ে কাহার কাহার বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে[৩১।৩২]।

---

* শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এ সকল অন্তঃপ্রপঞ্চ। শরীরের বাহিরে সমস্তই বাহ্য প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ জগৎ।

† ফালকৃষ্ট অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা চষা ভূমি।

জীব যাবৎ না পরম পদ দেখিতে পায় তাবৎ তাহারা পুনঃ পুনঃ লৌকিক বৈদিক কর্ম্মে রত ও পুনঃ পুনঃ সংসার চক্রে ভ্রাম্যমান হইতে থাকে[৩৩]। যেমন আলাননিবদ্ধ হস্তী বন্ধন ছেদন করিয়া পলায়ন করে, তেমনি, সাধুগণ এই সংসারের গতি অত্যন্ত কুটিল ও অসৎ বিবেচনা করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তন্ময়ী বুদ্ধির দ্বারা পরব্রহ্মে গমন করেন[৩৪]। রাম! এই সংসারগতি (সংসারাবস্থা) বড়ই বিষম ও ইহার অন্ত অর্থাৎ শেষ নাই। ইহার প্রবল দোষ এই যে, জীব যাবৎ ইহাতে অবস্থান করে, তাবৎ দেহযুক্ততা অর্থাৎ দেহাভিমান ত্যাগ হয় না। দেহাভিমান ত্যাগ না হইলেও আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হয় না। আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান না হইলেও আপনার মহত্ত্ব অনুভূত হয় না[৩৫]। রঘুনাথ! মহাবুদ্ধি পুরুষেরা অর্থাৎ বিবেকী পুরুষেরা জ্ঞানযোগরূপ ভেলার দ্বারা সুদুস্তর সংসাররূপ মহাসমুদ্র পার হইয়া থাকেন[৩৬]। সেইজন্যই বলিতেছি, তুমিও বিচারাভ্যাসতৎপরা ও বিবেক-বৈরাগ্য-নির্ম্মলা সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সংসারসমুদ্রতারক জ্ঞানযোগ শ্রবণ কর[৩৭]।

সংসার অনন্ত আপদের ও দুঃখভয়ের আস্পদ (স্থান)। ইহাতে যে বিক্ষেপ জনিত ভয়দুঃখাদির বেগ আছে, তাহা নিতান্ত প্রবল, দুঃসহ ও দীর্ঘস্থায়ী। তাহা উত্তম আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে চিরকাল অন্তর্দাহ জন্মাইয়া থাকে[৩৮]। রাঘব! জ্ঞানযোগ না থাকিলে শীত, বাত, এবং আতপ, এ সকলের ক্লেশ কোন্ সাধু সহ্য করিতে সমর্থ হইত[৩৯]। অনল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তেমনি, অশেষদোষাকর দুরন্ত বিষয়চিন্তাও অজ্ঞান দিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে[৪০]। যেমন অগ্নিশিখা বর্ষাসিক্ত বনরাজি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সংসারযন্ত্রণাও তত্ত্বদর্শী জ্ঞাতজ্ঞেয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না[৪১]। এই সংসার মরুভূমিসমুত্থিত প্রসিদ্ধ ও প্রবল বাত্যাকাণ্ডের অনুরূপ। এই বাত্যাকাণ্ডে যতই আধিব্যাধিরূপ ঘূর্ণ বায়ু উঠুক, তাহাতে অত্রস্থ তত্ত্বজ্ঞানী নামক কল্পপাদপের কিছুই হয় না। তত্ত্বজ্ঞরূপ কল্পবৃক্ষ তাহাতে ভগ্নাবভগ্ন (ভাঙ্গিয়া পড়া বা বিশীর্ণ হওয়া) অথবা আলোড়িত, কিছুই হয় না[৪২]।

রাম! সেইজন্যই বলি, তুমি বুদ্ধিমান্, প্রমাণকুশল অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি

প্রমাণ নিচয় পরিজ্ঞাত আছ এবং আত্মজিজ্ঞাসু হইয়াছ; সুতরাং তুমি অতঃপর আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত যত্নবান হও। গুরুসেবাতৎপর হইয়া জ্ঞানোপায় কথা সকল জিজ্ঞাসা কর[৪৩]। প্রমাণকুশল অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন উদারচেতা গুরু যাহা বলেন, উপদেশ করেন, তাহা তুমি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ ও ধারণ কর। যেমন রঞ্জনের নিমিত্ত কুঙ্কুম দ্রবে বস্ত্র নিমগ্ন করিলে বস্ত্র যেমন কুঙ্কমরাগ গ্রহণ করে, তেমনি, তুমিও গুরূক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ কর[৪৪]। হে বাগ্মিপ্রবর রাম! যে নর অতত্ত্বজ্ঞ ও বিফলভাষী পুরুষকে প্রশ্ন করে, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে, সে নর নিতান্ত নিকৃষ্ট ও মূঢ়তম[৪৫]। প্রমাণবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরু জিজ্ঞাসিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক যাহা বলেন, উপদেশ করেন, যে নর তাহা না শুনে, সে নরও নিতান্ত অধম[৪৬]। যে নর পূর্ব্বে গুরুর অজ্ঞতা ও তজ্জ্ঞতা পরীক্ষা করে, করিয়া প্রশ্ন করে, সেই নর বুদ্ধিমান ও উত্তমপুরুষ[৪৭]। আর যে মূর্খ বক্তার স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত না হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করে, সে মূর্খ যার পর নাই অধম এবং সে কোনও কালে পরমার্থভাজন হইতে পারে না[৪৮]। যে শিষ্য গুরূক্ত বাক্যের পূর্ব্বাপর সমাধান করিতে সক্ষম, উক্ত অনুক্ত ও অন্তর্ভূত তত্ত্ব বিচার দ্বারা গ্রহণ ও ধারণ করিতে পটু, গুরু সেই শিষ্যেরই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করেন, পশুতুল্য অজ্ঞ অধমের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন না। অপিচ, যে গুরু প্রশ্নকর্ত্তার বোধসামর্থ্য আছে কি নাই তাহা পর্য্যালোচনার দ্বারা না বুঝিয়া সহসা অপাত্রে বক্তব্য বলেন, উপদেশ করেন, সে গুরুও বিজ্ঞ সমাজে মূর্খ বলিয়া পরিগণিত[৪৯।৫০]।

হে রাঘব! তুমি সেরূপ শিষ্য ও আমি সেরূপ গুরু নহি। তুমি সদ্‌গুণশালী ও উত্তম প্রশ্নকর্ত্তা এবং আমিও তত্ত্বকথনে সম্যক্ সক্ষম। সুতরাং আমাদিগের এই যোগ (গুরুশিষ্যের ভাব মেলন) অবশ্যই ফলজনক হইবে[৫১]। রাঘব! তুমি শব্দে ও শব্দার্থে পণ্ডিত। তোমাকে আমি যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রহণ করিবে ও "ইহাই অখণ্ডিত তত্ত্ব" এইরূপ অবধারণ বা নির্ণয় করিবে[৫২]। তুমি মহান্ হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, সংসারের ও জীবের গতি বুঝিতে পারিয়াছ, তোমাকে উপদেশ করিলে উপদেশজনিত জ্ঞান

বস্ত্রে কুঙ্কুমাম্বুসংলগ্নের ন্যায় লগ্ন হইবে[৫৩]। যেমন প্রভাকরের প্রভা জল মধ্যেই প্রতিফলিত হয়, তেমনি, উপদেশ গ্রহণে ও তত্ত্ববিবেকে সক্ষম ত্বদীয় বুদ্ধি মদীয় উপদেশের মধ্যে অবশ্যই প্রবিষ্ট হইবে[৫৪]। হে রাম! আমি যাহা যাহা বলিব তাহা তাহাই তুমি যত্ন পূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। যদি না পার, তবে, আমাকে বৃথা প্রশ্ন করিও না[৫৫]। রাম! মন এই সংসার অরণ্যের চপল মর্কট। সেই কারণেই বলিতেছি, তাহাকে শোধন করিয়া অর্থাৎ স্থির করিয়া পশ্চাৎ পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিবে [৫৬]। অবিবেকী, অজ্ঞান ও অসজ্জনসংসর্গী লোক দিগকে দূরীকৃত করিয়া সাধু সজ্জন দিগকে পূজা করিবে[৫৭]। সতত সজ্জনসংসর্গ করিলে বিবেক জ্ঞান জন্মে। ভোগ ও মোক্ষ এই দুইটী সেই বিবেক বৃক্ষের ফল[৫৮]। অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, মোক্ষনামক পুরের দ্বারদেশে শম (জিতেন্দ্রিয়তা), নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ, এই চার দ্বারপাল বিদ্যমান আছে[৫৯]। প্রযত্ন সহকারে এই চার দ্বারপালের সেবা করা কর্ত্তব্য। অশক্ত হইলে তিন্ অথবা দুই, একান্ত অশক্ত পক্ষে অন্ততঃ এক দ্বারপালের সেবায় অনুরক্ত হইবে। তাহা হইলে তাহারা মোক্ষনামক রাজবাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অর্থাৎ খুলিয়া দিবেক[৬০]। উহাদের এক জনকে বশীভূত করিতে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয় তথাপি তাহা স্বীকার করিবে। করিয়া অন্যতম দ্বারপাল বশ্য করিবার চেষ্টা করিবে। কারণ, উহাদিগের এক জনকে বশীভূত করিতে পারিলে অপর তিন জন সহজে বশ্য হইবে[৬১]। ভাস্কর যেমন জ্যোতিষ্ক গণের ভূষণ ও শ্রেষ্ঠ, তেমনি, বিবেকসম্পন্ন পুরুষই শাস্ত্র শ্রবণের, তপস্যার, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিচারের পাত্র ও শ্রেষ্ঠভূষণস্বরূপ[৬২]। যেমন তরলস্বভাব অম্বু (জল) জাড্যের (অতিশৈত্যের) দ্বারা পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া যায়, তেমনি, অল্পচৈতন্য জীবেরাও (অল্পবুদ্ধিলোকেরাও) নিজ মূর্খতার দোষে জড়বৎ হইয়া যায়[৬৩]। কিন্তু রাম! তুমি সেরূপ নহ। তোমার অন্তঃকরণ সৌজন্য গুণে ও শাস্ত্রার্থ দর্শনে সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়াছে[৬৪]। যেমন মৃগাদি পশু বীণানিস্বন শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হয়, তেমনি, তুমিও জ্ঞানোপদেশ শুনিতে ও বুঝিতে উৎকর্ণ হইয়াছ। সেইজন্যই বলিয়াছি, তুমি উপদেশের পরম পবিত্র ও যোগ্য পাত্র[৬৫]। হে রামচন্দ্র! এক্ষণে তুমি বৈরাগ্য ও অভ্যাস এই

হৃদয়ের দ্বারা শান্তি ও সৌজন্যরূপ মহাসম্পত্তি উপার্জ্জন কর। করিলে আত্মাবমাননা থাকিবে না৬৬। অগ্রে সৎশাস্ত্রের আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে৬৭। কারণ, প্রজ্ঞাই মূর্খতা নাশের পরম কারণ। যে কিছু জ্ঞানদর্শনের শাস্ত্র আছে অর্থাৎ অধ্যাত্ম শাস্ত্র আছে, সমস্তই মূর্খতা বিনাশের উপায়৬৮। এই যে সংসারবৃক্ষ, ইহা আপদের এক মাত্র আস্পদ এবং ইহাই অজ্ঞ দিগকে নিত্য মুগ্ধ করিতেছে। সুতরাং যত্নপূর্ব্বক অজ্ঞতা বা মূর্খতা বিনাশের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য৬৯। চর্ম্ম (ভস্ত্রা, কামারের জাঁতা) যেমন অগ্নিসংযোগে ক্রমনিয়মে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তেমনি, চিত্তও দুরাশার দ্বারা নিত্যই সর্পের ন্যায় কুটিলগতি প্রাপ্ত ও বুদ্ধিপ্রদেশে শত শত বিক্ষেপ জন্মায়। জন্মাইয়া মূর্খতা আনয়ন করে, পরে তৎক্রমে দিন দিন সঙ্কুচিত হইতে থাকে। অর্থাৎ মালিন্য প্রাপ্ত হইতে থাকে৭০। দৃষ্টি (চক্ষুঃ) যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ পূর্ণ শশধর দর্শনে প্রসন্ন বা পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি, মদুক্ত বস্তুদৃষ্টি (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতেই স্বার্থসম্পাদিনী হয়। (অথবা বস্তুদৃষ্টি অর্থাৎ চিদাত্মা প্রাজ্ঞ শিষ্যের চিত্তে প্রাজ্ঞ উপদেষ্টার প্রভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকেন)৭১। যাহার মতি পূর্ব্বাপর বিচারের দ্বারা সূক্ষ্মার্থ গ্রহণেক্ষমবতী হইয়াছে, নিরতিশয় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, তাদৃশী মতি সবিকাশা নামে খ্যাত। যাহার মতি তাদৃক প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহসংসারে সেই পুরুষই পুরুষ৭২। হে রঘুবর! যেমন মেঘাবরণবিনির্ম্মুক্ত তিমিরবিনাশী পূর্ণ শশধরের কিরণে আকাশমণ্ডল শোভমান হয়, তেমনি, তুমিও নির্ম্মলাবুদ্ধিতে ও শান্ত্যাদি গুণে শোভমান হইয়াছ৭৩।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তোমার মন পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহে পূর্ণ হইয়াছে। কিরূপে প্রশ্ন করিতে হয় তাহাও তুমি অবগত আছ। অপিচ, সংক্ষিপ্ত (সূত্র) কথা বলিলেও তাহা বুঝিতে পার। এই সকল কারণে আমি তোমাকে যত্নপূর্ব্বক বলিতে অর্থাৎ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি[১]। এক্ষণে তুমি তোমার রজস্তমোবর্জ্জিতা সত্ত্বসারা মতি (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি) পরমাত্মায় স্থাপিত কর, করিয়া জ্ঞানোপদেশ শুনিবার জন্য অগ্রসর হও[২]। জিজ্ঞাসু জনের যে যে সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক সে সমস্তই তোমাতে বিরাজ করিতেছে এবং বক্তার বা উপদেষ্টার যে যে গুণ থাকা উচিত, সে সমুদায়ও আমাতে বিরাজ করিতেছে। যেমন, জলধিতে রত্নশ্রী, তেমনি, আমাতে ও তোমাতে গুণশ্রী[৩]। পুত্র! চন্দ্রকিরণসংযোগে চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় বিবেক ও বৈরাগ্য সংযোগে তোমার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে ও তুমি অশেষ সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছ[৪]। তুমি বাল্যকাল হইতে সদ্‌গুণে অভ্যস্ত, সুতরাং শুদ্ধস্বভাব। সেইজন্য এখন তুমি তত্ত্বকথা শ্রবণের উপযুক্ত। যেহেতু উপযুক্ত, সেই হেতু আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি জানি, চন্দ্রমা ব্যতীত কুমুদিনী বিকশিতা হয় না[৫।৬]। (অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত অনধিকারী ব্যক্তি কদাচ তত্ত্ব কথা শুনিতে সমর্থ হয় না)। যে সকল সমারম্ভ অর্থাৎ প্রামাণিক উপদেশ, সে সকল পরম পদ (ব্রহ্মতত্ত্ব) দৃষ্টে উপশম প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ প্রাপ্য ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তখন আর উপদেশ শুনিতে হইবে না। তাহাই উপদেশ শ্রবণের অবধি বা সীমা[৭]। যদি জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে উত্তমাধিকারী গণের চিত্তবিশ্রান্তি না হইত তাহা হইলে কোন্ বিবেকী ব্যক্তি এই সংসারযাতনা সহ্য করিতে সমর্থ হইত? (তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারাও তোমার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণায় দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হইতেন)[৮]। যেমন কল্পান্তকালোদিত আদিত্যগণের (দ্বাদশ সূর্য্যের) তেজঃ মেরু প্রভৃতি পর্ব্বতকেও ভস্মীভূত করিয়া থাকে, তেমনি, পরমপদ (ব্রহ্ম) প্রাপ্তি

মাত্রে সমুদায় মনোবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়[৯]। রাম! সংসার এক প্রকার বিষম বিষ। ইহার আবেগে যে বিষূচিকা (রোগ) জন্মে, অশেষ বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ হয়, তাহা নিতান্ত দুঃসহ। পরন্তু যোগ তাহার পবিত্র অর্থাৎ তদ্বিষনাশন গারুড় মন্ত্রের স্বরূপ[১০]। পরমার্থ জ্ঞানরূপ সে যোগ সজ্জনগণের সহিত সংশাস্ত্রের আলোচনায় পাওয়া যাইতে পারে[১১]।

তুমি "এই মানবজন্ম জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্যই হইয়াছে। এবং এই জন্মে বিচারপরায়ণ হইলে অবশ্যই দুঃখক্ষয় হইবে।" এইরূপ স্থির করিবে ও নিশ্চয় সহকারে বিচার করিবে। বিচার দৃষ্টিকে কদাচ তুচ্ছ করিবে না এবং তাহাকে অবহেলাও করিবে না[১২]। যেমন ভুজঙ্গমগণ জীর্ণত্বক পরিত্যাগ করিতে দুঃখিত হয় না, তেমনি, তত্ত্বদর্শী বিচারপরায়ণ পুরুষেরা এই ব্যাধিমন্দির অশেষ দুঃখাকর কলেবর পরিত্যাগে কিছুমাত্র দুঃখিত হন না। অধিকন্তু তাঁহারা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ দেহের প্রতি যে অহং মম অভিমান রূঢ় আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক শীতলান্তঃকরণ হইয়া এই মায়াময় বিস্তীর্ণ জগৎকে ইন্দ্রজালবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাঁহারা অসম্যগ্‌দর্শী, তাহারাই দুঃখে কাতর হয়, অভিভূত হয়, কিন্তু সম্যগ্‌দর্শীরা এতদ্বিয়োগে অল্পমাত্রও দুঃখিত হন না[১৩]। দুঃখিত না হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, এই সংসার এক ভয়ঙ্কর রোগ। ভীষণতম ভবরোগ নর দিগকে কখন বিষধরের ন্যায় দংশন করিতেছে, কখন তীক্ষ্ণধার অসির ন্যায় ছেদন করিতেছে, কখন কুন্তের (কুন্ত= বড়শা অস্ত্র) ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করিতেছে, কখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, কখন বা অন্ধকার-ময়ী রজনীর ন্যায় মোহান্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিতেছে এবং কখন বা অশঙ্কিত চিত্তে বিষয়ানুসন্ধানে রত পুরুষ দিগকে পাষাণের পেষণ ও অবসন্ন করিতেছে (পাথর চাপা করিতেছে)। এই যে সংসার নামক দীর্ঘ রোগ, এই রোগই নরগণের প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি বিনাশ করিতেছে, মর্য্যাদা ভঙ্গ করিতেছে, ঘোর অন্ধকূপে অর্থাৎ নরকে নিপাতিত করিতেছে এবং তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত করিতেছে। অধিক কি বলিব, এই সংসারে এমন কোন দুঃখ নাই যাহা সংসারী জনগণকে ভোগ করিতে না হয়[১৪]। বিষয়-বিষূচিকা অতি ভয়ানক রোগ।

নরক-নগরোপম স্ব-পর-দেহের * প্রতি মমতাদি বুদ্ধি উৎপন্ন করা এ রোগের প্রধান উপদ্রব। শীঘ্র ইহার চিকিৎসা না করিলে, এ নিশ্চয়ই সেই সেই নরকদুর্দ্দশায় নিপাতিত করিয়া থাকে[১৫]। সে সকল নরক নিতান্ত ভীষণ। সে সকল নরকে এই সকল দুরবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—প্রস্তরতাড়ন, শিলা-ভক্ষণ, জ্বলদঙ্গারনিগীরণ, অগ্নির দ্বারা অঙ্গ দাহ, চক্ষুর্নাশ, হিমাবসেক, অঙ্গচূর্ণন ও অঙ্গকর্ত্তন, চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষণের ন্যায় শরীরঘর্ষণ, পর্ব্বতনিপাতন, অসিপত্র বৃক্ষের বনে দ্রুতধাবন, কীট কর্ত্তৃক অঙ্গভক্ষণ, বস্ত্রনিষ্পীড়নবৎ কাষ্ঠযন্ত্রে প্রপীড়ন, কণ্টকময় লৌহ শৃঙ্খলে অঙ্গ বেষ্টন, কণ্টকমার্জ্জনীর দ্বারা অঙ্গপরিমার্জ্জন। সে মার্জ্জনে ত্বক্ ছিড়িয়া যায়। লোহোদ্গারকারী সমরনারাচাদি নিপাত, প্রচণ্ড নিদাঘ কালে ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে পর্য্যটন, শিশিরকালে ধারাগৃহে বাস, পুনঃ পুনঃ শিরশ্ছেদ, সুখনিদ্রার অভাব, বদনাবরোধজন্য বাক্যরোধ। + সেই সকল নরকে এবম্বিধ আরও অনেক মহানিষ্ট ও সহস্র সহস্র নিদারুণ কষ্ট অনবরত ভোগ করিতে হয়[১৬]।

রাম! সংসার ঐরূপ ঐরূপ নিদারুণ অসংখ্য দুর্দ্দশার ও কষ্টের উৎপাদক। সেজন্য ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভে আলস্য বা অবহেলা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আমি যেরূপ যেরূপ বিচার প্রণালী বলিতেছি ও বলিব, সেই সকল প্রণালী অবলম্বনে প্রযত্ন সহকারে পরমাত্ম-পরায়ণ হওয়া ও তত্ত্বানুশীলনে রত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিকারী নর শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারাই শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। যে প্রকার বিচারে শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে সে প্রকার বা সে প্রণালী বলিতেছি,

---

* শরীরটা নরকের নগর।—এ নগরে কেবল মলমূত্রাদি থাকে। শরীর নরকের আগার; তথাপি জীব ইহাকে "আমার" "শুচি" "সুন্দর" ইত্যাদি প্রকার মনে করে। যাহা আমার নহে, শুচি নহে, সুন্দরও নহে, তাহাকে আমার, শুচি ও সুন্দর মনে করা বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পণ্ডিতেরা ঐ সকল বিকারকে ভ্রান্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

+ নরক ভোগ এ দেহে হয় না। মৃত্যুর পর যমালয়ে গিয়া সূক্ষ্ম দেহে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। প্রস্তরতাড়ন অর্থাৎ পাথরে আছড়ান। যেমন রজকেরা কাপড় আছড়ায় তেমনি। শিলাভক্ষণ অর্থাৎ সে নরকে প্রস্তর খাইতে দেয়, অন্য কিছু খাইতে দেয় না। জ্বলদঙ্গারনিগীরণ অর্থাৎ যমদূতেরা অগ্নিতপ্ত কয়লা খাওয়ায়। চক্ষুর্নাশ অর্থাৎ চোখ্ ছেঁদা করিয়া দেয়। হিমাবসেক অর্থাৎ শীতকালে বরফে স্নান করায়। পর্ব্বতনিপাতন অর্থাৎ পর্ব্বতের শিখর হইতে ফেলিয়া দেয়। ছুরি ও খাঁড়া যাহার পাতা, তাদৃশ কৃত্রিম বৃক্ষের বনে দৌড় করায়। যমদূতেরা যুদ্ধকালের ন্যায় অস্ত্রবর্ষণ করে, সে সকল অস্ত্র আবার ক্ষুদ্রাস্ত্র বমন করে। (এখন যেমন কামানের মধ্যে ছুরি প্রভৃতি ক্ষুদ্রাস্ত্র দেয় তেমনি)। এই সকল ক্লেশ মরণের পর পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বে যমালয়ে ভোগ করিতে হয়।

অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১৭]। হে রঘুকুলেন্দো! যদি এমন মনে কর যে, জ্ঞান কবচে আবৃত মুনিগণ, মহর্ষিগণ, দ্বিজগণ ও রাজন্যগণ তবে কি জন্য সেই সেই দুঃখকরী অবস্থা ও নানাপ্রকার সংসারক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন ও করিতেছেন? তোমার সে ভাব পরিবর্ত্তনার্থ এই মাত্র বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সেই সকল মহাত্মগণ সতত হৃষ্টচিত্ত অর্থাৎ আনন্দব্রহ্ম রসে পরিপূর্ণ[১৮]। * রাম! যেমন হরি হর প্রভৃতি দেবতারা এই সংসারে কৌতুক ও বিক্ষেপ বর্জ্জিত সুতরাং নির্লিপ্ত আছেন, তেমনি, বিশুদ্ধচিত্ত মানবগণও সংসারে অবস্থিতি করতঃ সংসারধর্ম্মে নির্লিপ্ত ও পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকেন[১৯]। পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন সমুদায় মোহ পরিক্ষীণ ও ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ নিবিড় মেঘ অন্তর্হিত হয়। তখন তাদৃশ জীবের জগদ্‌ভ্রমণ সুখেরই কারণ হইয়া থাকে[২০]। রাম! আরও বলি, আত্মা প্রসন্ন হইলেই জীব সন্দেহপরিহীন হয় ও শান্তি লাভে সমর্থ হয়। মনের শান্তি হইলেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মরসাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায়। সেই সময়ে এই জগতের প্রতি আত্মসমান ভাব বা সমদৃষ্টি নিপতিত হয়। সেই সমদৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞানী দিগের জগদ্‌ভ্রমণ যে পরম সুখদায়ক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই[২১]। আর এক কথা বলি, তাহাও শ্রবণ কর। এই অচেতন দেহ ছিন্ন কাষ্ঠ রচিত রথের অনুরূপ। দেহই রথ, ইন্দ্রিয়গণ তাহার অশ্ব অর্থাৎ বাহক। ইন্দ্রিয়ের যে বেগ, তাহাই সেই ইন্দ্রিয় অশ্বের গতি। এই রথ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মন ইহার রশ্মি (লাগাম্), আত্মা সারথি, পরমাত্মা ইহার পরম রথী। এই রথ আরোহণের ফল আনন্দ। এই রথ যদি আনন্দধামের অভি-মুখে বাহিত হয়, তবেই পরমানন্দ লাভ, নচেৎ দুর্গতি। এই দেহরথের আরোহী দেহী (জীব) দেহপরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র হইলেও সমাধিকালে মহান্। তত্ত্বদর্শনের পর তাদৃশী বুদ্ধি অবলম্বনে এই রথে জগৎ ভ্রমণ করা সুখের বৈ অসুখের নহে[২২]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

* শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা তত্ত্বসমুদ্বোধ হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার অন্যথা হয় না। মাণ্ডব্যাদি ঋষি, ও জনকাদি রাজা ও নারদাদি মুনি, লোকদৃষ্টিতে সংসারী; বস্তুতঃ তাঁহাদের সংসার ক্লেশ নাই বা ছিল না। তাঁহারা অনহংবুদ্ধি ও অসঙ্গভাবে অবস্থিত থাকিয়া প্রারব্ধ পরিক্ষয়ার্থ যথাপ্রাপ্ত আহারবিহারাদি করিতেন। অর্থাৎ সেই সেই ব্যবহার কার্য্যে তাঁহাদের লিপ্ততা ছিল না। সেই জন্যই তাঁহারা সুখী ও পুনঃসংসারের অযোগ্য।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রামচন্দ্র! যেমন ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া এবং অন্য লোকে ধনসমৃদ্ধিশালিতা প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তির সহিত কালযাপন করে, তেমনি, বুদ্ধিমান্ মহান্ ব্যক্তিরা বর্ণিতপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারে পরম সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিয়া থাকেন[১]। এই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তি শোক করেন না, কোন কিছু কামনা করেন না, কোন প্রার্থনা করেন না, শুভ অশুভ—ভাল মন্দ—কিছুই করেন না অথচ সমস্তই করেন ও কিছুই করেন না[২]। * তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করতঃ বিশুদ্ধ কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরমাত্মায় অবস্থিত; সেজন্য তাঁহারা ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এতৎপ্রকার বুদ্ধি বিবর্জ্জিত। যাহা কিছু করেন সে সকল নির্ম্মল অর্থাৎ নির্লেপ ও শাস্ত্রীয়। † নির্লেপ ও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করায় তাঁহারা শুদ্ধাত্মা থাকেন ও লৌকিক সৎপথে গমনাগমন করেন[৩]। এই সকল মহাপুরুষেরা আগমন করেন সত্য; পরন্তু অন্যের মত আগমন করেন না। গমন করেন বটে; কিন্তু অন্যের মত গমন করেন না। কর্ম্মও করেন পরন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে করায় তাহা না করা বলিয়া গণ্য। তাঁহাদের করা ও বলা না করা ও না বলার সমান[৪]। পরমপ্রাপ্য ব্রহ্মপদ অধিগত (প্রাপ্ত) হইলে তখন সর্ব্বপ্রকার সমারম্ভ ও সর্ব্বপ্রকার দর্শন হেয় ও উপাদেয় এই ভাবদ্বয়বিবর্জ্জিত হয় সুতরাং সে সকল কর্ম্মও তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান ফল প্রসব না করিয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়[৫]। মন তখন বিকারবর্জ্জিত হয় ও আনন্দপ্রবাহে ভাসিতে থাকে। সুতরাং চন্দ্রবিম্বে অবস্থিত স্বর্গপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় উৎকৃষ্ট সুখ অনুভব করিতে থাকে[৬]।

---

* "সমস্তই করেন ও কিছুই করেন না" এ কথার অর্থ এই যে, প্রারব্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া যথাপ্রাপ্ত কার্য্য করেন সুতরাং লোকদৃষ্টিতে সমস্তই করেন। কোনও কার্য্য ইচ্ছা বা কামনা পূর্ব্বক করেন না। তাহা না করায় পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না।

† নির্লেপ = ফলপ্রদান সামর্থশূন্য। অভিসন্ধি থাকিলে কর্ম্ম সকল যথাকালে ফল প্রসব করে, অভিসন্ধিরহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম ফল দিতে পারে না। নিঃশক্তি হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

যেমন পূর্ণশশিস্থিত সুধা রসের পরিমাণ করা যায় না; সেইরূপ, পরিত্যক্ত বিষয়াভিলাষ ও পরিত্যক্ত কৌতুক আত্মসুখপ্রবিষ্ট চিত্তেরও সুখের পরিমাণ (ইয়ত্তা) করা যায় না। অর্থাৎ সে সুখ অসীম[৭]। যে একবার মাত্র আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, সে আর এ ইন্দ্রজাল দেখে না, বাসনার অনুগামীও হয় না। সে বালচাপল্য পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ পরমাত্মসুখে বিরাজ করে[৮]। হে রামচন্দ্র! এবম্বিধা বৃত্তি (জীবন্মুক্তি-রূপিণী অবস্থা) আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারাই লাভ করা যায়; অন্য কোন উপায়ে নহে। যেহেতু আত্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই কথিত-প্রকার জীবন্মুক্ততা জন্মে, সেই হেতু, অধিকারী পুরুষ মরণ পর্য্যন্ত অথবা তত্ত্ব দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত মনন ও নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে যত্নবান্ থাকিবেন। অন্য কিছু করিবেন না[৯।১০]। যাঁহারা অনুভবশালী, শাস্ত্রানুশীলনে তৎপর ও গুরূপদেশ গ্রহণে পরায়ণ, তাঁহারাই আত্মাবলোকনে সমর্থ[১১]। যে ব্যক্তি শাস্ত্র শ্রবণ করে, শাস্ত্রার্থ বিচার করে, সাধু সেবায় রত থাকে, সে ব্যক্তি গুরু-শাস্ত্রাদি অমান্য-কারী মূর্খের ন্যায় কষ্টদায়িনী দুরবস্থায় পতিত হয় না[১২]। মনুষ্যের মূর্খত্ব যাদৃশ খেদের কারণ হয়; আধি, ব্যাধি, বিষয় ও আপদ সেরূপ খেদের কারণ নহে[১৩]। যে অল্পমাত্র ব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি অল্পমাত্রও সংস্কৃত হইয়াছে, যাহার অল্পমাত্র বোধসামর্থ্য আছে, মদুক্ত এই অধ্যাত্মশাস্ত্র তাহার মূর্খতা বিনাশ করিতে সমর্থ। অল্পজ্ঞ দিগের পক্ষে এরূপ মূর্খতা নাশক শাস্ত্র আর নাই[১৪]। শাস্ত্রীয় মহাবাক্যের পরম প্রতিপাদ্য পরমাত্মা যাহার বন্ধু অর্থাৎ নিতান্ত প্রিয়, সেই পুরুষই এই অধ্যাত্ম-শাস্ত্র শ্রবণ করুক। ইহা সুশ্রাব্য, সুখবোধ্য, দৃষ্টান্তভূষিত ও সমুদায় অধ্যাত্মশাস্ত্রের অবিরোধী হৃদয় (সারস্বরূপ)[১৫]। যেমন খদির বৃক্ষের গাত্রে কণ্টকের জন্ম হয়, তেমনি, দুর্নিবার্য্য আপদ ও অত্যন্ত অধম কুযোনিজন্ম কেবল মূর্খতা হইতেই হইয়া থাকে[১৬]। রাম! বরং শরাব হস্তে চণ্ডালদ্বারে ভিক্ষা করা শ্রেয়স্কর, তথাপি, মৌর্খ্যাপহত জীবন শ্রেয়স্কর নহে। ভীষণ অন্ধকূপে ও মহীরুহকোটরে ভেক কীটাদি হইয়া কাল-ক্ষেপ করাও সুখের; তথাপি মৌর্খ্যাপহত জীবন সুখের নহে। মূর্খতা যার পর নাই দুঃখপ্রদ[১৭।১৮]। মনুষ্য এই মোক্ষোপায়ময় আলোক (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আর মোহান্ধকারে নিপতিত হয় না[১৯]। যাবৎ

না বিবেক সূর্য্যের নির্ম্মল প্রভা সমুদিত হয়, তাবৎ এই সকল মানবরূপ অম্বুজ (পদ্ম) তৃষ্ণা কর্ত্তৃক সঙ্কুচিত হইয়া থাকে[২০]। রাম! আমি সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি সংসার ক্লেশ বিনাশার্থ গুরু ও শাস্ত্র প্রমাণ অবলম্বনে আপনার অনারোপিতরূপ (আত্মতত্ত্ব) অবগত হও, হইয়া সুখে বিচরণ কর[২১]। হে রাঘব! মুনিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, অন্যান্য জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ ও হরি হর-ব্রহ্মাদি দেবতারা যেরূপে ইহ সংসারে বিচরণ করেন, তুমিও সেইরূপে বিচরণ কর[২২]। এই সংসারে দুঃখই অনন্ত, সুখ তৃণকণার ন্যায় অল্প। তাহা অতিসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর এবং তাহাই আবার অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। সেই কারণে অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ দুঃখানুবিদ্ধ ক্ষণিক সাংসারিক সুখের প্রতি আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে[২৩]। যে পদ অনন্ত বা অসীম, যে পদ আয়াস (ক্লেশ) পরিমুক্ত, যাহা পরম সার অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ, সেই পদ সিদ্ধির নিমিত্ত বিচক্ষণ পুরুষ যত্নপূর্ব্বক সাধনে রত হইবেন[২৪]। রাম! ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, যাঁহাদের মন গতজ্বর (বিক্ষেপশূন্য বা চাঞ্চল্যবর্জ্জিত) হইয়াছে, এ সংসারে তাঁহারাই মোক্ষ লাভের পাত্র। তাঁহারাই পরমপদ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহারাই উত্তম পুরুষ[২৫]। আর যাঁহারা কেবল রাজ্যাদি পার্থিব সুখে নিবিষ্টচিত্ত এবং বিষয়সম্ভোগেই পরিতুষ্ট; সেই সকল দুষ্টাশয় মানব দিগকে তুমি অন্ধভেকতুল্য (অন্ধভেক=কূপমণ্ডুক অথবা কাণা বেঙ্) জানিবে[২৬]। যাঁহারা বঞ্চনা বিষয়ে, প্রবল দুষ্কর্ম্মে, দুরনুষ্ঠানে, মিত্ররূপী শত্রুতে (অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে) ও সর্পরূপী ভোগে (বিষয় ভোগ সর্প তুল্য, ইহার দংশনে নরক জ্বালায় জ্বলিতে হয়) সমাসক্ত, সেই সকল মন্থরবুদ্ধি মূঢ় লোকেরা এক দুর্গম হইতে অন্য দুর্গমে (দুর্গতিতে), এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখে, এক ভয় হইতে অন্য ভয়ে ও এক নরক হইতে অন্য নরকে নিপতিত হয়[২৭।২৮]। রাম! সুখের ও দুঃখের দশা বিদ্যুৎ অপেক্ষাও অল্পকালস্থায়ী। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সুখ দুঃখের রীতি এই যে, সুখ দুঃখকে বিনাশ করে এবং দুঃখও সুখকে বিনাশ করে। "সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ।" সেই কারণেই সুখান্বেষী লোক কোনও কালে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে না। অসীম অনন্ত কাল ব্যাপিয়া তাহারা সুখদুঃখের স্রোতে ভাসমান থাকে, থাকিয়া শ্রান্ত

ও ক্লান্ত হইতে থাকে[২৯]। যাহারা বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাদৃশ সুখ দুঃখের প্রতি বিরক্ত ও বিবেকপরায়ণ, সেই সকল ভবৎসদৃশ মহাত্মারাই প্রকৃত প্রকৃত সুখের ও মোক্ষের ভাজন হইয়া থাকেন[৩০]। বিবেক অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরাগ্যের অভ্যাস অর্থাৎ পরম বৈরাগ্য আয়ত্ত করিতে পারিলেই এই আপদস্বরূপ সংসারসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়[৩১]। যাঁহারা বিবেকী, যাঁহারা একবার সংসারের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ এই বিষের ন্যায় মোহকারিণী সংসার মায়ায় অবস্থান করেন না[৩২]। যাহারা এই সংসার প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে অবহেলা পূর্ব্বক অবস্থিতি করে অর্থাৎ ইহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা করে না, নিশ্চয়ই তাহারা প্রজ্জ্বলিত গৃহমধ্যস্থ রাশীকৃত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে[৩৩]। হে রামচন্দ্র! যাহা প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, যাহা পাইলে সমুদায় শোক মোহ দূরীভূত হয়, তাদৃশ পরম পদ অবশ্যই আছে এবং তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান লভ্য। এ বিষয়ে তোমার যেন সংশয় না হয়। এ বিষয়ে যাঁহাদের সংশয় আছে, আমি তাঁহাদিগকেও বলি, যদি তাহা নাও থাকে, তথাপি, তাহার বিচার করিতে দোষ কি। তাহাতে তোমাদের কি ক্ষতি হইবে। ভাবিয়া দেখ, যদি থাকে তবে তদ্দ্বারা অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবে[৩৪।৩৫]। এই সংসারস্থ পুরুষগণের মধ্যে যখন যে পুরুষের মোক্ষসাধক বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে তখন সেই পুরুষকে মোক্ষভাগী বলিয়া গণ্য করা যায়[৩৬]। রামচন্দ্র! তুমি ভুবনত্রয় অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, অপায় (নাশ) বর্জ্জিত, আশঙ্কা রহিত, ও যার পর নাই স্বাস্থ্যবিশিষ্ট নিরাপদ পদ কেবলীভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে[৩৭]। * সে পদ পাইলে, তখন মোক্ষ উপার্জ্জনের জন্য অল্পমাত্রও ক্লেশ করিতে হইবে না। ধন, মিত্র, বান্ধব, এ সকল সে পদ লাভের সহায়তা করে না, করিতে পারেও না। হস্তপদসঞ্চালন, দেশান্তরগমন, শারীরিক ক্লেশ, এ সকলের দ্বারাও সে বিষয়ের কোন উপকার হয় না। তাহা পাইবার জন্য বল ও উৎসাহ প্রভৃতি অবলম্বন করিতে হয় না। তীর্থ, আয়তন, ও পুণ্যস্থান আশ্রয় করিতেও হয়

---

* স্বর্গাদি পদের অপায় অর্থাৎ ক্ষয় আছে, তাহা হইতে পতনাশঙ্কা আছে, সুতরাং তাহাতেও শান্তি নাই। কেবলীভাব অর্থাৎ অদ্বয়ব্রহ্মভাবে লয় হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু অপায়াদি বর্জ্জিত নহে।

না। অধিক কি বলিব, কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র মনোজয় দ্বারাই সেই পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়[৩৮।৪০]। তাহা বিবেক-সাধ্য, * বিচার ও একাগ্রতার দ্বারা নিশ্চেয় ও বিষয়পরিত্যাগীর প্রাপ্য[৪১]। বিষয়বাসনাপরাঙ্মুখ বিচারপরায়ণ ও সুখসেব্য আসনস্থ পুরুষ সে পদ প্রাপ্ত হইয়া শোক হইতে উত্তীর্ণ হন ও জন্ম মৃত্যুর বশ্যতা ত্যাগ করেন[৪২]। সাধুগণ ঐ অনুত্তম নিশ্চল পরম পদকে সুখের উচ্চ সীমা ও পরম রসায়ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন[৪৩]। যেহেতু সমস্ত দৃশ্য নশ্বর, সেইহেতু মনুষ্যলোকের ও স্বর্গলোকের ভঙ্গপ্রবণ (নশ্বর) সুখ সুখ নহে। যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় সলিল, তেমনি, দিব্য (স্বর্গীয়) ও মানুষ (মনুষ্য-লোকের) বিষয়ে সুখ। অর্থাৎ তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৪]। হে রামচন্দ্র! আমি সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অগ্রে মনকে জয় করিবার চেষ্টা কর। মনোজয় হইলে অর্থাৎ মন বশ্য হইলে সমতায় ও সন্তোষে অবস্থান করিতে পারিবে। তখন সেই অদ্বয়ব্রহ্মসংযোগে একরস হইবে ও তদানন্দে আনন্দিত হইবে[৪৫]। চেষ্টা করিলে কি জঙ্গম, কি পর্য্যটক, (ভ্রমণকারী) কি পতনশীল, (খেচর) কি রাক্ষস, কি দানব, কি দেব, কি মানুষ, সকলেই সেই শান্তিসন্তোষসমুদ্ভূত বিবেকরূপ উচ্চ মহীরুহের শান্তিরূপ বিকশিত কুসুমের পরমানন্দ রূপ সুখফল লাভ করিতে পারে[৪৬।৪৭]। যেমন সূর্য্যদেব আকাশে থাকিয়াও আকাশের আকাঙ্ক্ষা করেন না, নির্লিপ্ত থাকেন, তেমনি, পরমপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও ব্যবহারে বর্ত্তমান থাকেন, অথচ তাঁহারা তাহার ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার হেয়-উপাদেয়-জ্ঞান-পূর্ব্বক অথবা ফলাভিসন্ধান-পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হয় না[৪৮]। তাঁহাদের মন প্রশান্ত ও নির্ম্মল হয়, বিশ্রান্তিতে অবস্থান করে, অর্থাৎ চেষ্টাশূন্য হয়, শ্রমবিহীন ও কামনাশূন্য হয়। অপিচ, একরসাসক্ত হওয়ায় (ব্রহ্মপ্রবিষ্ট হওয়ায়) লৌকিক বিষয়ের গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন উভয়বিবর্জ্জিত হয় অর্থাৎ উদাসীন হয়[৪৯]।

রাম! মোক্ষদ্বারে যে চারিটী দ্বারপাল † আছে, যথাক্রমে তাহাদের

---

* বিবেক = আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার হইতে পৃথক করিয়া জানা। বিচার = শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। একাগ্র = নিরন্তর প্রণিধান অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ। বিচার দ্বারা স্থির করিয়া শ্রবণ মননাদির দ্বারা সংশয়াদি দূরীকৃত করিয়া প্রণিধান প্রবাহ উপস্থিত করিয়া সে পদ প্রত্যক্ষ করিতে হয়।

† শম, বিচার, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, সন্তোষ ও তত্ত্বপ্রণিধান বা সৎসঙ্গ।

বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর! তাহাদের একটীকে বশীভূত করিতে পারিলেই মোক্ষদ্বারে প্রবেশ করা যায়[৫০]। প্রথমে শম নামক দ্বারপালের বিষয় বলি, শ্রবণ কর। এই সংসার এক প্রকার মরুভূমি। জীব ইহাতে সুখের আশায় পরিভ্রমণ করিতেছে। (সুখ নাই অথচ সুখের আশা করিতেছে)। তাহাদের যে সুখতৃষ্ণাজনিত তাপ; তাহাই তাহাদের দোষের অবস্থা। কফাদি ধাতু দূষিত হইয়া দোষজ্বর উৎপাদন করিলে প্রত্যেক জীবই জল পিপাসায় ও তাপে কাতর ও অভিভূত হয়, এবং শীতল হইবার জন্য যেখানে সেখানে জল অন্বেষণ করে। সেইরূপ, অবিদ্যা দোষে অহংমমাভিমান রূপ দোষজ্বর উপস্থিত হওয়ায় জীব সকল সুখতৃষ্ণায় ও তজ্জনিত তাপে অভিভূত হইয়া সুখতৃষ্ণা ও তাপ নিবারণার্থ সংসাররূপ মরুভূমে সুখের অন্বেষণ করিতেছে, অথচ তাহা পাইতেছে না। সুতরাং তাহাদের তাপশান্তিও হইতেছে না। এই দুরতিক্রমণীয় দীর্ঘ তাপ শম সেবায় অপগত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শম-নামক দ্বারপালের সেবা করিলে জীব সুখ পায়, তখন তাহার দাহ নিবারিত হইয়া শরীর মন শীতল হয়[৫১]। জীব শম সেবার দ্বারাই শ্রেয়োলাভ করে সুতরাং শমই পরম পদ, শমই পরম মঙ্গল ও শমই পরমাশান্তি। শমের দ্বারাই জীবের ভ্রান্তি বিদূরিত হয়[৫২]। যে পুরুষ শমলাভে তৃপ্ত, যাহার আত্মা (বুদ্ধি) শমের দ্বারা শীতল ও নির্ম্মল, সেই শম-বিভূষিতচিত্তের শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে[৫৩]। শমরূপ চন্দ্রচন্দ্রিকার (জ্যোৎস্নার) দ্বারা যাহার আশয় (অভিপ্রায়) সমলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিশুদ্ধতা ক্ষীরোদ সমুদ্রের ন্যায় যার পর নাই উৎকৃষ্ট[৫৪]। যাহাদের হৃদয়রূপ পদ্মাকরে শমরূপ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহাদিগকে দ্বিহৃৎপদ্ম কহে। এই দ্বিহৃদ্‌পদ্ম পুরুষেরা হরির তুল্য[৫৫]। যাহাদিগের অকলঙ্ক মুখচন্দ্রে শমশ্রী শোভা পায়, তাহাদিগের সে শোভায় অন্যের সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া থাকে। কুলীনেন্দ্রগণের (কুলীনেন্দ্র=সাধুশ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ সৎ পুরুষ দিগের শমরূপ ঐশ্বর্য্য যেরূপ আনন্দদায়ক, এই ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তী সাম্রাজ্যসম্পত্তি তাদৃশ আনন্দদায়ক নহে[৫৬।৫৭]। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, শান্তিগুণ দ্বারা সমুদয় দুঃখ, সমুদায় দুঃসহ তৃষ্ণা ও সমস্ত মানসিক ব্যথা দূরীভূত হইয়া থাকে[৫৮]। মনই ভূতগণকে প্রসন্নতা প্রদান করিয়া থাকে। মন শান্তশীতল মনুষ্য দর্শনে যেরূপ প্রসন্ন হয়, পূর্ণচন্দ্র দর্শনেও

সেরূপ প্রসন্ন হয় না[৫৯]। যিনি সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দবান্, সেই শমশালী সাধু-পুরুষে পরম তত্ত্ব আপনা আপনি প্রস্ফুরিত হইতে থাকে[৬০]। কি কোমলচিত্ত, কি ক্রূরকুটিলাশয়, সকলেই মাতাকে (স্নেহময়ী জননীকে) বিশ্বাস করে। সেইরূপ, যে শান্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাহাকেও দুষ্টাদুষ্ট সমুদায় লোকই বিশ্বাস করে[৬১]। শমগুণের উদয়ে অন্তরে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, অমৃতপানে ও ঐশ্বর্য্যের আলিঙ্গনে সেরূপ আনন্দোদয় হয় না[৬২]। হে রাঘব! তুমি আধি ব্যাধি দ্বারা বিচলিত (অনুতপ্ত) ও তৃষ্ণারজ্জুর দ্বারা ইতস্তত আকৃষ্ট অন্তঃকরণকে শমামৃতে অভিষিক্ত করিয়া সমাশ্বাসিত কর[৬৩]। বৎস! তুমি শমশীতল বুদ্ধি অবলম্বনে যাহা করিবে তাহাই তোমার ভাল লাগিবে অর্থাৎ পরম রুচিকর হইবে। কিন্তু যতদিন তোমার মন প্রশান্ত না হইবে তত দিন তোমার কিছুই উত্তম বলিয়া বোধ হইবে না[৬৪]। মন শম-নামধেয় অমৃতরসে আপ্লুত হইলে যেরূপ নির্ব্বিঘ্ন হয়, যে অনির্ব্বাচ্য সুখ প্রাপ্ত হয়, সে সুখ ও সে নির্ব্বেদ অন্য কিছুতে হয় না। আমি বিবেচনা করি, অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও পুনর্ব্বার তাহা সেই সুখের (শম-সুখের) প্রভাবে যোড়া লাগিতে পারে[৬৫]। অধিক কি বলিব—পিশাচ, রাক্ষস, দৈত্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গম, কেহই শমশালী ব্যক্তিকে দ্বেষ করে না[৬৬]। যেমন ধনুর্ম্মুক্ত বাণ বজ্রশিলাভেদ করিতে পারে না, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার দুঃখও (ত্রিতাপ) শমামৃত বর্ম্ম-ধারীর অঙ্গ (মন) বিদ্ধ করিতে পারে না[৬৭]। অকিঞ্চন নর, সাধনের দ্বারা শীতলতা প্রাপ্ত সরল স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা যেরূপ শোভান্বিত হয়, একজন রাজা রাজপুরবাসে সেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন না[৬৮]। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়বস্তু দর্শনে যে পরিতোষ না হয় তদপেক্ষা অধিক পরিতোষ শান্তাশয় লোক দর্শনে হইয়া থাকে[৬৯]। যে ব্যক্তি ইহলোকে জগদানন্দদায়িনী শমময়ী বৃত্তি অবলম্বনে জীবিত থাকে, সেই ব্যক্তির জীবনই জীবন, অন্যের জীবন জীবন (বেঁচে থাকা) বলিয়া গণ্য নহে[৭০]। যে যথার্থ সাধু ও সৎপুরুষ, যে অনুদ্ধতমনা ও শান্ত, সে, শান্তি অবলম্বনে যে কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎক্ষণাৎ নিখিল জীব তাহার সেই কার্য্যের অভিনন্দনঅনুমোদন-কারী হয়[৭১]। (এক্ষণে শান্তশীল সৎপুরুষের লক্ষণ শ্রবণ কর)।

যে পুরুষ শুভাশুভ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ বা ভক্ষণ করিয়া হর্ষের বা গ্লানির বশীভূত হন না, তুমি তাহাকেই শান্ত বলিয়া অবধারণ

করিবে[১২]। যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ইন্দ্রিয়জয়ী ও ভবিষ্যৎ সুখের আশয়ে প্রতারিত হন না অথচ প্রারব্ধানীত সুখ পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকেও তুমি শান্ত বলিয়া জানিবে[১৩]। যাঁহাকে দেখিবে, পরকোটি জানিয়াও অন্তরে ও বাহিরে নির্ম্মল বুদ্ধির কার্য্য করিতেছেন, শম-মহিমজ্ঞগণ তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া থাকেন (অর্থাৎ সারল্যও শান্তের অন্যতম লক্ষণ)[১৪]। যাহার মন মরণে, উৎসবে ও যুদ্ধাদিতে সমান থাকে, তুষারকরবিম্বের ন্যায় নির্ম্মল ও নিরাকুল থাকে, তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া অবধারণ করিবে[১৫]। যে মহাত্মা হর্ষশোকাদিজনক স্থানে অবস্থিত থাকিয়াও থাকেন না, অর্থাৎ তত্রস্থ গুণদোষে লিপ্ত হন না, হর্ষ বা কোপ করেন না, নিরন্তর সুষুপ্তের ন্যায় স্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন, তিনিও অস্মদাদির মতে শান্ত[১৬]। যাঁহার দৃষ্টি সকলের প্রতি প্রীতিময়ী ও অমৃতপ্রবাহের ন্যায় সুখদায়িনী, শান্তিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া থাকেন[১৭]। যাঁহার অন্তর শীতল অর্থাৎ ত্রিতাপ পরিশূন্য বা বিকার শূন্য হইয়াছে, যিনি বিষয় ব্যবহারে নিমগ্ন নহেন, অথচ লোক ব্যবহারে অসম্মূঢ়, তুমি তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে[১৮]। চিরকালস্থায়ী দুরুচ্ছেদ্য দুরন্ত আপদ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন তুচ্ছ দেহাদিতে অহং মম অভিমান উৎপাদন করে না, তাহাকেও আমরা শান্ত বলিয়া থাকি[১৯]। যাঁহার মতি লোকব্যবহারে ব্যাপৃতা থাকিয়াও আকাশের * ন্যায় কলঙ্কপরিশূন্যা, তিনি অস্মদাদির মতে পরম শান্ত[২০]। যিনি শমবান্ অর্থাৎ শান্ত, তিনি কি তপস্বী, কি বহুদর্শী, কি যাজক, কি রাজা, কি বলবান্, কি গুণশালী, কি নির্গুণ, সকলেরই মধ্যে বা সকলেরই নিকট শোভা প্রাপ্ত হন[২১]। যেমন শশাঙ্কের উদয়ে জ্যোৎস্নার প্রকাশ, তেমনি, শান্তিপরায়ণ গুণশালী মহৎ ব্যক্তিদিগেরও নির্বৃত্তি (বিশ্রান্তি সুখ) উদিত হইয়া থাকে[২২]। যতই গুণ থাকুক, সে সকলের উচ্চ সীমা শান্তি; সেজন্য শান্তিই পুরুষের মুখ্য ভূষণ। কি সঙ্কট, কি ভয় স্থান, সর্ব্বত্রই শ্রীমান্ শম বিরাজ করিয়া থাকেন[২৩]। রঘুনাথ! যেমন মহানুভব যোগী শমরূপ অমূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন সেইরূপ তুমিও মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত শমগুণান্বিত হও[২৪]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* আকাশ=ব্রহ্ম অথবা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ। ব্রহ্মের ন্যায় একরস অথবা ভূতাকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বা নির্ব্বিকার।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিধান আছে—কারণতত্ত্বজ্ঞগণ শাস্ত্রার্থ বোধ দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও নিতান্ত পবিত্র বুদ্ধিতে নিরন্তর আত্মবিচার করিবেন[১]। বিচার (মোক্ষদ্বারের দ্বিতীয় দ্বারপাল) করিতে করিতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণা হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগাহনে ক্ষমবতী হয়, অনন্তর তদ্দ্বারা পরমপদ লাভ হয়। বিচারই সংসার রূপ মহারোগের অদ্বিতীয় ঔষধ[২]। কামনাদির দ্বারা পল্লবিত আপদরূপ বনের সীমা নাই, পরন্তু একবার বিচাররূপ খড়্গ দ্বারা এই বনের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে আর তাহা হইতে পুনঃপ্ররোহ (প্ররোহ=অঙ্কুর) হয় না[৩]। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাম! স্বজনবিয়োগ ও অন্যান্য সঙ্কটপরম্পরা সমস্তই মোহ পরিব্যাপ্ত। সুতরাং সেই সকল স্থানে সাধু দিগের পক্ষে বিচার ব্যতীত অন্য গতি নাই[৪]। * পণ্ডিতগণ বিচার ব্যতীত অন্য কোন উপায় (অশুভ নিবারণের) অবলম্বন করেন না। তাঁহারা বিচারবলে সমস্ত অশুভ পরিহার পূর্ব্বক শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৫]। বল, বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াফল, এই সমস্তই বুদ্ধিমান্ দিগের বিচারের ফল[৬]। এক মাত্র বিচারই হেয়োপাদেয় কার্য্য সমুদয়ের দীপ ও অভীষ্ট-ফলসাধক। সাধুগণ তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিয়া সংসার-জলধি উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন[৭]। বিশুদ্ধবিচারনামক উদ্দাম কেশরী হৃদয়াম্ভোজদলনকারী মোহনামক মাতঙ্গ দিগকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে[৮]। অত্যন্ত মূঢ়েরা ও যে কালে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, অনুত্তম বিচারই তাহার কারণ[৯]। বিশাল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সনাতন মোক্ষ, সমস্তই বিচার নামক কল্পবৃক্ষের ফল[১০]। তুম্ব (শুষ্ক অলাবু) যেমন সলিল মধ্যে নিমগ্ন হয় না, সেইরূপ, মহাত্মা দিগের বিচারোদয়কারিণী বিবেকবিকাশিনী বুদ্ধিও বিপদে অবসন্না হয় না[১১]। যাঁহারা ইহ সংসারে বিচারোদয় কারক

---

* বন্ধুবিনাশাদি দুঃখ ও অন্যান্য বিপদ উপস্থিত হইলে কোন্ উপায়ে সে সকল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় এবং কিরূপে স্থৈর্য্য লাভ করা যায়, তাহা মোহ থাকিলে স্থির করা যায় না। বিচারে মোহ পলায়ন করে। তখন বুঝিতে পারা যায়, অমুক উপায়ে দুঃখ দূর ও চিত্ত স্থির হইতে পারে।

ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হন, তাঁহারাই যার পর নাই উদার ফলের যোগ্যপাত্র হন[১২]। দুঃখপদ্ধতি (দুঃখপরম্পরা) কি! দুঃখপদ্ধতি কেবল মূর্খ দিগের হৃদয়কাননস্থ মোক্ষসারবিরোধিনী করঞ্জ বৃক্ষের মঞ্জরী[১৩]। হে রাঘব! তোমার কজ্জলসদৃশী মলিনা ও মদিরামদধর্ম্মিণী অর্থাৎ আত্মভ্রান্তিদায়িনী অবিচারময়ী নিদ্রা শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হউক[১৪]।

যেমন তেজোরাশি সূর্য্য কস্মিন্ কালেও তমোমধ্যে নিমগ্ন হন না, তেমনি, সদ্বিচারপরায়ণ নরগণও কদাচ মহাবিপদে নিপতিত হন না[১৫]। যাঁহার স্বচ্ছ মানস সরোবরে বিচার কমল প্রস্ফুটিত হয়, তিনিই ইহ জগতে হিমাচলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হন। (হিমালয়ের নিতম্ব দেশে মানস সরোবর আছে) অর্থাৎ তিনিই শৈত্য, ঔন্নত্য ও স্থৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হন[১৬]। যাহার মতি বিবেকবিহীন ও মূর্খতায় অভিভূত,- মোহ তাহার সম্বন্ধে চন্দ্র হইতেও অশনির (বজ্রের) উৎপত্তি করে। যক্ষ (ভূত) যেমন শিশুর নিকটেই উদয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি মোহাভিভূত মন হইতেই সংসার ক্লেশ জন্মে[১৭]। * রাম! বিবেকবিহীন নরাধম দিগকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তাহারা দুঃখবীজের অতিস্থূল কুশূল (কুশূল=ধানের খোলা বা মড়াই) ও বিপদরূপ লতার বসন্ত কাল[১৮]। যেমন অন্ধকার কালেই ভূত প্রেতের প্রচার, তেমনি, যে কিছু দুরারম্ভ, যে কিছু দুরাচার, যে কিছু মানসী পীড়া, সমস্তই অবিচার কালে প্রকাশিত হইয়া থাকে[১৯]। হে রঘুনাথ! বিচারবিমুখ লোক নির্জ্জন বনদ্রুমের সমান। তাহাদের দ্বারা কাহার কোনরূপ সৎকার্য্য হয় না। তাদৃশ অজ্ঞ অক্ষম লোক দূরে পরিহৃত হয়[২০]। জীবের মন যখন বিচারে রত হয়, দুরাশার আধিপত্য অতিক্রম করে, তখনই তাহাদের চিত্তে পূর্ণচন্দ্রে জ্যোৎস্নার আবেশের (উদয়ের) ন্যায় উৎকৃষ্ট বিশ্রান্তিসুখের আবেশ বা আবির্ভাব হইয়া থাকে[২১]। যেমন জ্যোৎস্নার উদয়ে ভুবনের শোভা, তেমনি, বিবেকের উদয়ে দেহের শোভা হইতে

---

* ভাব ব্যাখ্যা এই যে, চন্দ্র মনের পিতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সে বিধায় তাহা বিবেক প্রকাশেরই যোগ্য। অর্থাৎ তাহাতে জ্যোৎস্নার ন্যায় জ্ঞানের ও সুখের আবির্ভাব হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া তাহা হইতে যে বজ্রসমান শোক দুঃখাদির আবির্ভাব হয়, তাহা মূর্খতার বা মোহের প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন বুঝে না বলিয়াই ভূতের ভয়ে কম্পিতকলেবর হয়, তেমনি, মনুষ্যও না বুঝিয়া বৃথা শোক দুঃখে অভিভূত হয়।

দেখা যায়। বিবেক জ্যোৎস্না অপেক্ষাও শীতল বস্তু[২২]। অধিক কি বলিব, বিচার পুরুষার্থ লাভের অধিকারী জীবের পরমার্থ পতাকান্বিত শুদ্ধ বুদ্ধির শ্বেতচামর স্বরূপ। রাত্রিকালে চন্দ্রমার যেরূপ শোভা, জীবদেহে বিচারের সেইরূপ শোভা[২৩]। * যেমন ভাস্কর দেব দশ দিক্ উদ্ভাসিত করেন, ও তমো বিনাশ করেন, তেমনি, বিচারশীল মানব আপনার ও জনগণের ভবভয় বিনাশ করিয়া থাকেন[২৪]। বিচার, মূঢ়দিগের রজনীসময়সমুদ্ভূত মোহকল্পিত প্রাণান্তিক (প্রাণ নাশক) বেতালভয়সদৃশ অজ্ঞান সমুদ্ভূত ভয় দূরীকৃত করিতে সমর্থ এবং তাহারই (বিচারের) অভাবে ক্ষণভঙ্গুর জগতের অসার পদার্থ নিচয়ে রমণীয়তা ভ্রম জন্মিতেছে[২৫।২৬]। মোহবশতঃ নিজ মনের কল্পিত অর্থাৎ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত অতিশয়িত দুঃখপ্রদ সংসার নামক বেতাল (সংসার ভয় ভূতের ভয়ের সমান) কেবল বিচার দ্বারা তিরোহিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে[২৭]। যাহা বৈষম্যবর্জ্জিত বা সমসুখ, যাহা কোন কিছুব অধীন নহে, যাহা বাধিত নহে, অর্থাৎ যাহা কস্মিন্ কালেও বিনষ্ট, বিকৃত বা তিরোহিত হয় না, শাস্ত্রে যাহাকে কৈবল্য বলে, সেই মোক্ষ নামক পরম সুখ বিচার নামক উচ্চ তরুর ফল[২৮]। চন্দ্রের উদয়ে শৈত্যের উদয়ের ন্যায় মোক্ষের উদয়ে অত্যুত্তম নিষ্কামতা উদিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে নিষ্কামতা নিশ্চল ও উদার। অর্থাৎ তাহা পূর্ণ আনন্দরস[২৯]। পুরুষ আত্মবিচার মহৌষধির দ্বারা সিদ্ধ হইলে কৃতকৃত্য হয়, সুতরাং তখন সে কোন কিছু বাঞ্ছা করে না, এবং কোন কিছু ত্যাগও করে না[৩০]। পুরুষের চিত্ত যখন সেই পরম পদ অবলম্বন করে, তখন তাহার সমুদয় বাসনা দূরীকৃত হয় সুতরাং তখন তাহার উদয় বা অস্ত উভয়ের কিছুই থাকে না[৩১]। তখন তিনি এই সকল দৃশ্য বস্তুর প্রতি অনুরাগপরতন্ত্র হইয়া মনঃ-প্রয়োগ করেন না, দান ও আদান বর্জ্জন করেন, কোন কিছুতে উৎ-সাহিত হন না এবং অবসন্নও হন না। কেবল সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করেন[৩২]। তাঁহারা কি অন্তরে কি বাহ্যে কোথাও অবস্থিতি করেন না, কিছুতেই বিষণ্ণ হন না, কোন প্রকার কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না এবং নৈষ্কর্ম্ম্য লাভার্থও যত্ন করেন না[৩৩]। গত বস্তুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও সম্প্রাপ্ত বস্তুর অনুবর্ত্তন করতঃ পরিপূর্ণ মহার্ণ-

* পতাকা ও চামর রাজাদিগের চিহ্ন। ভাবার্থ এই যে, বিচারবান্ পুরুষ রাজার সদৃশ।

বের ন্যায় অবস্থিতি করেন[৩৪]। সেরূপ পূর্ণচিত্ত মহাত্মা মহাযশা৽ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা ইহলোকে বর্ণিতপ্রকারে বিচরণ করেন[৩৫]। এবং সেই সকল ধীর মহাপুরুষেরা এই জগতে স্বেচ্ছানুসারে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করতঃ পশ্চাৎ তদ্দেহ বিসর্জ্জনান্তে পরম কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৩৬]। কুটুম্বপোষণে ব্যাপৃত ও বিপদে নিপতিত থাকিলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণমননাদি সহকারে "আমি কে? সংসার কাহার?" ইত্যাদি-বিধ চিন্তা অর্থাৎ বিচার করিবেন[৩৭]। রাঘব! রাজারাও কোন্ কার্য্য সঙ্কট, কোন্ কার্য্য অসঙ্কট, কোন্ কার্য্য সন্দিগ্ধ, কোন্ কার্য্য অসন্দিগ্ধ, কিরূপ কার্য্য সফল, কিরূপ কার্য্য নিষ্ফল, তাহা বিচার দ্বারা অবধারণ করিয়া থাকেন[৩৮]। যেমন রাত্রিকালে দীপালোক দ্বারা পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট হয়, কোথায় কি আছে তাহা জানা যায়, তেমনি, *বেদবেদান্ত পাঠ ও তাহার বিচার দ্বারা ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-তত্ত্বের অবধারণ হইয়া থাকে[৩৯]। বিচার এমনি আশ্চর্য্যচক্ষু যে, তাহা অন্ধকারেও লুপ্তশক্তি হয় না, প্রখর সূর্য্য তেজেও অভিভূত হয় না, দূরস্থ ও ব্যবহিত বস্তুও দেখিতে পায়*[৪০]। বিবেকান্ধ ব্যক্তিরা জাত্যন্ধের তুল্য এবং তাদৃশ দুর্ম্মতিরা সকল বিষয়ে শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে। পরন্তু যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা বিবেকরূপ (বিচাররূপ) দিব্য চক্ষুর প্রভাবে অখিল বস্তুতে জয় লাভ (মনোরথ সফল) করিয়া থাকেন[৪১]। বস্তুতঃই বিচার যার পর নাই আশ্চর্য্য বস্তু। বিচার পরমাত্মার ন্যায় মান্য ও মহানন্দের আধার। সেইজন্য সাধু পুরুষেরা ক্ষণকালের নিমিত্তও বিচারবিহীন হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন না[৪২]। যেমন পক্ব সহকার (সুগন্ধ আম্র) ফল সকলেরই রুচিকর, তেমনি, চারুবিচারজ্ঞ পুরুষেরা বিদিতাত্মা পুরুষ দিগের রুচিকর (প্রিয়পাত্র)[৪৩]। যেমন জ্ঞাতপথ ব্যক্তি গমনাগমন কালে শ্বভ্রে (গর্ত্তে) পতিত হয় না, তেমনি, বিচারপরায়ণ নরগণও দুঃখে নিপতিত হন না[৪৪]। বিচার-বিহীন পুরুষ যেরূপ রোদন করে, রোগাক্রান্ত, বিষপ্রদীপ্ত (বিষের জ্বালায় জ্বলিত) ও অস্ত্রছিন্ন (অস্ত্রের দ্বারা ছেদিত) পুরুষ সেরূপ রোদন করে না[৪৫]। রাম! কর্দ্দমের ভেক হওয়াও ভাল, মলের কীট হওয়াও ভাল এবং পর্ব্বতগুহার সর্প হওয়াও শ্রেয়ঃ, তথাপি, বিচার-বিহীন হওয়া ভাল নহে অর্থাৎ শ্রেয়স্কর নহে[৪৬]। সর্ব্বপ্রকার অনর্থের আকর ও সাধুজননিন্দিত অবিচার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য[৪৭]।

মোহান্ধ দিগের উচিত যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই বিচারযোগে অবস্থিতি করেন। কারণ এই যে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকূপে নিপতিত ব্যক্তির বিচার ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই। বিচার দ্বারা আপনিই আপনাকে জ্ঞাত হইয়া, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব স্থির করিয়া, মনোরূপ মৃগকে এই সংসার সমুদ্র হইতে উত্তারিত করিবেক। "আমি কে? কেন সংসার নামক দোষ উৎপন্ন হইয়াছে? এবং এ দোষ কোথা হইতেই বা আসিল?" ন্যায়ানুসারে এইরূপ পরামর্শের (অনুসন্ধানের বা ঐ সকল চিন্তার গোচর করার) নাম বিচার[৪৮।৫০]। বিচারবিহীন দুর্ম্মতি দিগের হৃদয় পাষাণের অনুরূপ এবং তাহারা অন্ধ হইতেও অন্ধ। তাহারা মোহের বশীভূত হইয়া কেবল দুঃখপরম্পরাই ভোগ করিতে থাকে[৫১]। রাম! যাহারা সত্য ও অসত্য দেখিয়া, নির্ণয় করিয়া, সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের পরিহার করিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ তত্ত্বান্বেষী দিগের সেই সেই তত্ত্বের জ্ঞান বিচার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হইতে দেখা যায় নাই[৫২]। বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তির আবির্ভাব হয়, ও আত্মবিশ্রান্তি হইতে সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারক পরমা শান্তি হইয়া থাকে[৫৩]। লোক সকল বিচারদৃষ্টির দ্বারাই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম সমুদয় নিষ্পাদন করিয়া অবশেষে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাঘব! তুমি শমাদিসর্ব্বসাধনসম্পন্ন; সেইজন্যই বলিতেছি, তোমারও বিচারপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য[৫৪]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে শত্রুনিসূদন! (মোক্ষ দ্বারের তৃতীয় দ্বারপাল সন্তোষ। সন্তোষ আয়ত্ত করিতে পারিলেও মোক্ষরূপ গৃহে প্রবেশ করা যায়।) সন্তোষ পরম শ্রেয়ের (মঙ্গলের) উপায় ও পরম সুখের দাতা। সন্তোষসেবী পুরুষ পরমা বিশ্রান্তি লাভ করিয়া থাকেন[১]। যাঁহারা সন্তোষ-রূপ ঐশ্বর্য্যে সুখী ও চিরবিশ্রান্তচেতা, তাঁহাদের নিকট এই পার্থিব সাম্রাজ্য জীর্ণ তৃণাংশের ন্যায় হেয় অর্থাৎ তুচ্ছ[২]। রামচন্দ্র! সংসার পথের পথিক দিগের প্রায়ই বিষমাবস্থা (রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি দুরবস্থা) ঘটিয়া থাকে; পরন্তু যাঁহাদের বুদ্ধি সন্তোষশালিনী, তাঁহারা তাদৃশ সঙ্কটেও উদ্বিগ্ন বা সুখহীন হন না[৩]। যাহারা শান্ত ও সন্তোষা-মৃত পানে পরিতৃপ্ত, এই ঐশ্বর্য্যশ্রী তাহাদের নিকট হলাহল বিষ[৪]। সর্ব্ব-দোষনাশন সন্তোষ যেমন মধুর, অমৃত সেরূপ মধুর নহে[৫]। যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ (পাইবার আশা বা ইচ্ছা) করে না, এবং প্রাপ্ত বিষয়েও রাগদ্বেষাদি বিহীন হয়, তুমি তাহাকেই সন্তুষ্ট বলিয়া জানিবে[৬]। আত্মাতে যাবৎ না সন্তোষের উদয় হয়, তাবৎ তাহাতে (আত্মার নিকট উপাধি অন্তঃকরণে) বিপদ সকল গর্ত্তে লতার উৎপত্তির ন্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে[৭]। কমল যেমন সূর্য্যকিরণ স্পর্শে বিকসিত হয়, তেমনি, সন্তোষশীতল চিত্তও বিজ্ঞানদৃষ্টির সংযোগে বিকসিত হইয়া থাকে[৮]। মুখ যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানও আশাবশীভূত ও সন্তোষবর্জ্জিত সুতরাং মলিনতম চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হয় না[৯]। যে মানব পঙ্কজের বিকাশার্থ পূর্ব্বোক্তলক্ষণান্বিত সন্তোষ ভাস্কর উদিত হয়, সে মানব পঙ্কজ কদাপি অজ্ঞানলক্ষণ অন্ধকার রজনীর দ্বারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় না[১০]। যাহার চিত্ত সন্তোষ অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হইলেও রাজার ন্যায় আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সাম্রাজ্য সুখ অনুভব করিতে সমর্থ[১১]। যে ভবিষ্যৎ ভোগের আশা করে না, উপস্থিত ভোগ (সুখ দুঃখ) প্রাক্তন নাশার্থ স্বীকার করে, এবং যাহার আচার ব্যবহার সর্ব্বমনোহর, সেই ব্যক্তিই সন্তুষ্ট বলিয়া

পরিগণিত[১২]। যে মহাত্মা সন্তোষ দ্বারা পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় তাঁহার মুখে লক্ষ্মী (শোভা) সতত বিরাজমানা থাকেন[১৩]। বুদ্ধিমান্ নর প্রযত্ন সহকারে আপনা আপনি আপনার পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বত্রই তৃষ্ণাপরিত্যাগী হইবেন[১৪]। সন্তোষামৃতপূর্ণ, শান্ত ও সুশীল পুরুষের মন শীতাংশুর (চন্দ্রের) ন্যায় স্থির ও শীতল[১৫]। ভৃত্যেরা যেমন রাজার উপাসনা করে, তেমনি, মহা মহা ঐশ্বর্য্য সকল সন্তোষ-পুষ্টমনা পুরুষের ভৃত্য হইয়া উপাসনা করিতে থাকে[১৬]। যেরূপ বর্ষা-কালে ধূলিপটল তিরোহিত হয়, সেইরূপ, যিনি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আত্মার স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারেন তাঁহার আধি-ব্যাধি সকল তিরোভূত হইয়া থাকে[১৭]। বলা বাহুল্য যে, শীলসম্পন্ন কলঙ্ক-পরিশূন্য বিশুদ্ধচিত্তবৃত্তির দ্বারা পুরুষগণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন[১৮]। হে রাঘব! শান্তিগুণযুক্ত পুরুষের সুন্দর বদন অবলোকন করিলে লোকে যেরূপ সন্তোষ লাভ করে, লোক সকল ধনসঞ্চয় দ্বারা সেরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারে না[১৯]। হে রঘুনন্দন! গুণশালিগণের মধ্যে যাঁহারা অনুত্তম শমগুণে পুরুষরাজের ন্যায় সমলঙ্কৃত, সেই সকল দোষপরিশূন্য নরোত্তমেরা দেবগণের ও মহর্ষিগণের নমস্য[২০]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধি রাম! (সৎসঙ্গনামা চতুর্থ দ্বারপালের সেবা করিলেও জীব মোক্ষ দ্বারে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে)। একমাত্র সাধুসঙ্গই নরগণের সংসারজলধি উত্তরণের প্রবল সহায়[১]। যে সকল মহাত্মা সাধুসঙ্গরূপ মহীরুহের বিবেকরূপ শুভ্র পুষ্প যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে পারে, সেই সকল মহাত্মারাই তাহার ফলভাগী হইতে পারেন[২]। সাধুসংসর্গে শূন্য স্থান জনাকীর্ণপ্রায়, মৃত্যু উৎসবময় ও আপদ সম্পদ সদৃশ হইয়া থাকে[৩]। হে রামচন্দ্র! এই জগতে উত্তম সৎসঙ্গকে আপদরূপ সরোজিনীর বিনাশকারী হিমের ও মোহরূপ মেঘের বায়ু বলিয়া জানিবে। তাদৃশ সৎসমাগম এই ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই জয় যুক্ত[৪]। রাম! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, সাধুসমাগম দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধি, অজ্ঞানী তরুর বিনাশ ও সর্ব্বপ্রকার মনঃপীড়ার উৎসারণ হইয়া থাকে[৫]। যদ্রূপ উদ্যানে জলসেক করিলে তাহা হইতে উজ্জ্বল ও মনোহর পত্র-পুষ্পাদির গুচ্ছ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ, সাধুসঙ্গ হইতে উজ্জ্বল ও মনোহর (নির্ম্মল) বিবেক নামক উৎকৃষ্ট দীপ উদ্ভূত হইয়া থাকে[৬]। সৎসঙ্গরূপ ঐশ্বর্য্য অপায় ও ব্যাঘাত রহিত, নিত্য বর্দ্ধমান, অনুত্তম ও পরমানির্ব্বৃতির (বিশ্রান্তি সুখের) উৎপাদক[৭]। নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও, অধিকতর পরবশ হইলেও, মনুষ্যের সাধুসঙ্গ ত্যাগ করা বিধেয় নহে[৮]। সাধুসঙ্গতি সদাচারের দীপ ও হৃদয়ান্ধকারনাশন জ্ঞান-সূর্য্য[৯]। যে পুরুষ সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গরূপ নির্ম্মল ও শীতল জলে স্নান করে, তাহার আর দান, তীর্থদর্শন, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?[১০] যাহাদের অন্তঃকরণ সাধুসঙ্গের দ্বারা দুর্ব্বাসনাদিদোষপরিশূন্য হইয়াছে, সংশয়চ্ছেদী ও বীতরাগ হইয়াছে, সেই সাধুপুরুষেরা সন্নিধানে থাকিলে তপস্যাদি ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না[১১]। যাহারা বিশ্রান্তচিত্ত, তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই দর্শনীয়। দরিদ্রগণ যেমন আগ্রহ ও যত্ন সহকারে মণিরত্ন অবলোকন করে, লোক সকল শান্তচিত্ত সাধু দিগকে সেইরূপ আগ্রহে দর্শন করিয়া থাকে[১২]। কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মী যেমন অপ্সরোগণ মধ্যে বিরাজ করেন ও শোভা প্রাপ্ত হন, সৎসমাগম-

জনিত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট ধীমান্ গণের মতিও সেইরূপ শোভা ধারণ করে[১৩]। রাম! সেই জন্যই বলিতেছি, যে ধন্য বা পুণ্যবান্ পুরুষ সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ না করে, সেই ধন্য বা পুণ্যবান্ পুরুষই বহু লোকের মধ্যে বিচার লভ্য পদকে (ব্রহ্মকে) অগ্রে শিরোভূষণ, তৎপরে তাহা প্রখ্যাপিত (প্রথমে তত্ত্ববিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান, পরে তত্ত্বসাক্ষাৎকার) করিয়া কৃতার্থ হয়[১৪]। যে সকল সাধু পুরুষের চিত্তগ্রন্থি (চিত্রগ্রন্থি=চিত্তের ভ্রম। আত্মতত্ত্বে মোহ। আমি কি তাহা না জানা) ছিন্ন হইয়াছে, যাঁহারা আত্মতত্ত্ব জানেন অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, প্রযত্ন সহকারে তাঁহাদিগেরই সেবা করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাঁহারাই ভবসমুদ্র পারের উপায়[১৫]। যাহারা নরকানলের নীরদ (নীরদ=বৃষ্টিকারী মেঘ) স্বরূপ সাধু দিগের সন্দর্শন লাভ করে নাই, তাহারাই নরকাগ্নির শুষ্ক কাষ্ঠ[১৬]। সৎসঙ্গ নামক ঔষধে দারিদ্র্য, দুঃখ, মরণ, এতদ্রূপ সান্নিপাতিক রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে[১৭]। সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, তত্ত্ববিচার ও শম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), এইগুলি মানবগণের ভবসমুদ্র পারের উপায়[১৮]। সন্তোষই পরম লাভ, সাধুসঙ্গতিই পরম গতি, তত্ত্ববিচারই পরম জ্ঞান, এবং শান্তিই পরম সুখ[১৯]। অপিচ, ঐ চারিটী ভবভেদনের (জন্মপ্রবাহ বিনাশের) প্রকৃত উপায়। যাঁহারা উহা অভ্যস্ত করিয়াছেন তাঁহারাই ভবসমুদ্রের মোহবারি উত্তীর্ণ হইতে পারেন[২০]। এমন কি, ঐ চারিটীর একটী আয়ত্ত করিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চারিটীই অভ্যস্ত বা আয়ত্ত হইতে পারে[২১]। যেহেতু ঐ চারিটীর এক একটী অন্য তিন তিনটীর উৎপত্তির স্থান, সেইহেতু উক্ত সমুদায় অধীন করিবার নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক কোন একটীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে[২২]। যেমন সমুদ্রে বণিকগণ কর্ত্তৃক পণ্যবাহী পোত (পণ্য=বিক্রেয় দ্রব্য। পোত= বৃহৎ জলযান। জাহাজ)। সকল সাবধানে চালিত হয়, সেইরূপ, শম, সৎ-সমাগম, সন্তোষ, বিচার, এ গুলিও সুধীগণ কর্ত্তৃক অতি সতর্কতার সহিত পরিপালিত হইয়া থাকে[২৩]। শ্রী যেমন কল্পবৃক্ষের নিত্যাশ্রিত, তেমনি বিচার, সন্তোষ, শম, সৎসঙ্গ, এতচ্চতুষ্টয়শালী ব্যক্তিরও নিত্যাশ্রিত। (কল্পবৃক্ষের শ্রী ঐশ্বর্য্য। বিচারশীলের শ্রী জ্ঞান)[২৪]। যেমন পূর্ণচন্দ্রে সৌন্দর্য্যাদি গুণ লক্ষিত হয়, তেমনি তাহা বিচার, শম, সৎসঙ্গ ও সন্তোষশীল মানবেও দৃষ্ট হয়। (বিচারশীল মানবে প্রসন্নতা ও বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণ সতত বিরাজ করিতে থাকে)[২৫]। রাজা সন্মন্ত্রীর সাহায্যে

জয়শ্রী লাভ করেন, অধিকারী মানবেরাও বিচার, সৎসঙ্গ, সন্তোষ ও শমের সাহায্যে সুমতি প্রাপ্ত হন[২৬]। হে রঘুকুলনন্দন রাম! আমি সেই কারণে বলিতেছি, তোমায় উপদেশ করিতেছি, তুমি পৌরুষ প্রকাশ দ্বারা মনোজয় করিয়া ঐ সমস্ত গুণের অথবা ঐ সকলের অন্যতম গুণের আশ্রয় গ্রহণ কর[২৭]। পুরুষ যাবৎ না পৌরুষ (পুরুষকার) দ্বারা চিত্তরূপ মত্ত হস্তীকে জয় করিয়া অন্ততঃ উক্ত গুণের একতর গুণ আশ্রয় করিতে পারে, তাবৎ তাহার উত্তমা গতি লাভের আশা নাই[২৮]। অহে রাম! তোমার মন যত দিন না উৎকট উদ্যোগের সহিত ঐ সকল গুণ উপার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হইবে, তাবৎ তুমি দন্ত দ্বারা দন্ত বিচূর্ণন করিবে অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিক উদ্যোগী হইবে[২৯]। হে মহাবাহো! যত দিন না তুমি উক্ত গুণ অর্জ্জনে সমর্থ হইবে, তত দিন তুমি দেবতা হও, যক্ষ হও, পুরুষ বা পাদপ হও, নিস্তারের উপায় প্রাপ্ত হইবে না[৩০]। বলবান্ ও ফলপ্রদ একটিমাত্র গুণের দ্বারা দোষযুক্ত বিরসচেতা ব্যক্তির সমুদয় দোষ অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩১]। একটিমাত্র গুণ বর্দ্ধিত হইলে অনেকদোষজয়কারী সমস্ত গুণ বর্দ্ধিত ও একটিমাত্র দোষ বর্দ্ধিত হইলে গুণরাশিনাশী সমস্ত দোষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে[৩২]। জীবগণের মধ্যে মনোমোহরূপ কাননে শুভ ও অশুভরূপিণী কূলদ্বয়শালিনী বাসনা নদী নিরন্তর প্রবাহিতা হইতেছে[৩৩]। এই তরঙ্গিণীকে (বাসনা নদীকে) তুমি প্রযত্নের দ্বারা যে দিকে নিপাতিত অর্থাৎ প্রবাহিত করিবে, উক্ত নদী সেই দিকেই প্রবাহিতা হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে উহার গতি প্রবর্ত্তিত করিবে[৩৪]। হে মহামতে! হৃদয়কাননপ্রবাহিণী মহানদী যাহাতে পুরুষকারের বেগপ্রভাবে শুভবাসনার দিকে প্রবাহিতা হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। তাহা হইলে অশুভ প্রবাহ তোমাকে কখনই বিচলিত করিতে পারিবে না[৩৫]।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! যে কথিতপ্রকারে অন্তর্ব্বিবেকী হয়, ইহ জগতে সেই ব্যক্তিই মহান্। রাজা যেমন নীতি শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী, তেমনি, সেই মহাপুরুষই জ্ঞান শাস্ত্র শ্রবণের যোগ্য[১]। নির্ম্মেঘ আকাশ যেমন শরৎশশধরের উপযুক্ত স্থান; তেমনি, জড়সঙ্গবর্জ্জিত, নির্ম্মল-স্বভাব উন্নতাশয় পুরুষই তত্ত্বপ্রকাশক বিচারের যোগ্য আধার (পাত্র)[২]। তুমি সেই সেই অখণ্ডিত গুণলক্ষ্মীর (সন্তোষাদি গুণ সম্পদের) আশ্রয়, সেই কারণে আমি তোমাকে মনোমোহ নাশক উপদেশ বাক্য বলিব, তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে[৩]। যাহার পুণ্যরূপ কল্পপাদপ ফলভরে অবনত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই মুক্তির নিমিত্ত মদুক্ত বাক্য-নিচয় শুনিতে সমুৎসুক হইবে[৪]। যাহারা ভব্য অর্থাৎ সদ্‌গুণসম্পন্ন, তাহারাই এই সকল পবিত্র, উদার ও পরম জ্ঞানদায়ক মহাবাক্য শ্রবণের অধিকারী; অধম দিগের ইহাতে অধিকার নাই[৫]। সর্ব্বসংহিতার সার এই সংহিতা ৩২০০০ শ্লোকে রচিত, * ইহা অধিকারী পুরুষকে নির্ব্বাণ পদ দান করে, সেই নিমিত্ত এই সংহিতা মোক্ষোপায় ও শ্রোতা কর্ত্তৃক শ্রুত হয় বলিয়া শ্রুতি নামে অভিহিত হয়[৬]। যেমন রাত্রিকালে জাগরিত ব্যক্তির সম্মুখে দীপ প্রজ্বালিত করিলে তাহার আলোক তৎসম্বন্ধে প্রাদুর্ভূত হই-

---

* বত্রিশ হাজার শ্লোকে সংহিতা সমাপ্ত, অথচ শ্লোকের অঙ্ক গণনা করিলে ২৮০০০ হাজার বৈ হয় না। ইহাতে অনেকেই ভাবিতে পারেন, তবে বুঝি ৪০০০ হাজার শ্লোক নাই অথবা ত্যাগ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্লোক গণনা দুই প্রকার রীতিতে হইয়া থাকে। এক বাক্য অনুসারে, অপর ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক, সেই শ্লোক অনুসারে। যেখানে বাক্য অনুসারে গণনা, সেখানে অর্দ্ধ শ্লোকেও সংখ্যা দেওয়া হয়। যেখানে অক্ষর গণনা, সেখানে পদ্যশেষে অঙ্ক দেওয়া হয়। চণ্ডীতে ৭০০ শ্লোক থাকায় তাহা সপ্তশতী নামে খ্যাত। পরন্তু, পদ্য গণনা করিলে ৭০০ পুরে না। শাস্ত্রে লেখা আছে, মার্কণ্ডেয় উবাচ, এই টুকু এক শ্লোক। এ শ্লোক মন্ত্রাত্মক। মহাভারতের লক্ষ শ্লোক গণনা পদ্যানুসারে নহে, বাক্য অনুসারে। সেইজন্য তাহাতে কোথাও অর্দ্ধ পদ্যে কোথাও এক পদ্যে, কোথাও দেড় পদ্যে অঙ্ক দেওয়া হয়। এই গ্রন্থের শ্লোক গণনা ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক, সেই শ্লোক অনুসারে। কিন্তু ইহাতে অনেক বড় বড় পদ্য আছে। এবং পদ্য শেষে পদ্য সংখ্যা অনুসারে অঙ্ক দেওয়া আছে। পরন্তু শাস্ত্রীয় গণনা ৩২০০০ অক্ষর অনুসারে গণনায় হয়।

বেই হইবে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা না করিলেও তদ্দীপালোক যেমন তাহাকে পদার্থ দর্শন করাইয়া থাকে, সেইরূপ, একান্তচিত্তে শ্রবণ করিলে এই সংহিতাও শ্রবণকারী অধিকারীর মোক্ষসাধন জ্ঞান প্রাদুর্ভূত করা-ইয়া থাকে[৭]। বৎস রাম! এই সংহিতা নিজে অনুশীলন অথবা অন্যের নিকট শ্রবণ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিলে ভাগীরথী যেমন পাপ তাপ নিবারণ পূর্ব্বক সুখ প্রদান করেন সেইরূপ ইহাও সংসারভ্রম নিবারণ ও পরম সুখ প্রদান করিয়া থাকে[৮]। যেমন অবধান সহকৃত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা রজ্জুতে সর্পভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ, অবধান সহকারে এই সংহিতা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে সংসারদুঃখ শান্তিসুখে পরিণত হইতে পারে[৯]। হে অনঘ! এই সংহিতার পৃথক্ ছয় প্রকরণ আছে এবং সে সকল প্রকরণ যুক্তিযুক্ত অর্থের বোধক ও দৃষ্টান্তসার আখ্যায়িকা যোগে অভিহিত হইয়াছে[১০]। তন্মধ্যে প্রথম বৈরাগ্য-প্রকরণ। জলসেক করিলে যেমন মরুভূমিস্থ বৃক্ষও বর্দ্ধিত হয়, তেমনি, বৈরাগ্য প্রকরণ অনুশীলন করিলে বৈরাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[১১]। এই বৈরাগ্য প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা সার্দ্ধসহস্র। সার্দ্ধসহস্র অর্থাৎ দেড় হাজার শ্লোকের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মনের শুদ্ধতা জন্মে অর্থাৎ মালিন্যনিবৃত্তি হয়। যেমন পরিমার্জ্জনে মণির শুদ্ধতা জন্মে; তেমনি, বিচারে মনের শুদ্ধতা জন্মে[১২]। তার পর মুমুক্ষুব্যবহার নামক দ্বিতীয় প্রকরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা সহস্র এবং তাহা নানাযুক্তিবাদে শোভমান[১৩]। ইহাতে মুমুক্ষুদিগের স্বভাব ও চরিত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর উৎপত্তিনামক তৃতীয় প্রকরণ। এই প্রকরণে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ও তত্ত্ববোধার্থ নানাপ্রকার আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে[১৪]। এই প্রকরণ জ্ঞানপ্রতিপাদক ও সপ্তসহস্রশ্লোকে সমাপ্ত। ইহাতে "আমি" "তুমি" ইত্যাদিবিধ লৌকিক দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদ ও তাহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে[১৫]। ইহা শ্রবণ করিলে আমি, তুমি, ব্রহ্মাণ্ডবিস্তৃতি, যাবতীয় লোক এবং আকাশ ও পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার অবাস্তবিক, অমূলক, অপর্ব্বত ও অভৌতিক বলিয়া শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। উৎপত্তি প্রকরণ শুনিলেই শ্রোতার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইয়া থাকে যে, এই সংসার সঙ্কল্পরচিত রাজ্যের অনুরূপ অর্থাৎ মনোরথ মাত্র। অপিচ, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক, মনোরাজ্যের ন্যায় নাম মাত্রে বিস্তৃত অর্থাৎ বস্তুশূন্য, মৃগতৃষ্ণিকার

ন্যায় ভ্রমবিজৃম্ভিত, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় তুচ্ছ (গন্ধর্ব্ব নগর=ভ্রমবশতঃ মেঘাক্রান্ত আকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা মেঘের সন্নিবেশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে), দ্বিচন্দ্রের ন্যায় ভ্রমময় ও পিশাচের ন্যায় মোহকল্পিত। বিশদ কথা—সত্য ও পুরুষার্থ শূন্য[১৬।১৯]। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তি পর্ব্বত প্রভৃতি চলিতেছে বলিয়া বোধ করে, অথবা অজ্ঞগণ যেমন ভ্রম বশতঃ আকাশে মুক্তা মালা, সুবর্ণে কটক (অলঙ্কারবিশেষ) জলে তরঙ্গ ও গগনে নীলিমা অনুভব করে, তেমনি, অজ্ঞ সংসারী জীব এই জগৎ বস্তুতঃ না থাকিলেও মোহপ্রযুক্ত আছে বলিয়া বিবেচনা করে। অধিক কি বলিব, যেমন রঙ্গশূন্য (রঙ্গ=রং), ভিত্তিশূন্য ও কর্ত্তৃশূন্য চিত্র আকাশে ও স্বপ্নে পরিকল্পিত হয় বা দেখা যায়, তেমনি, এই সংসার বিবেকীর নিকট ঠিক্ সেইরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ মিথ্যা)। যেমন আলেখ্যলিখিত বহ্নি অসত্য হইলেও বহ্নিভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তেমনি, এই জগৎ মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তৎকালে তাঁহার ইহাও প্রতীতি হইবে যে, এই সংসার—তরঙ্গে উৎপলমালার ন্যায়, দৃষ্টনৃত্যের স্থিতির ন্যায় ও চক্রবাক চীৎকার শ্রবণে আকাশে জলরাশি জ্ঞানের ন্যায় বস্তুশূন্য। * অপিচ, ছায়া-ফল-কুসুম-শূন্য শুষ্কপত্রপরিপূর্ণ গ্রীষ্মকালীন অরণ্যের ন্যায় নীরস, গিরিগুহার ন্যায় শূন্য[illegible] ভীষণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তুতঃই ইহা মরণব্যগ্র পুরুষের চিত্তের বিভীষিকা দর্শনের ন্যায়, (মুমুর্ষু যে মৃত্যুকালে যমদূতাদি দর্শন করিয়া ভয় পায় তাহা তাহার মনেরই বিকার, অন্য কিছু নহে) স্তম্ভসমুৎকীর্ণ ও ভিত্তিলিখিত চিত্রের ন্যায় (ভিত্তি=ভিৎ, দেওয়াল) এবং পঙ্কাদিরচিত প্রতিমাদির ন্যায় পৃথক্ সত্তাশূন্য। পরমার্থ দর্শনে ইহা প্রশান্ত ও জ্ঞাননীহারবর্জ্জিত শরদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ অজ্ঞানের বিকার দূরীভূত হইলে ইহা নিত্য নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে[২০।২৮]।

---

* তরঙ্গ দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন জলে পদ্মের মালা ভাসিতেছে। বস্তুতঃ তাহা জলের সন্নিবেশ ব্যতীত বাস্তব পদ্ম নহে। আমরা দেখি, নর্ত্তকী প্রহরব্যাপী নৃত্য করে পরন্তু তাহা প্রহর ব্যাপী নহে, প্রত্যুত ক্ষণব্যাপী। ক্ষণপরম্পরা একবুদ্ধি গম্য হইয়া প্রহর ভ্রান্তি জন্মায়। জগতের স্থিতি সেইরূপ ভ্রান্তি সূচক। চক্রবাক্ পক্ষীর রবে মনে হয়, সেই স্থানে জল আছে। বস্তুতঃ আকাশেই রব করে কিন্তু আকাশে জল থাকে না।

রাম! তাহার পর স্থিতি নামক চতুর্থ প্রকরণ। তাহার শ্লোক-সংখ্যা তিন সহস্র। এই স্থিতি প্রকরণ নানাপ্রকার ব্যাখ্যানে ও আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। ইহাতে দিঙ্মণ্ডলমণ্ডিত জগতের স্বরূপ, তাহার ভ্রমপ্রভবত্ব, অহঙ্কার প্রসূতত্ব ও দ্রষ্টৃদৃশ্যের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে[২৯।৩২]। তৎপরে উপশান্তি নামক পঞ্চম প্রকরণ। এ প্রকরণটী সহস্রশ্লোকপরিমিত ও পরম পবিত্র। ইহাতে নানাপ্রকার যুক্তিজাল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকরণ শ্রবণ করিলে জগৎ, আমি, তুমি, এইরূপ এইরূপ ভ্রম উপশান্ত হয় বলিয়া ইহার নাম উপশান্তি। উপশান্তি শ্রবণে সংসার ভ্রম উপশমিত হয় এবং শ্রোতা তখন জীবন্মুক্ত হইয়া দেখিতে থাকেন—এই সংসার আলেখ্যলিখিত সৈন্য দলের ন্যায় বিশীর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ। জীব তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এই সংসার কেবল সঙ্কল্পবিনির্গত ও চিত্রিত নগরীর অনুরূপ। অপিচ, সঙ্কল্পকল্পিত মত্ত মাতঙ্গোপম নিরঙ্কুশ মেঘের বজ্রধ্বনির, স্বপ্নবিজৃম্ভিত বা কল্পনারচিত নগরীর, বন্ধ্যানারীর মুখে তদীয় বীরপুত্রের যুদ্ধাদিকথাপ্রসঙ্গের ও চিত্রব্যাপ্তভিত্তির ন্যায় বস্তুশূন্যকল্পনানগরীর, স্বপ্নদৃষ্ট নিরর্থক যুদ্ধের ও যোধগর্জ্জনের এবং অন্তর্লীন তরঙ্গশালিনী প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণীর ন্যায় নিতান্ত অলীক ও অন্তঃসারশূন্য নিরর্থক[৩৩।৪০]।

অনন্তর নির্ব্বাণ নামক ষষ্ঠ প্রকরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্দ্দশ সহস্র। ইহাও সেই মহান্ অর্থের অর্থাৎ পরমপুরুষার্থের দাতা। এই প্রকরণ অবগত হইলে সমুদায় কল্পনা বিনষ্ট ও নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। অধিক কি বলিব, ইহা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বিজ্ঞানাত্মা বা জীব নিরাময়, বীতস্পৃহ ও শুদ্ধচিৎপ্রকাশ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জগদ্ভ্রম ও সংসারযাতনা দূরীভূত ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানজনিত নির্ম্মল সম সুখ উৎপন্ন হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, মনুষ্যের অনুষ্ঠিত যে কিছু কর্ম্ম সমস্তই স্ফটিকস্তম্ভপ্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায় নিষ্ফল। অপিচ তখন তাহার জন্মমরণাদি ভোগের অবসান জনিত পরমা পরিতৃপ্তি, সমুদায় মনস্কামনা সুসিদ্ধ, কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্ব ও হেয়োপাদেয় দৃষ্টি বিনষ্ট, দেহসত্ত্বেও অদেহ ও সংসার থাকিতেও অসংসার সংঘটন হয়[৪১।৪৫]। এই সংসার দুর্লীলা তখন অবরুদ্ধ ও আশাবিসূচিকা ও অহঙ্কাররূপ বেতাল (ভূত। যাহার আবেশে জীব উন্মত্তের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আছে) তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ তখন পাষাণজঠরের

ন্যায় নিবিড় ও নীরন্ধ্র হয়েন, এবং তখন তিনি পরম প্রকাশমান হইয়া চিন্ময় আদিত্যরূপে সমুদায় লোক আলোকময় বা উদ্ভাসিত করিতে থাকে। * এই সংসারলক্ষ্মী তখন তদীয় রোমকূপের কোন এক প্রদেশে মহাতরুকুসুমসংযুক্ত ভ্রমরীর ন্যায় অবস্থান করে এবং সেই সেই জীবন্মুক্ত নরের অন্তরাকাশে এরূপ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিলেও সে সকল তাহার লক্ষ্যভূত হয় না। তদীয় হৃদয় তখন এরূপ বিস্তৃত হয় যে, শতলক্ষ হরিহরব্রহ্মা তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করিতে সক্ষম হন না॥৪৬।৫০।

---

* অর্থাৎ সে তখন অন্তরে ও বাহিরে একদৃশ্য একরস ও একভাব হইয়া যায়। এবং সে তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্মচৈতন্যের আলোক প্রকাশমান দেখিতে থাকে।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

---*---

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, যদ্রূপ, বীজবপন করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ, এই সংহিতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেও শ্রোতার শ্রবণফল জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী[১]। যে শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অবাধে তত্ত্বনিশ্চায়ক, সে শাস্ত্র পৌরুষেয় (পুরুষকৃত অর্থাৎ মনুষ্যরচিত) হইলেও গ্রাহ্য। কিন্তু যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা বেদ হইলেও অগ্রাহ্য। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহাদিগের নিকট যাহা ন্যায্য, তাহাই অস্মদাদির নিকট শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। অথবা বুদ্ধিমান্ দিগকে "যাহা ন্যায্য তাহাই গ্রাহ্য" এই ভাবের ভাবুক হইতে দেখা যায়[২]। অতএব, যুক্তিযুক্ত বাক্য বালক হইতেও গ্রাহ্য; কিন্তু অযুক্ত বাক্য ব্রহ্মার বদন বিনিঃসৃত হইলেও তাহা অগ্রাহ্য[৩]। যে ব্যক্তি গঙ্গাসলিল পরিহার পূর্ব্বক অনুরাগ বশতঃ আমার পূর্ব্বপুরুষের এই কূপ, এইরূপ অবধারণে ও আগ্রহে কূপ জল পান করে, সেই রাগশীল পুরুষকে শাসন করা (বুঝান) কাহারও সাধ্য নাই[৪]। যেমন প্রাতঃকাল আসিলেই উষার আলোকের আগমন বা উদয় হয়, তেমনি, এই সংহিতাও বাচিতা (পড়িয়া শুনান বা বুঝাইয়া দেওয়া) হইলে শ্রোতার বিবেকের উদয় হয়[৫]। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সংহিতার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে ও বিচার সহকারে ইহার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিয়া লইলে, তাহার সংস্কার অল্পে অল্পে চিত্তে দৃঢ়নিবিষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর তাহার বিশুদ্ধা বাক্‌বৃত্তি আগমন করে[৬।৭]। অর্থাৎ প্রথমতঃ শব্দব্যুৎপত্তি জন্মে; শব্দ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে তদ্দ্বারা অনায়াসে মহত্ত্বগুণশালী তাদৃশ অর্থচাতুর্য্য (বাক্যার্থ জ্ঞান) লাভ করা যায়—যাদৃশ অর্থচাতুর্য্যে অমরসদৃশ পূজনীয় মহীপতিরাও স্নেহাকৃষ্ট হইয়া থাকেন[৮]। প্রদীপ যেমন রজনী সময়ে বস্তু দর্শনের সহায়তা করে, তেমনি, এই সংহিতাও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনার সাহায্য করিয়া থাকে। (নর এই সংহিতার দ্বারাই বুদ্ধিমান্ হয় এবং কার্য্য কারণ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করে)[৯]। যেমন শরৎ সময় সমাগত হইলে মিহিকা বিদূরিত হয় (মিহিকা=কুজ্ঝটিকা অথবা জলকণাবর্ষণ), দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হয়, তেমনি

এই সংহিতা শ্রবণ করিলে লোভ মোহ প্রভৃতি দোষ দূরীভূত ও বুদ্ধি মলশূন্যা হয়[১০]। রাম! তোমার বুদ্ধি মলশূন্যা হইয়াছে, প্রসন্না হইয়াছে, এখন কেবল বিবেকাভ্যাসের অপেক্ষা আছে। ক্রিয়া বিবেকাভ্যাস ব্যতীত ফলপ্রদা হয় না[১১]। সমুদ্রমন্থনের পর মন্দর পর্ব্বত যথাস্থানে স্থাপিত হইলে ক্ষীরোদ সমুদ্র যদ্রূপ অক্ষুব্ধ বা বিক্ষেপ বিরহিত (স্থির) হইয়াছিল, বিবেকাভ্যাসে মন সেইরূপ স্থির হয় ও শরৎকালের সরোবরের ন্যায় নিতান্ত স্বচ্ছ হইয়া থাকে[১২]। যেমন রত্নরূপ দীপের শিখা অন্ধকার নিরাকরণ করতঃ উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ, পদার্থতত্ত্বপ্রকাশিনী প্রজ্ঞাও সমুদায় ব্যামোহ কজ্জল দূরীকৃত করিয়া তত্ত্ব প্রকাশ করতঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে[১৩]। সায়ক যেমন বর্ম্মাচ্ছাদিত শরীর ভেদ করিতে অসমর্থ হয়, তেমনি, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা ধনাদি বিষয়ের অসারতা প্রতীত হইলে দৈন্যদারিদ্র্যাদি দুর্দ্দশার দর্শন লুপ্ত হইয়া যায়। তখন আর সে সকল মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করে না[১৪]। মহোপল যেমন সায়কপাতে নির্ভিন্ন হয় না, তেমনি, এই পুরোবর্ত্তী ভয়ানক সংসার প্রাজ্ঞ পুরুষের হৃদয় বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না[১৫]। হে সৌম্য! যেমন দিবসাগমে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তেমনি, বিবেকাগমে "আগে জন্ম? কি আগে কর্ম্ম? দৈব প্রবল? কি পুরুষকার প্রবল?" ইত্যাদিবিধ সংশয় তিরোহিত হইয়া থাকে[১৬]। বৎস! প্রজ্ঞা যামিনীর অবসানে আলোকোদয়ের ন্যায় বিচারের অনন্তর বিকসিত হইয়া থাকে, তাহাতে সমুদায় রাগদ্বেষাদি দোষ অন্তর্হিত হয়[১৭]। অধিক কি বলিব, বিচারশীল ব্যক্তি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, মেরুর ন্যায় ধীর ও চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হইয়া থাকেন[১৮]।

মনুষ্য বিচারমার্গের অনুসরণ করিলে জ্ঞান প্রভাবে সমুদায় ভেদদৃষ্টি দূরীভূত করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে। তখন তাঁহার বুদ্ধি শরৎ জ্যোৎস্নার ন্যায় যার পর নাই নির্ম্মল, শীতল ও সুপ্রকাশ হয়[১৯।২০]। রাগদ্বেষ প্রভৃতি যে সকল ভয়াবহ দোষ ধূমকেতুর ন্যায় সর্ব্বদা অনর্থপরম্পরা সংঘটন করে, সে সকল দোষ বিবেকরূপ আদিত্যের শমরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হৃদয়াকাশে লব্ধপ্রসর অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হয় না[২১]। শরৎকালে জলধরপটল যেরূপ স্থিরভাবে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া থাকে, বিচারশীল পুরুষগণ সেইরূপ শান্ত ও পবিত্র হইয়া তৃষ্ণা পরিহার পূর্ব্বক

অবিচলিতচিত্তে আত্মপদে অধিষ্ঠান করেন[২২]। যেমন দিবসাগমে পিশাচগণের আনন ম্লানি প্রাপ্ত হয় তেমনি জ্ঞান হইলে পরনিন্দা পরবিদ্বেষ অশ্লীল বাক্য এ সকল থাকে না। সমস্তই দূরে পলায়ন করে[২৩]। তাঁহাদের বুদ্ধি আত্মভিত্তিতে এরূপ দৃঢ়সংলগ্ন ও ধৈর্য্য এরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ হইতে দেখা যায় যে, বায়ু যেমন চিত্রলিখিত লতা বিচলিত করিতে পারে না, তেমনি তাঁহাদের বুদ্ধিকে ও ধৈর্য্যকে কোন প্রকার উৎপাত আসিয়া বিকৃত করিতে পারে না[২৪]। তত্ত্ববিৎ কখন বিষয়সঙ্গাত্মক মোহগর্ত্তে নিপতিত হন না। কবে কোন্ পথাভিজ্ঞ পুরুষ ইচ্ছা করিয়া গভীর গহ্বরে পতিত হইয়াছে?[২৫] সাধ্বী স্ত্রী যেমন অন্তঃপুরচত্বরেই রমমানা হন, থাকিতে ভাল বাসেন, তেমনি, সাধুলোকের বুদ্ধিও অবিরুদ্ধ কার্য্যে রত থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। সৎশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা যাঁহাদের চিত্তচরিত্র পবিত্র হইয়াছে তাঁহারা সাধ্বী পতিব্রতা ও রমণীয়া স্ত্রীর অন্তঃপুরচত্বরে পরম পরিতোষ প্রাপ্তির ন্যায় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সাধুরা অবিরোধী কার্য্যের অনুসরণেই পরিতোষ লাভ করেন[২৬]। সঙ্গমুক্ত পুরুষেরা লক্ষ কোটি জগতের অন্তর্গত অনন্ত পরমাণু সমসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়া থাকেন। * তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই মায়ার কার্য্য সুতরাং কিছুই অসম্ভব নহে। যাঁহার অন্তঃকরণ মোক্ষোপায়পরিজ্ঞানে শান্তস্বভাব হইয়াছে, এই সকল ভোগবৃন্দ তাঁহাকে বিষণ্ন বা আনন্দিত করিতে পারে না[২৭।২৮]। তিনি প্রত্যেক পরমাণুতে জলে তরঙ্গের ন্যায় অনবরত উৎপদ্যমান সৃষ্টিপরম্পরা দেখিতে পান, দেখিয়া বিস্মিত হন না[২৯]। কার্য্যের ও ফলের স্বরূপ জানিতে পারেন অথচ অচেতন পাদপের ন্যায় অনিষ্টাপাতে বিরক্ত ও ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না[৩০]। তাঁহারা প্রাকৃত জনের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বিষয়েই পরিতোষের সহিত অবস্থান করেন[৩১]।

হে রঘুকুলচন্দ্র রাম! তুমি এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অবগত হও ও শ্লোকে শ্লোকে তাৎপর্য্য পর্য্যালোচন কর এবং যথাযথ বিচার করিয়া তত্ত্ব অবগত হও। গুরুতর লোকের অথবা দেবতাদিগের বর অথবা শাপ

---

* অভিপ্রায় এই যে, যেমন পরমাণু অসংখ্য, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরাও অসংখ্য। জ্ঞানীরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদায় সৃষ্টি জ্ঞানগোচর করিয়া থাকেন এবং বুঝিয়া থাকেন—সমুদায় সৃষ্টিই মায়িক।

যেমন উক্তিমাত্রে অনুভূত হয় (বুঝা যায় বা ফল দেখা যায়), ইহা সেরূপ নহে। এতদুক্ত তত্ত্বের অনুভব বা ফলদর্শন বিচারসাপেক্ষ[৩২]। বৎস! এই শাস্ত্র কাব্যশাস্ত্রের ন্যায় সুখবোধ্য। ইহা নানাবিধ রসে ও অলঙ্কারে ভূষিত ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে[৩৩]। যিনি কিঞ্চিন্মাত্র পদপদার্থবোধবিশিষ্ট তিনি ইহা স্বয়ং অর্থাৎ আপনা আপনি বুঝিতে পারিবেন। না পারিলে যত্নসহকারে পণ্ডিত মুখে শ্রবণ করা উচিত[৩৪]। যাহা শ্রবণ, মনন ও হৃদয়ঙ্গম করিলে মনুষ্যের তপস্যা, দান, ধ্যান ও জপ প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হয়, সেই বস্তু এতৎসংহিতায় প্রব্যক্ততর আছে[৩৫]। সত্য সত্যই এই শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণে জীবের চিত্তে সংস্কার সহ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য উদ্ভূত হইয়া থাকে[৩৬]। তখন "আমি দ্রষ্টা, জগৎ আমার দৃশ্য" এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-বিভাগরূপ পিশাচ যত্ন না করিলেও সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকারের উপশম হয় তেমনি আপনা আপনি উপশম প্রাপ্ত হইবে[৩৭]। যেমন মনঃকল্পিত নগরস্থ মনুষ্যকে শোক হর্ষাদির দ্বারা নিপীড়িত হইতে দেখা যায় না, তেমনি, এই ভ্রমসমুদ্ভূত জগৎ প্রপঞ্চ পরিজ্ঞাত হইলে তখন আর ইহা পীড়াদায়ক হয় না[৩৮]। যদি জানা যায়, ইহা চিত্র-লিখিত সর্প, তাহা হইলে যেমন সে সর্প ভয় সমুৎপাদন করে না, তেমনি, এই দৃশ্য জগতের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন আর ইহা সুখ বা দুঃখ দুএর কিছুই জন্মায় না[৩৯।৪০]। যেমন চিত্রলিখিত সর্প পরিজ্ঞাত হইলে পরিজ্ঞানপ্রভাবে তাহার সর্পত্ব অপগত হয়, তেমনি, এই সংসারের আধার পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তখন আর ইহা থাকিতে পারে না, আধারে বিলীন হইয়া যায়[৪১]।

রাম! কোমলতর পুষ্প ও পত্র সূচীবিদ্ধ করিতে হইলে যত্নাতিশয়ের আবশ্যক হয় কিন্তু পরমার্থপদ পাইতে অল্পমাত্রও আয়াস অবলম্বন করিতে হয় না[৪২]। ভাবিয়া দেখ, অঙ্গ পরিচালন ব্যতিরেকে পুষ্পপত্রাদি ভেদ করিতে পারা যায় না; কিন্তু কোনরূপ শরীরচালনা না করিয়া কেবলমাত্র মনোবৃত্তির অবরোধ দ্বারাই পরমার্থপদ লাভ করিতে পারা যায়[৪৩]। সুখাসনে উপবেশন, যথাসম্ভব ভোজন, ভোগবাসনাবিসর্জ্জন, সদাচারবিরুদ্ধ পথের অননুসরণ, দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী পথের বিচার, সাধুসঙ্গের অনুবর্ত্তন, মদুক্ত এই শাস্ত্রের ও অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রের

আলোচনা, এই সকল উপায়ে সংসারশান্তিজনক পরমাত্মবোধ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে—যে পরমাত্মবোধ উৎপন্ন হইলে কস্মিন্ কালেও পুনঃসংসার-পীড়া হয় না[৪৪।৪৬]। যে সকল ভোগবিলাসী পাপাত্মারা এততেও চৈতন্য লাভ করে না, সংসার ভয়ে ভীত হয় না, তাহারা স্বীয় জননীর বিষ্ঠাক্রমি ব্যতীত অন্য কিছু নহে; তাহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা অবিধেয়[৪৭]।

হে রামচন্দ্র! সম্প্রতি আমি যে জ্ঞানশাস্ত্র বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ইহা অত্যন্ত পরিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের অন্তরঙ্গ অবলম্বন। অপিচ, যে দৃষ্টান্তের ও পরিভাষার দ্বারা শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করা যায় তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর[৪৮।৪৯]। যে দৃষ্ট বস্তুর সাধর্ম্ম্য গ্রহণে অদৃশ্য পদার্থের বোধ উৎপাদন করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে দৃষ্টান্ত আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। অননুভূত পদার্থে অনুভূতি প্রবেশ করানই দৃষ্টান্তের ফল[৫০]। রাম! বিনা দৃষ্টান্তে অপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত বস্তু বুঝা ও বুঝান যায় না। প্রদীপ ব্যতিরেকে কি অন্ধকার রজনীতে গৃহোপকরণ দেখিতে ও দেখাইতে পারা যায়? তাহা যায় না[৫১]। হে কাকুৎস্থ! আমি তোমাকে যে সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা তত্ত্ববোধ প্রদান করিব, বুঝাইব, জানিবে যে সে সমস্তই সকারণ অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ। কিন্তু যাহা সে সমুদায়ের প্রাপ্য বা বোদ্ধব্য, তাহা অকারণ অর্থাৎ কাহার কার্য্যভূত নহে (নিত্যনির্ব্বিকার)। অতএব, উপমান উপমেয়ের অর্থাৎ দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে যে যে কার্য্যকারণভাব বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে যে, তাহা পরব্রহ্ম ব্যতীরেকে অন্য সমুদায় স্থানে বিদ্যমান আছে। অপিচ, ব্রহ্মোপদেশ কালে আমি তোমাকে যে সকল দৃষ্টান্ত দেখাইব; বুঝিতে হইবে যে, তাহা সর্ব্বাংশে সমান নহে। তাহা কোন এক সাধর্ম্ম্য (সাদৃশ্য) লইয়া বলা হইয়াছে। অপিচ, ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণার্থ যে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে, সে সমস্তই জগদন্তর্গত; সেজন্য তাহা স্বপ্নজাত দ্রব্যের ন্যায় মিথ্যা[৫২।৫৫]। বৎস! নিরাকার পরব্রহ্মে কি প্রকারে আকারবান্ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি কথা মূর্খ-দিগের বিকল্প কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। একাদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে কোন বিকল্প স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়াকে কোনও পূর্ব্বপক্ষ আক্রম করিতে সমর্থ হয় না[৫৬]। তার্কিকগণ যে, হেতু

সাধ্যাদির অসঙ্গততা ও বিরুদ্ধতা প্রভৃতি দোষ উদ্ভাবন করেন, সে সকল দোষ স্বপ্নতুল্য মিথ্যা জগতে উদিত বা স্থির থাকিতে পারে না[৫৭]।

• বৎস! ভাবিয়া দেখ, জাগ্রদ্ বস্তু ও স্বপ্নদৃষ্টবস্তু উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ বা ইতর বিশেষ নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যদ্রূপ মিথ্যা, জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুও তদ্রূপ মিথ্যা। যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পর অভাব গ্রস্ত থাকে ও হয়, বুঝিতে হইবে, তাহা বর্ত্তমানেও অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ নাই। স্বপ্ন, সংকল্প, আধ্যান, বর, শাপ ও ঔষধাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই জগতের স্বপ্নতুল্যতা বোধগম্য হইবে। তখন দৃষ্টান্ত ভাবের ফলোপধায়কতা দৃষ্ট হইবে[৫৮]।[৫৯]। মোক্ষোপায় বিধাতা বাল্মীকি ও অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রণেতৃগণ পূর্ব্বরামায়ণ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থে বোধ্যবোধন বিষয়ে একই রীতি বা ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইয়াছে, জানিবে[৬০]। শাস্ত্র শ্রবণ করিলে জগতের স্বপ্নতুল্যতা বুঝা যায় সত্য; পরন্তু তাহা শীঘ্র নহে। তাহার কারণ, বাক্যমাত্রেই ক্রমবর্ত্তিনী। যেহেতু ক্রমবর্ত্তিনী, সেই হেতু শীঘ্র বুঝাইতে পারে না। (জগৎ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য, এ সংস্কার অল্প দিনে যায় না। অল্পে অল্পে দীর্ঘকালে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়)[৬১]। যেহেতু জগৎ বাস্তবাংশে স্বপ্ন ও মনোরাজ্য প্রভৃতির সহিত সমান, সেইহেতু এবম্বিধ অধ্যাত্মশাস্ত্রে স্বপ্নাদি ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই[৬২]। এতদ্বিধ অধ্যাত্মশাস্ত্রে কেবল বুঝাইবার নিমিত্তই কারণ ভাবের দৃষ্টান্ত পরিগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্তের অনুরূপ নহেন[৬৩]। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ অধিকারীরা তত্ত্ববোধের নিমিত্ত উপমেয় পদার্থে উপমানের কোন এক সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাদৃশ্য গ্রহণ করেন না[৬৪]। বস্তু দেখাই প্রয়োজন, তাহাতে কেবল দীপালোকেরই উপযোগ। তৈল ও বর্ত্তি প্রভৃতির উপযোগ নাই। একমাত্র আলোকই তাহার উপায়, তৈলাদি তাহার উপায় নহে[৬৫]। বৎস! প্রদীপ যেমন প্রভার দ্বারা বস্তু জ্ঞান জন্মায়, তেমনি উপমানের একদেশসাধর্ম্ম্যও উপমেয়ের প্রতীতি জন্মায়[৬৬]। দৃষ্টান্ত স্বীয় অংশের সামর্থে বোধ্য বিষয়ে বোধ উৎপাদন করিলে তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থাবধারণ হইয়া থাকে[৬৭]। কুতার্কিক-গণ বিদ্বান্ দিগের অনুভব অপলাপ করতঃ অপবিত্র বিকল্প কল্পনার দ্বারা

কদাচ পরমার্থপ্রবোধযোগ্য অভিজ্ঞান নষ্ট করিতে পারে না৬৮। হে অনঘ! সেই সেই মহাবাক্য অবিচারশীল ও অজ্ঞানীর পক্ষে বৈরি বলিয়া পরিগণিত হইলেও * বিচারের পর তত্ত্বানুভব জন্মায় বলিয়া সে সকল আমাদের নিকট প্রমাণ। অত্যন্ত প্রেয়সী স্ত্রী (পাণিগৃহীতী) পরমার্থশূন্য বৈদিক বাক্য বলিলেও তাহা অস্মদাদির নিকট অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রলাপ বাক্য মাত্র। যে বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়, আমরা সেই বুদ্ধিকে অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত শ্রৌত মহাবাক্যার্থের পরিণাম-বিশেষ বলিয়া অবগত আছি। সে বোধ প্রত্যক্ষ ও পরম পুরুষার্থের অদ্বিতীয় কারণ। পরমপুরুষার্থ লাভের প্রতি মহাবাক্য শ্রবণ ব্যতীত কারণানন্তর নাই, ইহা আমাদের সুস্পষ্টরূপে জানা হইয়াছে৬৯।৭০।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

* "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্য সর্ব্বত্যাগী হইতে বলে, সংসারচ্যুত করিয়া মোক্ষ জন্মায়, তাহা শুনিয়া জ্ঞানহীন সংসারী লোক ঐ সকল মহাবাক্যকে নিকৃষ্ট ও শত্রু মনে করে।

ঊনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস রামচন্দ্র! উপমান স্থলে বিশিষ্টাংশেরই সাধর্ম্ম্য পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে অংশ বিবক্ষিত, সেই অংশের সহিত যাহার তুলনা দৃষ্ট হইবে, উপমানের সেই অংশই গৃহীতব্য। অন্যথা, উপমান ও উপমেয় উভয়কে সর্ব্বাংশে সুসদৃশ বা সমান করিতে গেলে প্রভেদ থাকে না। প্রভেদ না থাকিলেও উপমান উপমেয় ব্যবহার উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়[১]। অতএব, বিবক্ষিত প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা অখণ্ড আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জ্ঞান সুস্থির হইলে "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা অদ্বয়ব্রহ্মবিষয়িনী মানসী বৃত্তি উদিত হইয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞান কল্পিত ভেদ জ্ঞানের (তুমি, আমি, জগৎ, এইরূপ এইরূপ জ্ঞানের) শান্তি করে। এই শান্তি অধ্যাত্মশাস্ত্রে নির্ব্বাণ নামে প্রসিদ্ধ ও তাহা বিবক্ষিত দৃষ্টান্তের ফল[২]। দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক লইয়া যে কুতর্ক আছে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু সে সকল ত্যাগ করিয়া কোন এক অনুকূল যুক্তির অনুসরণ পূর্ব্বক দৃঢ়তা সহকারে, যাহা অহংব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি মহা-বাক্যের অর্থ—তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন[৩]। রাম! শান্তিই পরম শ্রেয়, তুমি তাহারই, উপার্জ্জনে যত্নবান্ হও। অন্নই ভোক্তব্য, তাহা পাইলে কেমন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করা যাইবে, কি উপায়ে তাহার প্রাপ্তি হয় এবং তাহা কেনই বা হয়, এ সকল তর্কের প্রয়োজন কি[৪]। এই শাস্ত্রে, কেবল সেই অনির্ব্বাচ্য উদ্দেশ্য বোধগম্য করাইবার জন্যই কোন এক ঐকদেশিক সাদৃশ্য গ্রহণ পূর্ব্বক উপমান উপমেয়ের ব্যবহার করা হয়। সুতরাং উপমান কেবল প্রবৃত্তির ও বোধের কারণ হয়, আর আর অংশে অকারণ অর্থাৎ উদাসীন থাকে। "ঔষধ খাও—খাইলে তোমার ভ্রাতার মত শিখা বড় হইবে" এই উপমান বাক্য যেমন বালকের ঔষধ পান প্রবৃত্তির কারণ হয়, এবং শিখা বৃদ্ধির অকারণ অর্থাৎ ঔষধ পান শিখা বৃদ্ধির কারণ হয় না, এতৎ শাস্ত্রের উপমানকেও সেইরূপ জানিবে[৫]। প্রস্তরের মধ্যে এক প্রকার ভেক থাকে, তাহারা বিশেষ পুষ্ট (মোটা ও বড়) ও অন্ধ। এই সংসারে বিবেকবিহীন হইয়া

কেবল মাত্র ভোগসুখে সেই সকল ভেকের ন্যায় কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে[৬]। দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করতঃ যাহাতে পরম পদ জয় করা যায় তাহার বিষয় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং তদর্থে বিচারশীল হওয়া ও শাস্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করা অবশ্য বিধেয়[৭]। অধিকারী নর যত্ন সহকারে পরম পদ পাইবার চেষ্টা, শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ, সৌজন্য, প্রজ্ঞা ও সৎসঙ্গ, এই সকল অবলম্বন করতঃ যথাযথ বিধানে ধর্ম্মার্থের অর্জ্জন ও যাবৎ না বিশ্রান্তিসুখ সমুৎপন্ন হয় তাবৎ আত্মতত্ত্বের বিচার করিবেন। করিলে বিনাশবর্জ্জিত তুরীয় নামক পদ সম্পন্ন হইবেই হইবে[৮।৯]। যে ব্যক্তি তুর্য্যবিশ্রান্তি (ব্রহ্মনির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হন, সে ব্যক্তি গৃহী হউন, যতি হউন, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন এবং তাহার ঐহিক পারত্রিক সমুদায় ফলই সুসম্পন্ন হইবে[১০]। তাহার কর্ম্মে ও কর্ম্মত্যাগে, শ্রবণে ও মননে, কিছুতেই প্রয়োজন থাকেনা। যেমন মন্দরক্ষোভরহিত মহাসাগর স্থির ভাবে অবস্থান করে; তেমনি, তিনিও বিকাররহিত স্থিরতায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন[১১]।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বোধ্যবোধের নিমিত্তই উপমানের এমন এক অংশ গ্রহণ করিতে হইবে যে যাহার সদৃশ বলিবা মাত্র উপমেয়ের স্বরূপ প্রতীতিগোচর হইতে পারে। যাহাতে বোধ্য পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহা করাই কর্ত্তব্য, বোধচঞ্চু হওয়া উচিত নহে[১২]। * (বোধচঞ্চু=মুখ-পাণ্ডিত্য) বোধচঞ্চু না হইয়া যে কোন উপায়ে বোদ্ধব্য বস্তু বুঝিয়া লওয়া উচিত। বোধচঞ্চু হইলে, খণ্ডনের জন্যই মন ব্যাকুল থাকিবে, বৈধাবৈধ নির্ণয়ে সমর্থ হইবে না[১৩]। হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানময় আকাশে যে নিরুপদ্রব অনুভূতির বস্তু বিদ্যমান আছে, যাহারা তাহাতে অনর্থের আরোপ করে, তাহারা একপ্রকার বোধচঞ্চু। অর্থাৎ তাহারা তত্ত্বজ্ঞানফল লইয়া বৃথা বিবাদ করে। হে সৌম্য! যে সকল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যাদির অভিমানে কুতর্ক উদ্ভাবন পূর্ব্বক জ্ঞান ও জ্ঞান সাধন বিষয়ের স্থৈর্য্য দর্শনে অসমর্থ হয়, তাহারাও অন্য এক প্রকার বোধচঞ্চু। এই দ্বিতীয় প্রকারের বোধচঞ্চুরা মেঘ যেমন নির্ম্মল আকাশকে মলিন ও

---

* চঞ্চু=পাখীর ঠোঁট। তাহা তাহাদের ফলবৃন্ত খণ্ডনের নিমিত্ত মুখে অবস্থিত থাকে, অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না। যাহাদের বোধ বা জ্ঞান হৃদয়প্রবিষ্ট হয় না, কেবল পরমত খণ্ডনের নিমিত্ত মুখেই অবস্থান করে, তাহারা বোধচঞ্চু। ইহার ভাষা কথা মুখপাণ্ডিত্য।

আচ্ছন্ন করে তেমনি নিজ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন ও মলিন করিয়া থাকে। (জ্ঞান=বোধশক্তি বা চৈতন্যরূপী আত্মা)[১৪।১৫]। রামচন্দ্র! সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের মুখ্য আধার, তেমনি, প্রত্যক্ষ সমুদায় প্রমাণের প্রামাণ্যের মুখ্য আশ্রয়। সেই কারণে অতঃপর আমি তাদৃশ প্রত্যক্ষের যথাযথ লক্ষণ বর্ণন করিব তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর[১৬]। যেমন সমুদায় প্রমাণের সার ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয় না থাকিলে কোনও প্রমাণ থাকে না সুতরাং প্রমাণের সার ইন্দ্রিয়)। তেমনি, সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সার চেতন (চৈতন্য। চৈতন্য না থাকিলে অন্ধ ইন্দ্রিয়ে কি কার্য্য হইতে পারে?) জ্ঞানিগণ এই মূল চৈতন্যকে মুখ্য বা প্রধান প্রত্যক্ষ বলিয়া জানেন। এই চৈতন্য নামা মূল প্রত্যক্ষের অবচ্ছেদভাব, আশ্রয়-ভাব ও বিষয়ভাব "আমি ঘট জানিতেছি" এই সম্মিলিত আকারে প্রকাশ পায় এবং ঐ সম্মিলিত ত্রিভাবের নাম ত্রিপুটী। * ত্রিপুটী বোধসিদ্ধ; পরন্তু ঐ ত্রিপুটীবোধও প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য[১৭]। ত্রিপুটীর প্রথম প্রকাশ হওয়ার বা উদয়ের নাম অনুভূতি, অনন্তর তাহার অনুপ্রকাশ অর্থাৎ অনুভবনীয়রূপের প্রকাশ বেদন, অনন্তর যিনি জীবপদাভিধেয়, তিনিই মনোবৃত্তিরূপ উপাধির যোগে ঐ তিনের পৃথক পৃথক প্রকাশ (আমি, ঘট, জানিতেছি) নির্ব্বাহ করিতেছে। সে প্রকাশ প্রতিপত্তি নামে খ্যাত। অনুভূতি, বেদন, প্রতিপত্তি, এই তিন্ নামের অক্ষরার্থ ত্যাগ না করিয়া যে, তত্রিতয়ব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন স্বাধীন চৈতন্য স্ফুরিত হয়, সেই চেতনা বা চৈতন্য এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের মুখ্য প্রত্যক্ষ এবং তাহাই এতৎ-শাস্ত্রোক্ত সাক্ষি-চৈতন্য। এই সাক্ষি-চৈতন্যই প্রাণধারণ কালে জীব[১৮]। এই জীবই সংবিৎ অহং ও প্রত্যয় উপহিত হইয়া পুরুষ অর্থাৎ প্রমাতা (প্রমাজ্ঞানের আধার)। তিনি যে সংবিৎ দ্বারা আবির্ভূত হন তাহারই অন্য নাম পদার্থ অর্থাৎ বিষয়[১৯]। জল যেমন তরঙ্গাদিরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ, সেই পরমাত্মা নামক অদ্বয় নিত্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাবভাসক চৈতন্য বস্তু স্বগত সঙ্কল্প বিকল্পাদি প্রভৃতির সমষ্টির দ্বারা জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন[২০]।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ইনি এক ও অকারণরূপে বিরাজিত ছিলেন, পরে

* জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই তিন ভাব ত্রিপুটী নামে খ্যাত। তাহা আমি, ইহা, ও দেখি-তেছি, এই তিন ভাবে সর্ব্বদাই উদিত হইতেছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিলীলাবশতঃ আপনিই আপনাতে কারণভাব উত্থাপিত করিলেন[২১]। সেই কারণভাব অবিচার অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান। অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান বা অবিচার, মায়ার প্রভাবে সমুত্থিত এবং তাহা পরম প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত। সেই অভিব্যক্তিই এক্ষণে জগৎ[২২]। এখন বুঝিতে পারিলে যে, জগৎ আত্মপ্রকৃতি অজ্ঞানের বপু অর্থাৎ শরীর এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞান-শরীর জগৎ উভয় অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে। বিচার আত্মারই প্রকাশ-বিশেষ এবং তাহা আত্মাতেই আবির্ভূত হয়। হইয়া অবিচারের অর্থাৎ জগদ্বপুঃ অজ্ঞানের বিনাশ করে। সেই জন্যই তখন বিচারবান্ পুরুষ পরম মহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষে অব্যবহিত হন[২৩]। এই সময় সেই বিচারবান্ পুরুষ আপনাকে জানিতে পারেন এবং তখন বিচারও নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিচার তখন নিরল্লেখ্য বা শব্দাদির অবিষয়ীভূত একমাত্র পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়[২৪]। মন বৃত্তিশূন্য অর্থাৎ শান্ত হইলে তখন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও কর্ম্ম, সমস্তই বাধিত হইয়া যায় সুতরাং তখন কার্য্য অকার্য্য ও ইচ্ছাদি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না। মন ইচ্ছাদিবিহীন ও শান্ত হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়েরাও তখন অসঞ্চালিত যন্ত্রের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে[২৫]।[২৬]। অভ্যন্তরস্থ রজ্জু যেমন কাষ্ঠপ্রণালীগত (জল চলিবার নালীর আকার খোদাই করা কাষ্ঠ) দারু নির্ম্মিত মেষদ্বয়ের পরস্পর শিরোবিঘট্টনের কারণ, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বেদন ভাবই (বেদনভাব = বিষয়াকার জ্ঞান) মনোযন্ত্র প্রচলনের কারণ[২৭]। স্পন্দন যেমন বায়ুরই অন্তর্গত, তেমনি, রূপালোক ও মনস্কার এবং পদার্থ ও বিষয়, এ গুলিও পূর্ব্বোক্ত বেদ-নের (বিষয়স্ফূর্ত্তির) অন্তর্গত। বাহেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ রূপা লোক এবং মনের দ্বারা বিষয়ানুসন্ধান মনস্কার। উভয়ের আশ্রয় পদার্থ বা বস্তু। জগৎ এই তিনে পরিব্যাপ্ত[২৮]। সেই বিশুদ্ধ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপী বেদন (জ্ঞান) পরতত্ত্ব প্রাণিকর্ম্মানুসারে যখন যেরূপে সমুদিত হন তখন সেইরূপেই প্রকাশিত হন। বাহিরে যে কিছু দৃশ্য, সমস্তই সেই পরতত্ত্বের বেশ (রূপ)[২৯]। এই পরতত্ত্বই দেহাদি দৃশ্যাভাস দৃষ্টে তাহাতেই নিজরূপ ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ জীব ভাবে প্রকাশ পাই-তেছেন[৩০]। এই সর্ব্বাত্মা পুরুষ যে দেশে, যে কালে, যে বস্তুতে, যে রূপে প্রকাশমান হন, সেই দেশে সেই কালে সেই বস্তুতে সেই রূপেই তিনি বিরাজমান ইহা বিজ্ঞাত হইতে হইবে[৩১]। রামচন্দ্র! যেমন

ভ্রমপ্রযুক্ত রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ, জগৎ ও সেই সর্ব্বদর্শী দ্রষ্টার বৃথা দৃশ্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। পরন্তু বিচারোদয়ে ভ্রম তিরোহিত হইলে তখন আর এ সকল দৃশ্য বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইবে না। যেহেতু চিদ্রূপী দ্রষ্টা সর্ব্বাত্মক, সেই হেতু তাহার দৃশ্যতুল্য হওয়া অযুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ। দ্রষ্টার স্বভাবেই দৃশ্যভাব আভাসিত হয় বলিয়া দৃশ্যভাব অবাস্তব[৩২]। অতএব, সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বয় অকারণ (নিত্যসিদ্ধ) চিদ্বস্তু বিদ্যমান ছিলেন, যিনি এখন নানা কল্পনায় বিরাজ করিতেছেন, তিনিই অর্থাৎ সেই পরম তত্ত্বই মুখ্য প্রত্যক্ষ। এই মুখ্য প্রত্যক্ষ হইতেই অনুমানাদির প্রবৃত্তি এবং এই মুখ্য প্রত্যক্ষেই সে সকলের পর্য্যবসান দেখা যায়। সুতরাং অনুমানাদি মুখ্য প্রত্যক্ষের অংশবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সমুদায় কথার সারার্থ এই যে, আত্মাই প্রমাণ সমূহের তত্ত্ব (সার) এবং কার্য্য ও কারণ মিথ্যা[৩৩]। হে সাধো! যিনি প্রযত্ন সহকারে এই পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি দৈব শব্দ দূরে পরিহার করিয়া স্বীয় পৌরুষ বলে সেই উত্তম পদ প্রাপ্ত হন। হে রামচন্দ্র! যাবৎ স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা সেই অনন্তরূপ পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না করিবে তাবৎ আচার্য্যপরম্পরানুসারী হইয়া বিচারপরায়ণ থাকিবে[৩৪।৩৫]।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথমে সাধুসহবাস ও যোগ চর্চ্চা এই দুয়ের দ্বারা প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে। অনন্তর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মহাপুরুষলক্ষণ দ্বারা আপনাকে মহাপুরুষ রূপে পরিণামিত করিবে[১]। যদিও একাধারে সমুদায় সদ্গুণ না দেখিতে পাও, তবে, যে পুরুষ যে উত্তম গুণে শোভমান হন, সে পুরুষকে ইতরাপেক্ষা বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া সেই পুরুষের নিকট সেই গুণের অনুশীলন করিবে এবং তদ্দ্বারা বুদ্ধিকে সমুন্নত করিবে[২]। রাম! শমাদিগুণশালিনী মহাপুরুষতা সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকে উৎপন্না হয় না[৩]। যেমন নবাঙ্কুর সকল বৃষ্টিপ্রভাবেই উপচিত হয়, সেইরূপ, জ্ঞান হইতেই শমাদিগুণপরম্পরা উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে[৪]। যেরূপ অন্নাত্মক যজ্ঞের দ্বারা ধান্যাদি অন্নের উৎপাদক জল বর্ষণ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি, শমাদি গুণ হইতেই তত্ত্বজ্ঞান সমুন্নত হইয়া থাকে[৫]। ফলতঃ সরোবর ও পদ্ম এই দুএর অনুরূপ জ্ঞান ও শমাদি গুণ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোভিত হয়[৬]। জ্ঞান ও সদাচার পরস্পর পরস্পরের বৃদ্ধির কারণ। সদাচার হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং জ্ঞান হইতে সদাচারের প্রাবল্য সিদ্ধ হইয়া থাকে[৭]। বুদ্ধিমান্ পুরুষ প্রজ্ঞায় ও শমাদি গুণে নিপুণ হইয়া পুরুষার্থ প্রাপ্তির অনুরূপ জ্ঞান ও সদাচার এই দুএর অনুশীলন করিবেন[৮]। হে তাত! জ্ঞান ও সদাচার একত্র অনুশীলিত না হইলে উভয়ের মধ্যে কোনটিই সুসিদ্ধ হইবে না[৯]। অধিক কি বলিব, যেমন পরিপক্বশালিক্ষেত্ররক্ষিণী নারী গীতির (গানের) দ্বারা বিহগ সমুদয় উৎসাদিত করে ও তৎসঙ্গে গীতিজনিত আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ, কর্ত্তৃরূপী অকর্ত্তা ও অস্পৃহ পুরুষ জ্ঞান ও সদাচার দ্বারা সম অর্থাৎ অদ্বয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১০।১১]।

হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট সদাচার পদ্ধতি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে জ্ঞান পদ্ধতি বর্ণন করি, শ্রবণ কর[১২]। সদ্বুদ্ধিশালী নর এই যশস্য, আয়ুষ্য ও পুরুষার্থফলপ্রদ সৎশাস্ত্র অভিজ্ঞ আপ্ত গুরুর নিকট শ্রবণ করিবেন[১৩]। জল যেমন কতক যোগে (কতক—নির্ম্মল নামক

ফল) কলুষতা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছ হয়, তেমনি, তুমি ইহা মৎসকাশে শ্রবণ করিলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চিত মলপরিশূন্যা হইবে এবং তুমিও পরম পদ প্রাপ্ত হইবে[১৪]। হে বৎস! ইহার অনুশীলন দ্বারা মননশীল ব্যক্তির অন্তঃকরণ বেদ্য বিষয়ে অনুধাবন করতঃ অনায়াসেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারক হয়, এবং যাহা সর্ব্বদা জাগরূক ও অখণ্ডরূপে বিরাজিত সেই অনুত্তম পদ তাহা হইতে বিচলিত হয় না[১৫]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

———*———

মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ সম্পূর্ণ।